

# নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল সিদ্ধিক সালিক

ভাষান্তর : মাসুদুল হক



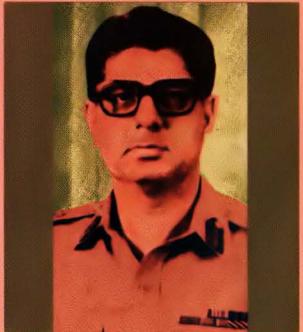
মারুফ

নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল

• সিদ্ধিক সালিফ • তথ্যসূত্র : মাসুদুল হক

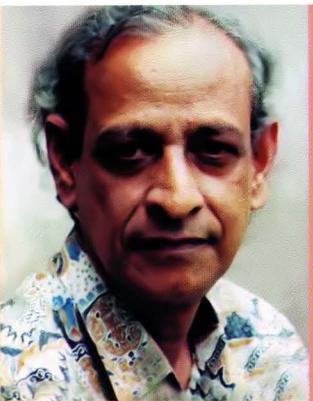


শহীদ শিশির বাবু



পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আসার আগে সিদ্ধিক সালিক লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাষক ছিলেন। সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত ছিলেন কিছুকাল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর হওয়ার পর তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়ে আসেন প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের জনসংযোগ অফিসার হয়ে। পরবর্তী সময়ে তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজির জনসংযোগ অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশের জন্মের পর খণ্ডিত পাকিস্তানে তিনি ফিরে যান ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের আওতায় এবং তিনি সেনাবাহিনীতে স্বপদে বহাল থাকেন। পরে ব্রিগেডিয়ার হন এবং পাকিস্তানের আরেক সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকের প্রেস সেক্রেটারি হন। ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে বহনকারী একটি বিশেষ সামরিক বিমান মধ্যে আকাশে ধ্বংস হলে প্রেসিডেন্ট ও তার সফরসঙ্গী পদচ্ছ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে তিনিও প্রাণ হারান।



তুমুল সাড়া জাগনো বাংলাদেশের  
স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, যা  
'র' অওর সিআইএ: মাশরেকি  
পাকিস্তান ছে বাংলাদেশ তক' নামে  
পাকিস্তানে অনুদিত এবং ব্যাপক  
সমাদৃত 'বাঙালি হত্যা' এবং  
পাকিস্তানের ভাঙ্গন' ও 'স্বাধীনতার  
ঘোষণা : মিথ ও দলিল' প্রস্তুতে  
লেখক মাসুদুল হকের প্রথম  
প্রকাশিত পাঠক সমাজে বিপল  
আলোড়ন তোলা এই অনুবাদ গ্রন্থ  
'নিয়াজির আয়সম্পর্কের দলিল'।  
তার আর দুটি অনুবাদ গ্রন্থ 'স্বাধীন  
বাংলাদেশের অভ্যন্তর' ও  
'বাংলাদেশ : বারবদে জন্ম যার'।  
মাসুদুল হক পেশায় সাংবাদিক।  
কর্মজীবনের শুরু খুল শিক্ষকতা  
দিয়ে, কাজ করেছেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট  
জেনারেল অফিসে এবং  
সাংবাদিকতার আরঙ্গ অধুনালুণ্ঠ সিনে  
সাঞ্চাইক পূর্বানীর প্রতিবেদক  
হিসেবে। পরে দৈনিক ইন্ডেফাক-এর  
সিনিয়র সাব-এডিটর। তার পৈত্রিক  
বাড়ি খুলনার খালিশপুর।

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Banglapdf.net

Please Give Us Some  
Credit When You Share  
Our Books!

Don't Remove  
This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ফানি  
এডিটিং MARUF  
মারফ



Visit Us at  
Banglapdf.net

If You Don't Give Us  
Any Credits, Soon There'll  
Nothing Left To Be Shared!

নিয়াজির আত্মসমর্পনের দলিল

নিয়াজির  
আত্মসমর্পণের  
দলিল

সিদ্ধিক সালিক  
ভাষান্তর মাসুদুল হক



জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

নাটীয় সাহিত্য বন্দো

বাংলাপিডি.এফ.নেট

স্ক্যান ও এডিট

মাৰুফ

*fb.com/groups/Banglapdf.net*

MARUF

*Exclusively for*

Banglapdf.net

## **নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল**

**সিদ্ধিক সালিক**

**ভাষান্তর : মাসুদুল হক**

প্রকাশক কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট রুম # ৫৫, কনকর্ড এ্যাস্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫।  
গ্রন্থস্থল লেখক। প্রচন্দ সুখেন দাস। বর্ণিন্যাস রঞ্জু শাহ কম্পিউটার,  
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মুদ্রণ মৌমিতা প্রিন্টার্স, ২৫ প্যারীদাস রোড,  
ঢাকা-১১০০। প্রকাশকাল প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি  
২০১১।

**মূল্য ৩০০.০০ টাকা।**

---

NIAZIR ATMASAMAR PANER DALIL BY SIDDIQ SALIK.  
TRANSLATED BY MASUDUL HAQUE. Published by: Kamalkanti Das,  
Jatiya Sahitya Prakash, Basement Room 55. Concord Emporium Shopping  
Complex, 253-254 Elephant Road, Kantabon, Dhaka-1205. First Published  
February 2007, Second Edition: February 2011

Price: Tk. 300.00 US \$ 10.00

ISBN 984-70000-0042-2

রাজশাহীর রোহনপুরের সেই অঙ্গাত পরিচয়  
শহীদ কিশোরের  
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে –  
একাত্তরের হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে  
শত নির্যাতনের পরও  
যে সহযোগিদের নাম প্রকাশ করেনি,  
বদেশের মাটি চূমন করে যে  
দৃশ্ট কষ্টে বলে উঠেছিলো  
(আমি প্রস্তুত! চালাও শুলি! আমার  
প্রতিটি রক্তবিন্দু আমার পবিত্র ভূমির  
মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে।)

## দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে।  
পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হওয়ায় ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়  
দ্বিতীয় মুদ্রণ। প্রথম প্রকাশনায় যে ভুল ক্রটি ছিল, দ্বিতীয় মুদ্রণে  
তার সংশোধনের সুযোগ হয়নি। দ্বীর্ঘ দিন পর দ্বিতীয় (সংশোধিত)  
সংস্করণ বাজারে এলো। এবার যাবতীয় ভুল-ক্রটি সংশোধনের  
চেষ্টা করা হয়েছে।

এবারের প্রকাশনায় সহযোগিতা প্রদানের জন্য দৈনিক খবর  
সম্পাদক মিডিয়ার রহমান মিজানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।  
এ গ্রন্থ আগের মতোই পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমার  
বিশ্বাস।

## অনুবাদকের কথা

গ্রহাকারে প্রকাশের আগে নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল সাংগীতিক চিত্রবাংলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

দৈনিক খবর সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানের বিশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া পুস্তকাকারে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তার সহযোগিতার জন্য আমি বিশেষভাবে ঝণী।

সাংগীতিক চিত্রবাংলার গোলাম কিবরিয়াও এই গ্রন্থ অনুবাদে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আমাকে সাংবাদিকতায় যিনি এনেছেন, আমার লেখালেখিতে যার অবদান সবচেয়ে বেশী, তিনি দৈনিক ইত্তেফাক-এর বার্তা সম্পাদক গোলাম সারওয়ার। গ্রন্থ প্রকাশের এই শুভক্ষণে তাঁকে আমার স্মরণ করতে হচ্ছে।

এ ছাড়া আরেকজন—যিনি অনুবাদ কর্মের প্রয়োজনীয় অনুলিপির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তিনি আমার সহধর্মিনী তড়িহিদা বেগম। তার অকৃপণ সাহায্যের কথা আমাকে স্মরণ করতেই হয়। সবশেষে সাংগীতিক চিত্রবাংলার সকল কর্মীর সহযোগিতার কথা আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

## লেখকের কথা

২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১। চারদিন আগে ঢাকার পতন ঘটেছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি এবং মেজর জেনারেল রাও·ফরমান আলীসহ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের মৃত্যু বন্দি হিসেবে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি পরিবহণ বিমান অপেক্ষা করছিল। এই আকাশ-পরিবহণে এবং উত্তরকালীন গ্লানির অংশী হতে তাদের স্টাফ অফিসারদেরও অনুমতি দেয়া হয়। সবাই আসে এবং অঙ্ককারময় বলগা হারিণের জঠরের মধ্যে স্বেচ্ছে যায়। দুর্বল কলকব্জা ঝাঁকি মেরে জীবন্ত হয়ে ওঠে, আর্তনাদ করে কিছুক্ষণ, তারপর আকাশে পাখা মেলে। আমিও বিমানে ছিলাম।

দু'বছর আগে পিআইএ'র একটি বোয়িং আমাকে একই টারম্যাকে নামিয়ে দেয়। জীবন তখন অন্য রকম ছিল। সকালের উজ্জ্বল সূর্যালোকে বিমান বন্দরটি ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্চ। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা দেশকে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে পরিচালনায় ছিলেন ব্যস্ত—যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ,—জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া তার প্রথম ভাষণে।

তারা তখন জিনের ওপর চেপে বসেছিলেন; এখন পায়ে তাদের বেড়ি। একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি উভয়ে গেছি, কিন্তু দেশ বাঁচেনি। ধারাবাহিক ঘটনাবলির স্মরণ আমার কাছে বেদনাদায়ক, বিস্মিত হওয়াও দুঃসাধ্য। এই দুঃসহ যন্ত্রণাকালে আমি মনস্ত করি, পরিবর্তনে যে ভূয়োদর্শন আমার ঘটেছে, তার বিবরণ আমি রাখবো। প্রতিয়ার ধারাবাহিকতা স্মরণকালে আমি মূলত ঘটনার ওপর মনোযোগী হয়েছি—ব্যক্তিত্বের প্রতি নয়। শয়তান থেকে দরবেশের চিহ্নিকরণ ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দিছি।

আমি আনন্দিত এই কারণে যে, ১৯৭১ সালের সংকট সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহারে পাকিস্তান সরকার কিংবা সেনাবাহিনী সদর দফতর আমাকে কোন সুবিধা দেয়নি। ফলত এই অগ্রহণ ঢাকার পতন সম্পর্কে আমার সহজাত স্মৃতিকে ধরে রাখতে সক্ষম করেছে। (সরকারি দলিলপত্র—যা শেষ অধ্যায়ে এসেছে, সেগুলো ঢাকায় লভ্য ছিল; এমনকি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর ভারতীয়দের কাছে পাওয়া গেছে।) আমার সিদ্ধান্তের সংযোজনে, সংশোধনে অথবা প্রতিবাদমূলক যে কোন সরকারি বিবরণ আমি সানন্দে গ্রহণ করবো।

## সৃষ্টি

- ঘটনাপ্রবাহ এবং শক্তা ১৩  
জোড় মুখে চাপ ২১  
মুজিব শিখরে আরোহণ করলেন ২৫  
সামরিক আইনের তামাশা ২৯  
নির্বাচন সবকিছুর জন্য মুক্ত : ৩৪  
সংকটের সৃষ্টি : ৩৯  
মুজিব ক্ষমতা নিলেন ৫০  
ত্রিভুজ ৬৫  
অপারেশন সার্টলাইট : এক ৭৬  
অপারেশন সার্টলাইট দুই ৮৩  
সুযোগ হাতছাড়া হলো ৯৫  
বিদ্রোহ : ১০১  
রাজনীতি—দেশে এবং বিদেশে ১১১  
বিপর্যয়ের মুখোযুধি ১১৭  
পরাজয়ের জন্য সমাবেশ ১২৩  
হিসাব-নিকাশ শুরু ১৩০  
প্রথম দুর্গের পতন ১৩৯  
উত্তরাঞ্চল ভেঙ্গে পড়লো ১৪৭  
ভাঙ্গন ১৫৫  
চ্যালেঞ্জের মুখে চাঁদপুর ১৬৭  
চূড়ান্ত পশ্চাদপসরণ ১৭৫  
ঢাকা : নাটকের শেষ অংক ১৮৫  
আত্মসমর্পণ ১৯৬  
পরিশিষ্ট ২০৫-২১৩

## ঘটনা প্রবাহ এবং শংকা

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সামরিক শাসন আইন জারির প্রথম বার্ষিকীর দিন ছিল সেটি<sup>১</sup>। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের একটি মফস্বল শহরে যাচ্ছিলেন নির্বাচনী সমাবেশে বক্তৃতা দিতে। তার গাড়ি ঘটেছে আওয়াজ তুলতে তুলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। পেছনের সিটো বসেছিলেন এক অবাঙালি সাংবাদিক। তিনি নিজের খবরের কাগজের জন্যে তার নির্বাচনী সফরের সঙ্গী হয়েছিলেন। চলতি কিছু ঘটনার কথা উৎপন্ন করে তিনি শেখ মুজিবকে উক্ষে দিলেন এবং সংগোপনে নিজের ক্যাসেট রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিলেন। পরবর্তীকালে এককভাবে সংগৃহীত নিজের এই মহামূল্যবান সম্পদ তিনি তাঁর বন্ধুদের শোনান। তিনি আমাকেও শুনিয়েছিলেন। মুজিবের বাগীসুলভ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বোধগম্য ছিল। তিনি বলছিলেন, ‘যেভাবেই হোক আইউব খান আমাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলেছে। এখন আমি যা চাইবো তাতে কেউ ‘না’ করতে পারবে না। এমনকি ইয়াহিয়া খানও আমার দাবি উপেক্ষা করতে পারবেন না।’

কী ছিল তার দাবিগুলো? ইয়াহিয়া খানের গোয়েন্দা বাহিনীর সংগৃহীত আরেকটি টেপ থেকে সূত্রটি পাওয়া গেল। বিষয়টি ছিল লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) সম্পর্কিত। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ সরকার এ আদেশটি জারি করেন। তা ছিল শাসনত্বের খসড়া চিত্র। এই আদেশ বিখ্যাত ছয় দফা বাস্তবায়নের ব্যাপারে মুজিবের হাত বেঁধে ফেললো। এলএফও'র ওপর তিনি তার মতামত অতি নির্ভরতার সাথে বলছিলেন তার সিনিয়র সহকর্মীদের কাছে। কিন্তু আঁচ করতে পারেননি তার উচ্চারিত বাক্যের শ্রাবক হবেন ইয়াহিয়া খান, তার জন্যে টেপ হয়ে যাচ্ছে। রেকর্ড করা টেপে মুজিব বলেন ‘আমার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে কে?’ যখন এই টেপ ইয়াহিয়া খানকে শোনানো হল, তিনি বললেন ‘যদি সে বিশ্বাসযাতকতা করে, তা হলে আমি তাকে দেখে নেবো।’<sup>২</sup>

১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে হালকা মালপত্র নিয়ে আমি ঢাকায় এলাম। কিন্তু ভাবনায় ছিলাম ভারাক্রান্ত। সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের বিষয়ে আমি ভীত ছিলাম না বরং অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, মুজিবুর রহমানের ছয় দফা হচ্ছে অবগুঠনের আড়ালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা মাত্র। ১৯৬৮ সালের আগরতলা ঘড়্যন্ত ছিল এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি পদক্ষেপ। আমি এই দু'টি অভিযোগের কোনটারই সত্যতা সম্পর্কে কিছু জানি না। ভাবলাম, আমার বাঙালি দেশবাসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা নেবো।

১. ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কম্বান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয় বাবের যতো দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করেন।
২. জি ডবলিউ চৌধুরী, দি লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, সি হার্স্ট অ্যান্ড কোম্পানি লিম্স, পৃষ্ঠা - ৯৮

ঢাকায় যাওয়ার পথে সেখানকার ২৫ হাজার সদস্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কথা ভাবলাম,—যাদের সঙ্গে আমি যুক্ত হতে যাচ্ছি। ভাবলাম, ১৮০০ কিলোমিটারব্যাপী রাষ্ট্রসীমার কথা—যার ওপর দিয়ে উড়ে এসেছি। যদি ভারত কখনও পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমাদের বিচ্ছিন্ন গ্যারিসন সেই অভিযানের জবাব কী দিতে পারবে? আমি পাকিস্তানের একজন অনুগত নাগরিক। সেহেতু এই চিন্তাটা আমার কাছে দারুণ অস্বস্তিকর ছিল। সুতরাং বিষয়টি মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমি পুরনো দিনের সেই মিষ্ঠি স্মৃতিচারণের মাঝে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকাতে এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন একজন বাঙালী। অতএব, পাকিস্তানের কোন বিপদ হতে পারে না।

তেজগাঁও বিমানবন্দরে নামলাম। বিমানবন্দরটি যেন সবুজ শাড়ি পরে আছে, মাথার ওপর সাদা মেঘ রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। হাস্যোজ্জ্বল সূর্যকে আড়াল করতে পারছিল না। পরিবেশ ছিল শান্ত, স্থগিতায়ক। একই বিমানে করে কয়েকজন সামরিক আইন কর্মকর্তাও এসেছিলেন। তারা ভিআইপি রুমে গিয়ে উঠলেন। তাদের মালামাল গৰ্ভন্মেন্ট হাউসের রূপালি প্রেট লাগানো গাড়িতে ওঠানো হল। বাঙালি মুটে ধাক্কাধাকি করে তাড়াতাড়ি কাজটি সম্পন্ন করলো। অফিসাররা হাওয়ার গতিতে গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ধুলোর কুণ্ডলী বাতাসে মিলিয়ে গেল।

আমি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার বাহনের আশায় ছিলাম।<sup>৩</sup> অবশেষে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি আমাকে পৌছে দিতে চাইলো। গাড়ির পাশ দিয়ে এক বাঙালি কিশোর হেঁটে যাচ্ছিল। তাকে ড্রাইভার আদেশ করলো আমার সুটকেস জিপে তুলে দিতে। ছিন্নবন্দু পরিহিত কিশোরটি ড্রাইভারের আদেশ হষ্টচিত্তে নিল না; বরং ত্রুদ দৃষ্টিতে তার ‘প্রভুর’ দিকে তাকালো এবং আদেশ পালন করলো। তার সাদা চোখের মণি আমার দিকে ঘূরলো। শরীরের কালো রংয়ের ডেতের সাদা মণির দৃষ্টিকে দার্শণ মর্মভোদী মনে হলো। আমি তাকে পয়সা দিতে গেলে ড্রাইভার আর্টিষ্টকার করে উঠলো, ‘করছেন কী? এই হারামজাদাদের আর নষ্ট করবেন না।’ কিশোরটি আরেকবার ঘৃণাভরে তাকালো এবং চলে গেল। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ক্যান্টনমেন্টের পথ ধরলো। অর্ধচন্দ্র ও তারকাখচিত জাতীয় পতাকা টার্মিনাল ভবনের শীর্ষে পত পত করে উড়ছিল।

যারা বিমানবন্দরে গিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুতি করেনি তারা সম্ম্যায় অফিসার মেসে হাজির হলো। তারা আমাকে উক্ষণ অভ্যর্থনা জানালো এবং তাদের অনুপস্থিতির কারণে বিমানবন্দরে যে অসুবিধা আমাকে পোহাতে হয়েছে, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো। যখন পূর্ব পাকিস্তানের সবকিছুতেই ‘তাপ’ সঞ্চারিত হচ্ছে, সে সময় এখানে বদলি হয়ে আসার জন্যে তারা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলো। কেউ কেউ তখনকার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জ্ঞানদান করলো এবং এ রকম উপদেশের মুক্তা ছড়ালো ‘মার্শাল ল’ এখানে কার্যকর নেই”; ‘ঘর গেরহালির জন্য বেশি মালসামান কেনার দরকার নেই। কেননা,

৩. পি আই-এর একটি ট্রাইডেক্ট বিমানে করে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লাহোরে আসার পর তার ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়ায় সেটা পরিষ্কার হয় এবং একটি বোয়িংয়ে করে আসতে হয়। ফলে ঢাকার বন্দুদের খবর দেয়া সম্ভব হয় না।

তুমি তো জানো না, কী অবস্থায় এবং কখন তোমাকে বাস্তু-প্যাটরা বাঁধতে হবে', 'তোমার ব্যাংক একাউট শহরের কর্মশিলাল ব্যাংক থেকে ক্যান্টনমেন্টের ন্যাশনাল ব্যাংকে নিয়ে এসো', 'তুমি যার জায়গায় বদলি হয়ে এসেছো তারই ফ্লাটে থাকার চেষ্টা কর। ওই ফ্লাটটি বাস্তৱের মতই নিরাপদ, কেউই এর ভেতর বোমা ছুঁড়ে মারতে পারবে না।'

কেন একজন বাঙালি আমার বাড়িতে বোমা মারবে? আমার মনে হল আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের ভীতিটা কল্পনামাত্র। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের কোন লক্ষণই দেখলাম না।

অধিকতর শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে পত্নীকে টেলিগ্রাম করলাম চলে আসার জন্য। অবশ্য আমার বন্ধুরা এটাকে একটি ঝুঁকিবহল পদক্ষেপ বলে মনে করলো। কয়েকদিনের মধ্যেই পত্নী এসে গেলেন এবং সেই বাস্তু'র মত ফ্লাটে গিয়ে উঠলাম। দিন কয়েকের মধ্যেই একদল বাঙালি আমার বাড়িতে আক্রমণ হানলো। কিন্তু তারা বোমা ছুঁড়ে মারা বিচ্ছিন্নতাকামী নয়। তারা ছিল কর্ম-প্রত্যাশী আয়ার দল—যারা পশ্চিম পাকিস্তানির বাসায় কাজ করতে অধিকতর আগ্রহী। অনেকটা স্বাধীনতা-পূর্বকালের ভারতীয় চাকরুর যেমন বৃত্তিশৈলের বাড়িতে কাজ পাওয়ার জন্যে হন্তে হয়ে ঘুরতো, তেমনি। পরের দিন জানতে পারলাম, আমার স্ত্রী দু'টো আয়া রেখেছেন। এটাকে অমিতব্যয়িতা বলে মনে হল। দুটো আয়া নিয়োগের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, 'রাওয়ালপিণ্ডিতে একটাকে রাখতে যে বেতন দিতে হতো, এখানে দু'টোর জন্যে তার চেয়েও কম বেতন দিতে হবে।'

স্ত্রীর ঢাক্কায় আসার পর আমি গাড়ি চালিয়ে টঙ্গীতে পাকিস্তান সিরামিক ইন্ডস্ট্রিতে গেলাম বাসন-কোসন কেনার জন্য। ঢাকা থেকে টঙ্গীর দূরত্ব প্রায় চৌদ্দি কিলোমিটার। যাওয়ার পথে বাস্তবতার নতুন যাত্রা আমার মানসপটে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। এমন ধরনের দারিদ্র্যের দৃশ্য নজরে এলো—যা কাজের খোঁজে আসা আয়াদের ভিড় জমানোর কারণটা আমার কাছে সহজবোধ্য করে তুললো। মেয়েরা তালি দেয়া ময়লা এক চিলতে কাপড় জড়িয়ে আক্রম ঢাকার চেষ্টা করছে। পুরুষ হ্রস্ব শরীরের এবং ক্ষুধার্ত। চলত গাড়িতে বসেও তাদের বুকের কালো চামড়ার পাতলা স্তরে ঢাকা হাড় গোনা যায়। শিশুদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাদের উদর বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কারো কারো কোমরে বুলছে ঘন্টি বাঁধা খেলন। এটাই তাদের একমাত্র খেলনার বস্তু। যেখানেই আমি থেমেছি সেখানেই ভিক্ষুকের দল আমাকে মাহির মত ঘিরে ফেলেছে। আমি সিন্ধান্তে উপনীত হলাম যে, বাংলার দারিদ্র্য পশ্চিম পাকিস্তানের দারিদ্র্যের থেকেও দারিদ্র্যতর। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কিত অভিযোগের অর্থ আমার কাছে পরিক্ষার হতে শুরু করলো। নিজেকে অপরাধী মনে হলো।

আমার সে সব বন্ধুদের উপদেশের কথা মনে পড়লো—যারা এখানকার অবস্থা সম্পর্কে জানদানের চেষ্টা করেছিলেন। এই ক্ষুধার্ত জনতা যদি প্রচণ্ডতা নিয়ে জেগে ওঠে তাহলে তারা দোকানপাট লুট করতে পারে, আঘাত হানতে পারে সেনানিবাসে এবং এমনকি আমার ফ্লাটেও বোমা ছুঁড়ে মারতে পারে। ফ্যাট্রি গেটে পাজামা ও কোট পরিহিত এক দীর্ঘকায় বলশালী লোকের সাথে দেখা হল। তিনি একজন পশ্চিম পাকিস্তানি, নাম নিয়াজি। কারখানা

নিরাপত্তা সহকারী। চেহারার সাদৃশ্যই আমাদের পরিচিতির সূত্র হয়ে গেল। আন্তরিকতার সাথে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আস্থাভরে কথা বলতে শুরু করলেন। এখানে আসার কারণ জানালাম তাকে। তিনি বললেন, ‘দয়া করে আপনি নিজে গিয়ে অর্ডার দেবেন না। এখানকার বাঙালি শ্রমিকরা পক্ষিম পাকিস্তানি অফিসারদের দেখতেই পারে না। ভৈষণ শক্রভাবাপন্ন। তারা ইচ্ছা করেই অর্ডার নষ্ট করে দেয়। ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিন।’ ঢাকায় ফিরে এসে আমার বন্ধু ক্যাটেন চৌধুরীর কাছে আমি আমার সারাদিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলাম। ক্যাটেন চৌধুরী পাঞ্জাবের লোক, এই হীন দারিদ্র্য অবস্থার বর্ণনা—যা আমি নিজ চোখে দেখেছি, তা তাকে স্পর্শ করতে পারলো না। অন্যদিকে তিনি বিদ্যুতাক কষ্টে বাঙালিদের অলস স্বভাব নিয়ে বলতে শুরু করলেন, ‘তারা একটি ব্যাপারে উদ্যোগী। আর তা হলো পরিবার পরিকল্পনার উপদেশকে অগ্রহ্য করা....আমি চিত্রের অপর পিঠ দেখানোর জন্য তোমাকে শহরে নিয়ে যাবো।’

প্রথম সুযোগেই তিনি আমাকে শহরে নিয়ে গেলেন এবং বিশাল বিশাল ভবনের আশপাশ দিয়ে গাড়ি চালালেন। দেখলাম স্টেট ব্যাংক, গভর্নমেন্ট হাউস, হাইকোর্ট ভবন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়াম, নিউ মার্কেটসহ কিছু ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবন। তিনি কুকুরের মত গোঁ গোঁ আওয়াজ করে বললেন, ‘কিছুই ছিল না এখানে। যদিও বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং টর্নেডো সাংবাংৎসরিক ব্যাপার তথাপি এগুলো ১৯৪৭ সালের পরেই হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার আয় এবং ব্যয়ের বিষয়টি তুলে ধরে মুজিবের অর্থনৈতিক শোষণের তথ্যকে উড়িয়ে দেয়া উচিত।’

যখন বাস্তবতা মুজিবের বিপক্ষে, আমি ভাবলাম, তখন কেমন করে তিনি জনগণকে তার পাশে টানবেন? আবার ভাসানীও আছেন এবং তিনি একটি সমান্তরাল শক্তির নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আছে দক্ষিণপাহাড়ীরা,—যারা দেশের দুই অংশের মধ্যে ইসলামিক ভাতৃ-বন্ধনের ওপর জোর দিচ্ছে, সেখানে মুজিব কীভাবে এগোবেন? নির্বাচনই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে তার পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আছে কি-না।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলো এবং সেদিন থেকে শুরু হলো নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্ব। বামপন্থী ছাত্ররা মধ্যরাতে মশাল শোভাযাত্রা করে নতুন বছরকে স্বাগত জানালো লাল বিপুরের পক্ষে শ্লেষণ তুলে। পর দিন পূর্ব পক্ষিস্তান ছাত্রলীগ (যা আওয়ামী লীগের সহযোগী) জনসভা করে ঘোষণা করলো, ‘ছয় দফাই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ’ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো—যেগুলো দক্ষিণপাহাড়ী রাজনৈতিক দলের যেমন, জামায়াতে ইসলামীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে বলে পরিচিত, সেগুলো তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্যে কিছুই করলো না। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলো যেমন, কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কেএসপি), পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ (পিএনএল), পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি (পিডিপি), জমিয়াতুল ওলামায়ে ইসলাম (জেইউআই) এবং বিভক্ত মুসলিম লীগের একটি অংশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাজনৈতিক অঙ্গে প্রবেশ করলো। কিন্তু পেশী প্রদর্শনের প্রচেষ্টা তাদের ভেতরকার দুর্বলতাকেই প্রকটিত করে তুললো। তারা নজর কাঢ়ার মত কিছুই করতে পারলো না।

ইতিমধ্যে তিনটি রাজনৈতিক দল প্রদেশে তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নেমে পড়লো। আওয়ামী লীগ ১১ জানুয়ারি পেটন যয়দানে জনসভা করলো; পরের সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামী একটি বড়সড় জনসমাবেশ ঘটলো এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানীপট্টি) ১৯ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের কাছাকাছি সন্তোষ-এ একটি কৃষক সমাবেশ করলো। সবদিক দিয়েই আওয়ামী লীগের সভাটি ছিল দেখবার মতই এবং সুসংগঠিত। জনসমাবেশের ধরনও ছিল চমৎকার। সাংবাদিকতার ভাষায় এটা ছিল একটি ‘বিশাল’ জনসভা। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু তেমন স্মরণীয় কিছু ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রথম নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিলেন। বললেন, বাংলারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে<sup>৪</sup> সংখ্যা সাম্য নীতি মেনে নিয়ে ভুল করেছে। তিনি আরো বলেন, আজকে যদি কেউ একে বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো তা হলে তিনি প্রতিরোধ আদোলন গড়ে তুলতেন।

মি. মঙ্গল হোসেন, ব্যারিস্টার-এট-ল, মরহুম তোফাজ্জল হোসেন<sup>৫</sup> ওরফে মানিক মিয়ার সুযোগ্য সভান, এ জনসভায় কয়েকদিন পর আমাকে বলেছিলেন, তার পিতার জীবৎকালে বাংলাদের কাছে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রাণের সন্তানার সুযোগ ছিল। ‘কিন্তু আপনারা অনেক দেরি করে ফেলেছেন।’ মি. হোসেনের দাবি পরখ করার জন্য তাঁর পূর্বসূরীদের কথা উল্লেখ করতে তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, সোহরাওয়াদীর পরলোকগমনের<sup>৬</sup> পর একমাত্র মানিক মিয়াই ছিলেন মুজিবের ওপর প্রভাব বিস্তারী ব্যক্তিত্ব।’

পরের রোববার একই যয়দানে জামায়াতে ইসলামী তাদের প্রথম নির্বাচনী জনসভা করলো। জামায়াত এ সভার গুরুত্ব উপলক্ষ্য করে একে সফল করে তোলার যাবতীয় চেষ্টা করে কিন্তু চোখের পলকে সভাটি একটি হাতাহাতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। দু'জন মারা গেল এবং আহত হলো পঞ্চাশজন। এদের মধ্যে পঁচিশ জনের অবস্থা গুরুতর। পার্টির আমির মওলানা আবুল আলা মওদুদী শুধু এ জনসভাতেই বক্তৃতা করার জন্যে লাহোর থেকে উড়ে এসেছিলেন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাকে মাঠ ত্যাগ করতে হলো। ওই খণ্ডুদের পর থেকে একটি মন ভাঙা ও অক্ষম রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াত প্রতিভাত হলো।

এ রক্তবরা সংঘর্ষের জন্যে জামায়াত আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করলো। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রটি ‘জয়বাংলা’ শ্বেগানে ছিল উচ্চকিত। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সংঘর্ষের ব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্য রাখলো। কেননা, এ ঘটনাটি নির্বাচনে তাদের জন্যে ক্ষতিকর ছিল তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। দু'পক্ষ যুক্তি-জাল বিস্তার করে চললো। অন্যদিকে এই দুই রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্য-যুদ্ধের ব্যাপারে প্রশংসনের ভূমিকা ছিল সাংঘাতিক রকমের সন্দেহজনক। পুলিশ কোথায় ছিল? আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য তারা হস্তক্ষেপ করলো না কেন?

- 
৮. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১২ জানুয়ারি, ১৯৭০
  ৫. জনপ্রিয় বাংলা দেনিক ইলেক্ট্রোফার-এর মালিক ও সম্পাদক। তিনি সোহরাওয়াদীর সহযোগী ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ৩০ মে মারা যান।
  ৬. এইচ এস সোহরাওয়াদী পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও মুজিবের রাজনৈতিক গুরু। ১৯৯৬ সালে বৈকুত্তের একটি হোটেলে মৃত্যুবাহ্য পাওয়া যায়।

একজন সিনিয়র মার্শাল ল' অফিসার আমাকে বলেছিলেন, তিনি জনসভায় জামায়াতকে সরকারি ছত্রচায়া দেয়ার প্রত্বাব দিয়েছিলেন। কিন্তু জামায়াতের পক্ষ থেকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। 'আমরা সবকিছুর ব্যবস্থা রেখেছি', তাকে জামায়াতের তরফ থেকে বলা হয়েছিল। অফিসারের ধারণা হলো, জামায়াত প্রমাণ করতে চাইছে যে, যদি আওয়ামী লীগ কোন সাহায্য ছাড়াই সাফল্যজনকভাবে সভা করতে পারে, তা হলে তারা কেন পারবে না? তাদের মতে, একটি দুর্বলতর দলই সরকারি ছত্রচায়া কামনা করে। আমি এ বিষয়টি জামায়াত-ঘেঁষা একজন সাংবাদিকের কাছে উপাপন করলাম। তিনি বললেন, 'না, জামায়াত ছত্রচায়ার প্রত্বাব ফিরিয়ে দেয়নি। সরকার বেড়ার ওপর বসেছিল তার দল নিরপেক্ষ চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।'

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কৃষক সমাবেশ। শুরু হলো নানা ভেরী নিনাদের মধ্যে দিয়ে। যদিও এ কৃষক সমাবেশ সংগঠিত করেছিল ন্যাপ (ভাসানী), কিন্তু যেসব দল সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। সরকার টাঙ্গাইলে যাওয়ার জন্যে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করলেন। সমাবেশ যাতে সফল হয় সেজন্য ওই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হলো। গর্ভনমেন্ট হাউসের কিছু রাজনৈতিক পেঁচক চাইছিলেন ন্যাপকে (ভাসানী) আওয়ামী লীগের সমান শক্তিধর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বাড়িয়ে তুলতে এবং ধরে রাখতে।

কোন বিরোধী গ্রুপ সমাবেশে ক্ষতিকর কিছু করলো না কিন্তু ভেঙ্গে পড়লো এর ভেতরকার বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে। এ সমাবেশ কিছু বিপুর্বী শোগানের জন্য দিল। যেমন, 'রক্ত না, আগুন—আগুন আগুন' 'ব্যালট না বুলেট—বুলেট বুলেট'।

অতি-বিপুর্বীদের গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ন্যাপের জেনারেল সেক্রেটারি তোয়াহ। তিনি নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিরোধিতা করলেন প্রচণ্ডভাবে এ যুক্তিতে যে, এতে সরকারের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে না। তোয়াহ বিশ্বাস করতেন, লাল বিপুর্বের মাধ্যমেই সত্যিকারের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

কয়েকদিন পর একটি সংবাদপত্র অফিসে তোয়াহার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। ন্যাপ (ভাসানী) থেকে বেরিয়ে আসা নিয়ে তিনি বললেন, 'আমি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করি। কেননা এ দলে কোন স্ফুলিঙ্গ নেই। আগুন জুলে না। আমি, অতঃপর, ন্যাপের প্রতিষ্ঠা করি বিপুর্বী উদ্দেশ্য নিয়ে। এটাও সে চরিত্র হারিয়েছে। এ দল এখন আওয়ামী লীগের মত স্ফুলিঙ্গহীন। নির্বাচনের পরে আমি নতুন করে আমার কর্মধারা প্রণয়ন করবো।'

আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল ছিল—যেমন, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি, জমিয়াতুল ওলেমায়ে ইসলাম এবং মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপ। এ গ্রুপগুলো থেকে মাত্র একটি কঠস্বরই শোনা গিয়েছিল। কঠস্বরটি ছিল পিডিপি'র প্রধান মি. নূরুল আমীনের। তিনি ছিলেন শারীরিকভাবে অসুস্থ। সংযম, সহনশীলতা এবং ন্যায্য আচরণের কথা তিনি বললেন। কিন্তু বললেন এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগের নানান দাবি প্রচণ্ড নির্ধার্ষে নিনাদিত হচ্ছে, সেখানে সুস্থ কঠস্বর নিতান্তই দুর্বল, বেসুরো হিসেবে প্রতিভাত হলো। আসলে

রাজনৈতিক মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর নানা শ্রেণীর আদর্শে পরিগত হয়ে যাচ্ছিল। এ প্রবণতাকে কে ঠেকাবে? যাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব ছিল বলে ধরা হতো, তারা হয় এ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। নতুবা ইচ্ছে করেই এ ব্যাপারে নিজেদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে বধির করে রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক পরিষ্কৃতি সম্পর্কে ধারণা নেয়ার পর আমি ধনিক শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দিকে মুখ ফেরালাম। এরা দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে একট বড় রকমের ভূমিকা রেখে চলেন।

বাঙালি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত্কার পর্যায়ে যেমন, রেহমান, আহমেদ এবং ভুইয়া জোরালো যুক্তি দিয়ে বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ঘটছে পূর্ব পাকিস্তানের আয়ের অর্থে। আওয়ামী লীগপন্থী পত্র-পত্রিকা অভিযোগ করে, দেশের শতকরা ৬০ ভাগ রাজস্ব আয় করে পূর্ব পাকিস্তান আর এই আয় থেকে রাজস্বের শতকরা ২৫ ভাগ খরচ করা হয় এখানে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ লাভ করে কিন্তু আয় করে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ। এছাড়া, তারা 'অযৌক্তিক ও অনুপযোগী' বাণিজ্য প্রথা নিয়ে সবিস্তারে বজ্রব্য রাখলেন। তাদের কথায় 'এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে'। তারা বললেন, 'আমাদের বগলের তলায় দূরপ্রাচ। সেখান থেকে মাল আসছে (যেমন, রবার) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। কিন্তু জাহাজ ভিড়ে করাচিতে। একই মাল করাচি হয়ে আসছে চট্টগ্রামে। এতে জাহাজ ভাড়ার অংকই শুধু বেড়ে যাচ্ছে না—অধিক সময়েরও প্রয়োজন পড়ছে।' দেশাভ্যন্তরে মালামাল চলাচলের ব্যাপারে তারা বললেন, 'সেনাবাহিনী ব্যবহৃত পাট-তস্ত দিয়ে তৈরি জালের কথাই ধরুন। পাট এবং পাটকলগুলো এখানে। কিন্তু পাট তস্ততে তৈরি জালকে রঞ্জিত হবার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানে সফর করতেই হবে। তারপর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সেনা ইউনিটের ব্যবহারের জন্য দেয়া হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের পবিত্র স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। ব্যবসায়িক পণ্যের জন্যে এ কথা যেমন সত্য,—তেমনি রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকদের বেলায়ও।'

বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টের চিত্র একই রকমের হতাশাব্যঙ্গক। ঢাকাতে আমার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হয় পাকিস্তান কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল ইন্টেলিগেন্সের বাঙালি আবাসিক পরিচালকের সঙ্গে। তিনি আমাকে তার লাইব্রেরিটি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। চিত্রকলা বিভাগের তাকের সামনে গিয়ে নয়নাভিরাম ছাপা এবং বাঁধাই করা একটি বই টেনে বের করে রাগতস্বরে বললেন 'দেখুন, আমাদের হেড অফিস (রাওয়ালপিণ্ডি) এটা পাঠিয়েছে। জনগণের অর্থের কি অপচয়! কোন বাঙালি কবির কবিতার বইয়ের ওপর এ ধরনের চিত্রকলার বই কি আপনারা ছাপিয়েছেন।' তার ক্ষেত্রে কারণ ঘটিয়েছিল 'মুরাক্কা-ই-চুগতাই' পৃষ্ঠাটি। বইখানা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু কবি গালিবের কবিতার ওপর। দুর্লভ চিত্রকর্ম সম্পর্কিত। তিনি রাজনৈতিক পুস্তকাবলি বিভাগের সামনে গিয়ে থামলেন এবং বললেন, 'এই সেলফের যাবতীয় বই 'আপনাদের কামেদ-এ আয়ম'-এর ওপর।' আমি তাঁর 'আপনাদের' শব্দটি মনে গেঁথে নিলাম এবং ওই স্থান ত্যাগ করলাম।

কয়েকদিন পর আমি ফিল্ম সেপর বোর্ডের একটি সভায় হাজির হলাম। ছবিতে নকল প্রবণতা প্রতিরোধের পথ খুঁজে বের করার জন্যে সভাটি ডাকা হয়েছিল। সভাতে ঢাকা ফিল্ম ইনসিটিউটের প্রতিনিধিসহ চলচ্চিত্র গন্তব্য লেখক, নির্মাতা এবং প্রযোজকরা হাজির ছিলেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান জাতীয় মর্যাদা ও পরিচিতির কথা তুলে ধরে নকলের বিরুদ্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখলেন। এরপর একজন প্রথ্যাত বাঙালি লেখক নিম্নবর্ণিত ঘূর্ণি উৎপন্ন করলেন

‘ডাকা ফিল্ম ইনসিটিউটের সমস্যা নিয়ে ১৯৬৫ সালে একটি উচ্চ পর্যায়ের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ইনসিটিউটের স্বার্থে ওই সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখনকার ঐতিহ্যবাহী উৎস সংগ্রহের ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না। আমি সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রস্তাব রাখতে চাই, সরকার যেন সেই পূর্বতন সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন এবং কলকাতার জন্য দরোজা খুলে দেন। আমরা কীভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক ‘কাবা’র দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে রাখতে পারি।’

সভার সভাপতির আনুগত্যের বিষয়টি ছিল সন্দেহজনক। তিনি আমাকে একটি ব্যঙ্গাত্মক হাসি উপহার দিলেন এবং বজ্ঞার অনুরোধে সভা ভেঙ্গে দিলেন।

বাঙালিদের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগের পর আমার ধারণা হলো, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মানসিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। জোড়া কী আর লাগবে? অথবা ‘দু’ অংশের বন্ধন কী পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা জাতীয় সেনাবাহিনীর ২৫ হাজার সৈন্যের প্রতি নিবিষ্ট হলো-যারা জাতীয় সংহতির সর্বশেষ রক্ষাকর্তা।

## জোড় মুখে চাপ

১৯৭০ সালের গোড়ার দিকেই রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, বৃক্ষজীবী এবং অন্যরা মানসিক দিক দিয়ে যদি পঞ্চম পাকিস্তান থেকে দূরে সরে গিয়ে থাকে তাহলে বাঙালি সৈনিকরা কী এই ভাইরাস থেকে নিরাপদ? অভ্যন্তরীণ কোন বিশঙ্গলা দমনের জন্যে কী তাদের ওপর নির্ভর করা যাবে? ভারতীয় আক্রমণের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে? তারা কী তাদের ভাবাবেগের দিক এবং মানসিকভাবে সমগ্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

আমিই সেই ব্যক্তি নই—যে সর্বপ্রথম এ প্রশ্নের মুখোযুধি হয়। আমার আগেও কয়েকজনকে এই প্রশ্নটি তাড়িয়ে ফিরতে থাকে। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জি ও সি) মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা আমাকে বলেছিলেন যে, ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসের ‘স্থানীয় ও অস্থানীয়’ দাঙ্গা তার মনেও এ আশঙ্কার জন্ম দেয়। যখন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে বাঙালি সৈন্যদের নিয়োগ করা হয় তখন তারা কাজ করে তবে দেমন্ড ভাব ছিল তাদের মধ্যে। ফলে তিনি সেনাবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে (জিএইচকিউ) এই প্রদেশে পঞ্চম পাকিস্তানি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করে এবং বাঙালি ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের পদাতিক রেজিমেন্টের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে বলেন। জিএইচকিউ প্রস্তাব দু'টি অঘাত করে। কেননা, তারা ১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই জাতির উদ্দেশে দেয়া প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর জোর দেয়। প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালি অঙ্গীদারিত্বের কোটা দিগুণ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট আরো ঘোষণা করেন, এটাই হচ্ছে বাঙালির অভিযোগ প্রতিবাধানের প্রথম পদক্ষেপ। এ অঙ্গীকার যে প্রেসিডেন্ট করেছিলেন’—তিনি সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কও ছিলেন। হয় তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর মনঙ্গাত্ত্বিক দিকের খবর জানতেন না অথবা কোন রাজনৈতিক কারণে ষেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই ভিন্ন তরঙ্গ খাতে কাজ করছিলেন।

মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা অনুধাবন করেন যে, তার পরামর্শ জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে সেজন্য তা বাস্তবায়নে চাপ দেন। এক চমৎকার সকালে সেনা সদর দপ্তর থেকে তিনি একটি গোপন চিঠি পেলেন। চিঠিটি খোলেন এই আশা নিয়ে যে, তার পরামর্শ সম্ভবত গ্রাহ্য হয়েছে। বদলে তাতে পুরোপুরি কেবলমাত্র ‘বাঙালিদের নিয়ে আরো দু'টো ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি করতে সর্বাধিনায়কের আদেশ জানিয়ে দেয়া হলো। বাঙালিদের নিয়ে গঠিত সাতটি ব্যাটালিয়ন বর্তমান। এর চারটে পূর্ব পাকিস্তানে।

চিঠি পেয়ে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-এর মেজাজ বিগড়ে গেল। নতুন আদেশ কর মারাত্মক হতে পারে, তা বোঝানোর জন্য তিনি রাওয়ালপিণ্ডি উড়ে গেলেন। সেনা সদর দপ্তরকে তিনি বললেন, ‘যদি বাঙালিদের সমন্বয়ে একটি আর্মি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হয়, তবে তা কেবল স্বতন্ত্রভাবে ইস্টবেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সঙ্গেই তা করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ‘আপনারা সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্য চান, দেশের সংহতি কামনা করেন তা হলে দেয়া করে বর্তমানের ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নগুলিকে সেনাবাহিনীর বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করুন।’

১. ৮ ইস্ট বেঙ্গল গঠন করতে হবে চট্টগ্রামে আর ১০ ইস্ট বেঙ্গল ঢাকায়। সদর দফতরকে ব্যাটালিয়ন গঠনের স্থান পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করা হয় যেহেতু অভ্যন্তরীণ দুটোর—একটি ঢাকা গুরত্বপূর্ণ বিমানবন্দর অন্যটি চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। কিন্তু অনুরোধ রাখা হয় না।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রেসিডেন্টের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। রাজনৈতিক বিবেচনা তাকে চালিত করে প্রতিরক্ষা বিভাগে বাঙালি প্রতিনিধিত্ব বর্ধিতকরণে। অন্যদিকে ঘটনাস্থলের ব্যক্তি তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন বাঙালিদের নিয়ে স্বত্বভাবে গঠিত বর্তমানের বাঙালি ব্যাটালিয়নগুলি থীরে থীরে বিচ্ছিন্ন করতে। এ ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিতে অন্যান্য দোটানায় পড়া সেনানায়করা যা করেন—জেনারেল ইয়াহিয়া খানও তা-ই করলেন। তিনি সমস্যা সমাধানের জন্যে আপোষ ফর্মুলার প্রচেষ্টায় নামলেন। পরীক্ষামূলকভাবে বাঙালি-ব্যাটালিয়নগুলি থেকে শতকরা ২৫ ভাগ বাঙালি সৈন্যকে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এফএফ) ও পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। বলা হলো, যদি এই পরীক্ষা বাঙালি সৈন্য কিংবা বাঙালি রাজনীতিবিদদের মধ্যে কোন রকমের বিশ্রী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহলে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে এ নীতিকে অনুসরণ করে যেতে হবে। ইতোমধ্যে নতুন ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন গঠনের কাজও চলতে থাকবে।

১৯৬৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার দুর্গ স্টেডিয়ামে ‘সংযোজন প্যারেড’ অনুষ্ঠিত হলো। উনিশ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সঙ্গে এক কোম্পানি বাঙালি সৈন্যর সংযুক্তি উপলক্ষে এই প্যারেডের আয়োজন করা হয়। উনিশ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সে পাঠান এবং পাঞ্জাবির সংখ্যা ছিল সমান সমান। আনুষ্ঠানিক প্যারেড হয় জনসমক্ষে। উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মার্চপাস্ট হলো। জিওসি হাতের তালুতে হাত চেপে বেসেছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, নতুন পরিবেশে কোন ছল-ছুঁতোয় বাঙালিরা যদি বিদ্রোহ করে বসে (উদাহরণস্বরূপ, খাওয়ার ক্ষেত্রে গ়মের জায়গায় ভাতকে যদি অগ্রাধিকার দেয়) তাহলে সমগ্র পরিকল্পনাটি বুমেরাং হয়ে আঘাত হানবে।

যাহোক, উনিশ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সঙ্গে বাঙালি সৈনিকরা চমৎকারভাবে মিলে গেল। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার কর্তব্য তারা যৌথভাবে পালন করলো। সাধারণ অদল-বদল পদ্ধতির প্রক্রিয়ায় কিছুদিন পর ব্যাটালিয়ানটিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হলো। এ পদক্ষেপে জাতীয় সংহতির পক্ষে জিওসির পরিকল্পনার সত্যতাকে দৃঢ়ত্ব করলো। কিন্তু এ ব্যাপারে থীরে চলার জন্যে প্রেসিডেন্ট তাকে আদেশ দিলেন। পরিকল্পনাটি অত্যন্ত গোপন রইল। অন্যদিকে বাঙালিদের কোটা দিগন্তে করার প্রেসিডেন্টের নির্দেশের বাস্তবায়ন জোরেসোরে এগিয়ে চললো। প্রচার বিভাগ তাদের যত্নপাতি ঝাড়া-মোছা করে পুরোদমে সক্রিয় হয়ে উঠলো। আমি এ বিভাগের একজন অনুগত ব্যক্তি ছিলাম বলে আমাকে এর ওপর একটি নিবন্ধ লিখতে বলা হলো চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেন্টারের কমান্ডান্টের সঙ্গে আলোচনা করে। এ সেন্টারটি সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিত।

সেন্টারের কমান্ডান্ট ছিলেন খর্বকায় বলিষ্ঠ দেহের কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) মজুমদার। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় তিনি ছিলেন উদ্বীগ্ন। তাঁর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এ সম্পর্ক তাঁর মধ্যে এক ধরনের বিরল অহঙ্কার ও বিদ্বেষ জন্য দেয়। তাঁর অহঙ্কার ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য আর বিদ্বেষ পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। তাঁর অফিসের সামনে ফুল গাছে ছাওয়া লনে আমার সাথে তাঁর দেখা হলো এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। এক ঘন্টা আলাপ হলো। আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মালো যে, তাঁর যে সুনাম শুনেছি তা ভিত্তিহীন নয়। তিনি গর্বভরে নিজের

গুরুত্ব সম্পর্কে বললেন। বললেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালিদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে সে সম্পর্কেও। বললেন, 'কোটা ছিংশ করার ব্যাপারে কেন নিজেরাই তোমরা তোমাদের ঢেল পেটাতে চাছ? এমন কী যদি প্রেসিডেন্টের আদেশের পুরোপুরি বাস্তবায়ন ঘটে তা হলেও এর অর্থ দাঁড়াবে বাঙালিদের জন্যে শতকরা ১৫ ভাগ প্রতিনিধিত্ব। অর্থ এরা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ।'

মজুমদারের কাছ থেকে 'ব্রিফিং' নিয়ে বেরিয়ে এসে দুপুরের খাবার খেলাম একজন পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারের সঙ্গে। আলাপচারিতা অনিবার্যভাবে সেন্টার কমান্ডান্টকে ঘিরে আরম্ভ হলো। আমার মেজবান ছেট্ট একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, নতুন রিক্রুটদের শেষ দলটির করাচির উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে কর্নেল তাদের বললেন, 'এখন তোমরা একেকজন গর্বিত বাঙালি সৈনিক। তোমরা ওখানে পাঞ্জাবি অফিসারদের জুতো পালিশ করার জন্য যাচ্ছা না। সৌদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তারাই তোমাদেরটা পালিশ করবে।'

মজুমদার একাই শুধু বাঙালি সৈনিকদের পৃষ্ঠপোষক এবং পথ প্রদর্শক ছিলেন না। তাঁর কর্মভাব ভাগ করে নিয়েছিলেন একজন কর্মরত লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। ফেরুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ঢাকার উত্তরে জয়দেবপুরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের জুনিয়র টাইগারদের যখন রেজিমেন্টাল কালার উপহার দেয়া হয়, সে সময় এই দু'জনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্নেল কমান্ডান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন অভিবাদন গ্রহণ এবং কালার বিতরণ করবেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের পেছনের আসল প্রেরণা ছিলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী। তিনি ঢাকায় অবসর জীবনযাপন করছিলেন এবং আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে ছিলেন সক্রিয়।

অনুষ্ঠানের দুই দিন আগে এই দুই অফিসার আমাকে চতুর্দশ ডিভিশনের মেসের ভিআইপি সুইটে ডেকে পাঠালেন। সেখানে তারা অনুষ্ঠানের জন্য জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের বক্তৃতা লিখে তৈরি করে রেখেছিলেন। আমাকে সেই বক্তৃতার এক কপি দেয়া হয়। তাতে কর্নেল ওসমানীর কর্মকাণ্ডের উচ্ছুসিত প্রশংসা করা হয়েছে এবং বাঙালি সৈন্যদের উপদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর উপদেশ মেনে চলে। পরবর্তীকালে এই বক্তৃতার ছাপানো কপি দেশের দুই অংশের বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কর্নেল ওসমানী ছোটখাটো দেহের শীর্ণ মানুষ। তাঁর বোদে পোড়া মুখবয়বের বৈশিষ্ট্য ছিল ঠাঁটের এক জোড়া পাকা গুঁফ। একজন সহকর্মী অফিসার প্রায়শই তাঁকে 'একজোড়া গোঁফ'-এর একটি মানুষ বলে বর্ণনা করতেন (সংকটে তাঁর ভূমিকা পুষ্টকের শেষ দিকে বলা হয়েছে।)

একজন সেনা কমান্ডার হিসেবে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা সৈনিকদের ওপর জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন, কর্নেল মজুমদার এবং কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) ওসমানীর সম্মান্য প্রভাব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। এমন কী এটা ছাড়াও তিনি জানতেন যে, চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনে সৈন্যদের নিরাপদ সুরক্ষণ কোনভাবে বিঘ্নিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি স্মরণ

২. পরে তিনি আওয়ামী লীগের টিকিটে জাতীয় সংসদের সদস্য হন এবং মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হন।

করলেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি অবিভক্ত ভারতের মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে এক ধরনের আবেগ সঞ্চাত অঙ্গীকার জন্য হওয়ার কথা। যদি পাকিস্তানের স্বাধীনতা আসতো বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যের শুখলা ভেঙে পড়ার আগে, সৈন্যদের রাজনৈতিক প্রোৎসাহনের কারণে, এর অর্থ এই নয় যে, বাংলি সৈন্যরা শাস্তি পূর্ণ উপায়ে স্বাধীনশাসনের জন্য উদাসীনভাবে অনিদিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতো।

তিনি আশংকিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে—একদিন না একদিন তাদেরকে বিদ্রোহের জন্যে উত্তেজিত করা হবে। আগরতলা স্বত্যন্ত তার আশংকাকে দৃঢ়তর করলো। ইউনিট আর্মারি দখলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের নিরস্ত্র করে ক্যাস্টেনমেন্ট দখল করা ছিল ওই স্বত্যন্তের লক্ষ্য। তিনি তাই ব্যক্তিগতভাবে তার ব্রিগেড কমান্ডারদের (অবাঙালি) ডেকে পাঠালেন। বললেন তাদের অস্ত্রের একাংশ আর্মারিতে না রেখে যেন ইউনিট লাইনেই রাখে। উপদেশ দিলেন, ‘অবশ্যই সেগুলো যেন জরুরি সময়ে ব্যবহার উপযোগী হালকা ধরনের হয়।’ এ ব্যাপারে কোন লিখিত আদেশ দিলেন না। পরে তিনি আমাকে বলেন, ‘যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল সে কারণে লিখিত আদেশ দেয়া যায় না।’

জিওসি কী কল্পিত ভয়ে বাতিক্ষণ্ট হয়ে উঠেছিলেন? যদি ব্যাপারটির আদৌ অস্তিত্বেই না থাকে তাহলে এটা কী পরম্পরের মাঝে অবিশ্বাসের বীজ বপন করবে না? হতে পারে এর কোন অস্তিত্বেই নেই, হতে পারে কল্পনা কিন্তু এতে আমরা এমনভাবে আক্রান্ত যে, প্রতিটি ঘটনা আমার এর আলোকেই ব্যাখ্যা করছি। দ্রষ্টান্তস্মরণ, আমি একদিন আমার বাংলি সহকর্মীর অফিসে যাই। অফিস রুমে চুকে দেখি তিনি আরেক বাংলি অফিসারের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় মগ্ন। আমি প্রবেশ করতেই তারা চুপ মেরে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য একটা অস্পষ্টিকর মুহূর্ত নাড়া দিয়ে গেল আমাদের ওপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী হচ্ছে?’ ইতোমধ্যেই আমার মেজবান আমার আকস্মিক চুকে পড়ার ধাক্কাটা সামলে নিয়েছেন। বললেন, ‘আগামী রোববারে মাছ ধরতে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা করছিলাম।’ আমি বললাম, ‘আমি কী আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি?’ তিনি মুহূর্ত মাত্র থামলেন, তারপর বললেন, ‘না প্রোগ্রামটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।’ আমি বুঝে নিলাম, তারা মুজিবের বাংলাদেশের সম্মতি আলোচনা করছেন।

পরে কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে বাংলি ও পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের মধ্যে সৃষ্টি বিশ্বাসহীনতার কথা জানালাম। তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী। আমার অভিজ্ঞতাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করলাম তিনি সে ভাবে করলেন না। কী ভাবে সৃষ্টি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে সে ব্যাপারে তিনি আমাকে ‘আলোকিত’ করলেন। আমি আমার অফিসে ফিরে এলাম।

জেনারেল এবং আমি সম্ভবত দুই ধরনের অফিসারদের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম। জুনিয়ার—যারা তাদের সীমাবদ্ধ বোধশক্তির কারণে ইঁদুরে তোলা মাটিকে বানায় পর্বত আর সিনিয়ররা,—যারা তাদের পরিজ্ঞানের গভীরতার কারণে পর্বতকে বানায় ইঁদুরের মাটি। আসলে এটা পর্বত না ইঁদুর তোলা মাটি, তা স্পষ্ট জানা গেল না। সবকিছুই সেনাবাহিনীর শুখলার ভাবিন্ন নিয়মের ছান্দোবরণে ঢাকা ছিল। আওয়ামী লীগ এবং তার সমর্থকরা নির্বাচনের জন্যে পুরো একটি বছর হাতে পেলো সেই আবরণ তুলে ফেলতে।

## মুজিব শিখরে আরোহণ করলেন

আওয়ামী লীগ পরিব্যাপ্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বাঙালি সৈন্য ও অসামরিক জনগণকে সংক্রমিত করতে থাকে। অবশ্য এই চেতনা দুত এবং তীব্র প্রভাব বিস্তার করে জনগণের ওপর। এই ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রজাতন্ত্র দিবস (২৩ মার্চ), স্বাধীনতা দিবস (১৪ আগস্ট), কান্ডেন-এ আজমের জন্য ও মৃত্যুবার্ষিকীর (২৫ ডিসেম্বর, ১১ সেপ্টেম্বর) মত জাতীয় দিবসগুলোকে চেপে রাখার চেষ্টা করলো। অন্যদিকে সার্জেন্ট জহরুল হকের মৃত্যু দিবস, ভাষা দিবস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবসের মত প্রাদেশিক দিবসগুলোকে দ্বিগুণ উৎসাহে ভুলে ধরতে শুরু করলো।

সার্জেন্ট জহরুল হক ১৯৬৮ সালে মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আগরতলা ঘড়্যন্ত মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালে সামরিক আটকাবস্থায় তিনি মারা যান। তার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় ১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মূলত আওয়ামী লীগের নির্দেশে। পালিত হয় প্রদেশের উনিশটি জেলার সতেরটিতেই। ঢাকার প্রধান প্রধান দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় তাঁর সচিত্র জীবনীসহ ধ্রতিবেদন ছাপা হয়। কয়েকটি জনসভায় তাঁর অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয় এবং শপথ নেয়া হয় যে, ‘তার রক্ত বৃথা যেতে দেয়া হবে না।’ শেখ মুজিবুর রহমান এই ধরনের একটি জনসভায় বলেন, ‘জহরুল হক একজন মহান দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিতুমীর এবং সূর্যসেনের মত মহান দেশপ্রেমিকদের সাথে জনগণ তাকে স্মরণ করবে।’<sup>১</sup>

এক সপ্তাহ পরে ছিল ভাষা দিবস। বাঙালির আবেগের সাথে জড়িত একটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একে পালন করা হয় ‘অনুপ্রেরণার দিবস’ হিসেবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে শুন্দি প্রদর্শনের জন্যে সংবাদপত্রগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো। বিপুল সংখ্যক মানুষ আজিমপুরে ‘শহীদদের’ গোরস্থান পরিদর্শনে গেল। চারুকলা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা চমৎকার রুচির পরিচয় রেখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শহীদদের প্রতি শুন্দি নিবেদন করলেন। এর আগে এক জনসভায় তিনি দাবি করলেন বাংলা ভাষাকে সরকারি বিভাগের সকল শরে চালু করতে হবে।<sup>২</sup> এরপর ৮ মে এলো বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী। তাঁর যাবতীয় সাহিত্যকর্মের প্রচার সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও, টেলিভিশনে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিলো। কেননা, সেগুলো ‘ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ এর উৎসঙ্গ ঘটায়। ঢাকার খবরের কাগজগুলো প্রথম পাতায় তাঁর বড় ছবি ছাপালো এবং তাঁর সাহিত্য কর্মে তার অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করলো। সাহিত্যকর্মের অনুবাদও ছাপলো। বাঙালি তরুণরা আনন্দ-উল্লাসের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলো। তাঁর উদ্দেশে শুন্দি নিবেদনের জন্যে সঙ্গীতানুষ্ঠান করলো। মুজিব

১. দি পার্লিম্যান অবজারভার, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০

২. দি মনিং নিউজ, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০

৩. দি মনিং নিউজ, ঢাকা ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

নিজেই প্রকাশ্যে এবং ঘরোয়াভাবে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করলেন।

দুই অংশের সম্পর্ক দুর্বলতর হতে পারে এমন প্রতিটি বিষয় আওয়ামী লীগ সমর্থন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিতে থাকলো। দৃষ্টান্ত দেয়া যায়—ছাত্ররা সরকার অনুমোদিত দেশ ও কৃষি (দি ল্যান্ড অ্যাভ দি পিপল) নামের একটি পুস্তকের বিবরণে আন্দোলনে নামে। কারণ পুস্তকটিতে আদর্শগত দিক দিয়ে পঞ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছিল। সরকারের বিবরণে তারা কামরুন্দিনের নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘সোশ্যাল হিস্ট্রি’ নামক পুস্তকটির পক্ষাবলম্বন করলো। কেননা, পুস্তকটিতে কলকাতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ঘোষণাগুলির কথা বলা হয়েছে। ছাত্রদের এ আন্দোলন নামকরা কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা সমর্থন করলো। মুজিব এই বিষয়ে তাঁর সমর্থন দিয়ে বললেন, ‘বাংলা ভাষা (১৯৫২) আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী পূর্বতন সমস্ত শক্তিকে হাটিয়ে দেয়া হয়েছে। এবার বাঙালির সাংস্কৃতিক সম্পদের ওপর আক্রমণকে প্রতিহত করা হবে।’<sup>8</sup>

আওয়ামী লীগ আঘাত হানতে থাকে দুই অংশের ঐক্যের আবেগকে দৃঢ়তর করার প্রতিদ্বন্দ্বিদের প্রতিটি উদ্যোগকে। তারা জামায়াতে ইসলামীর জানুয়ারির জনসভাকে পও করেছিল। কেননা, ওই সভাতে দুই অংশের বন্ধনের প্রশংসন ইসলামী ঐক্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। নির্বাচনী অভিযানের বাকি সময়টা ও লীগ তার দাবিয়ে রাখার এই কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। দলটি ১ ফেব্রুয়ারিতে পিডিপি'র ঢাকার জনসভা, ২৮ ফেব্রুয়ারির চট্টগ্রামের জনসভায়, সৈয়দপুরে ৭ মার্চের জনসভা পও করে। কুমিল্লায় ১০ মার্চের কনভেনশন মুসলিম লীগের জনসভা, বরিশালের ১৫ মার্চ এবং ঢাকায় ১২ মার্চের জনসভায় গভর্ণেল লার্গিয়ে দেয়া হলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপ আয়োজিত আরো কয়েকটি জনসভাও পও করে দেয়া হয়।

মুজিবের প্রতিপক্ষ যেমন ফজলুল কাদের চৌধুরী, খান এ সবুর খান, মি. নূরুল আমিন, প্রফেসর গোলাম আজম এবং মৌলভী ফরিদ আহমেদ জনমাঝে তাকে চালেঞ্জ করার রাজনৈতিক শক্তি ধরতেন না। পল্টন ময়দানে তার মতো একই নিনাদে হংকার তুলতে পারতেন সেই বয়োবৃন্দ ভাসানী। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি আন্দোলনের ধারাকে ধরে রাখায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি জনতার সামনে হংকার তুলতে পারতেন, নিজেকে সরিয়ে নিতে পারতেন আপন ঘরে এবং ইচ্ছামত নিজের মতের পরিবর্তন ঘটাতেন। তিনি প্রথমে পয়লা আগস্ট গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিলেন। যখন পয়লা আগস্ট এলো তখন স্থগিত করে সরিয়ে নিলেন ৮ সেপ্টেম্বর, তারপর গেলেন পয়লা অক্টোবর এবং অবশেষে কিছুই ঘটলো না। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনি তার প্রচণ্ড প্রভাব হারালেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে মুজিবের অভিযানের উথান এবং তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ক্রমান্বয় পতন ভবিষ্যতের ঘটনা প্রবাহের ধারা সম্পর্কে আমাদের মনে আর বিদ্যুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখলো না। এটা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, নির্বাচনের দিন-তারিখের মধ্যেই তার ছয় দফার জন্য মুজিব বিপুল সমর্থন লাভ করবেন। ছয় দফার

8. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০

বাস্তবায়ন যদি ঘটে যায় তাহলে পাকিস্তানের বর্তমান অবয়ব থাকবে কী? যদি তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাদের অভিযথা থাকে তবে এই প্রবণতা কীভাবে রোধ করা যাবে?

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মঙ্গী পরিষদের এক সভায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান জাতীয় সংহতি বনাম ছয় দফার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ‘আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয়ে আমাকে পরিষ্কার হতে হবে তার ছয় দফা প্রচারণা সামরিক আইনের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের লজ্জন কী? (এই অনুচ্ছেদে জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে যে কোন বক্তব্য নির্বিন্দ করা হয়েছে।) তাকে বলা হয়েছিল, ‘এ নিয়ে ভাববেন না।’ কিন্তু দেশের অনেকে ছিলেন চিন্তিত। সম্ভবত জনগণের ভীতি প্রশংসনের জন্য প্রেসিডেন্ট পদাধিকারবলে তার যাবতীয় কাজকর্ম রেখে সময় বের করে নিলেন এবং ৩০ মার্চ বেতারে হাজির হলেন। এবং তিনি ঘোষণা করলেন, ‘জাতির মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী কোন কিছু আমি গ্রহণ করবো না।’ তিনি তার ঘোষণার পর দিনই লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) জারি করলেন। এই আদেশ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের জন্যে মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করলো। নিশ্চিত করলো ‘অলজন্মীয় জাতীয় সংহতি’ ও ‘প্রজাতন্ত্রের ইসলামী চরিত্র’ অঙ্গুল রাখার বিষয়টি। আমি এলএফও পড়ে স্বত্ত্বার নিঃশ্঵াস ফেললাম। কেননা, এই আদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ছুরির পোঁচ পড়লো। তাদের রাজনীতি প্রজাতন্ত্রের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র এবং দেশকে কার্যত স্বশাসিত প্রদেশে বিভক্তির কথা প্রচার করছিল।

লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডারে মুজিবের জন্যে দারুণ বিরক্তি উৎপাদন করে। আদেশের অনুচ্ছেদ ২৫ এবং ২৭ তাকে বিশেষভাবে উত্তোলিত করলো। অনুচ্ছেদ দুটিতে প্রেসিডেন্টকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রকে প্রমাণীকরণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এর অর্থ, যদি মুজিব জাতীয় পরিষদে (পার্লামেন্ট) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটেও লাভ করেন তাহলেও তিনি মুক্ত হাতে ছয় দফার বাস্তবায়ন করতে পারবেন না—যতক্ষণ না শাসনতন্ত্রিক বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করছে। এই সেই বিষয়, —যার ওপর মুজিব বলেছিলেন, ‘নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো।’

পরিস্থিতি নিজে ধারণের জন্য প্রেসিডেন্ট ঢাকায় উড়ে এলেন। বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য তিনি ৪ এপ্রিল মুজিবকে আমন্ত্রণ জানালেন। মুজিব যখন পৌছলেন আমি তখন সেখানে ছিলাম। যথেষ্ট উক্ষতা ও সৌজন্যের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হলো তাকে। তারা আলোচনায় বসতেই আমাকে চলে আসতে হলো। এবং এক ঘন্টা পর আমাকে আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে খুঁজে আনা হলো ক্যাবিনেট ডিভিশনের পক্ষ থেকে এলএফও’র যে ধারার (ধারা ২৫ এবং ২৭) ব্যাপারে মুজিবের আপত্তি ছিল, তার সংশোধনীর ওপর প্রেস নোটের খসড়া তৈরির জন্য। প্রেস নোটের খসড়া তৈরি করে দিয়ে চলে এলাম। সৌভাগ্যবশত তা প্রচারের জন্য পাঠানো হয়নি। কারণ, ইতিমধ্যে কেউ একজন ইয়াহিয়াকে এই পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নিজেকে একেবারে নিরস্ত্র না করেন।

১০ এপ্রিল পঞ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার পথে সাংবাদিকরা বিমান বন্দরে ইয়াহিয়া খানকে

৫. দি পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিণ্ডি, ৩১ মার্চ, ১৯৭০

ধিরে ধরলো এল এফও'র বিতর্কিত অনুচ্ছেদগুলো নিয়ে। আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। 'জনপ্রতিনিধি প্রীত শাসনতাত্ত্বিক বিলে প্রেসিডেন্টের ভেটো প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা' সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখার জন্য চেপে ধরলো। ইয়াহিয়া খান বললেন, 'ওটা একটা আনুষ্ঠানিক কর্মপ্রণালীর ধারা মাত্র। ওই ক্ষমতা প্রয়োগের কোন ইচ্ছাই আমার নেই।' এক আওয়ামী লীগপত্নী সংবাদিক ঘাড়ের ওপর দিয়ে আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তিনি শেখ সাহেবকে (মুজিব) আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি ওসব ব্যবহার করবেন না। ওই অনুচ্ছেদগুলো অনেকটা ইংল্যান্ডের রাণীকে দেয়ার মতই শাসনতাত্ত্বিক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।'

আমি জানি না, ইয়াহিয়া খান তার দেয়া অঙ্গীকারের বদলে মুজিবের কাছ থেকে কী ধরনের 'আশ্বাস' লাভ করেছিলেন। আমি শুধু জানি, এই আশ্বাস আওয়ামী লীগ প্রধানের মনে এই ধারণা দৃঢ় মূল করে যে, তিনি এমন এক জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহণ করেছেন—'যেখানে দাঁড়িয়ে আমি যা চাইবো সেখানে এমন কী ইয়াহিয়া খানও "না" করতে পারবেন না।'

ইয়াহিয়া-মুজিব বোঝাপড়ার দুই মাসের ভেতর মুজিব আরো বেশি আস্থাবান হয়ে উঠলেন। হাতের তাস আরো খানিক মেলে ধরলেন। ৪ জুন তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমার দল আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে। ছয়দফা কর্মসূচির ওপর গণভোট হিসেবে।'<sup>৬</sup> পিডিপি প্রধান মি. নৃকুল আমিন পর দিন এই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, ওই কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচন যদি গণভোট হয়, যদি ওই কর্মসূচি পশ্চিম পাকিস্তানের সমর্থন লাভ না করে, 'সেক্ষেত্রে এই অবস্থায় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে।'<sup>৭</sup> এই বক্তব্য মুজিবকে উত্তেজিত করে তোলে। তিনি পর দিন আরো স্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, 'গাঞ্জী-নেহেরু এবং তাদের বৃত্তিশ প্রভুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা ১৯৪৬ সালে গণরায় পেয়েছিলাম। এবং এবারও নৃকুল আমিন ও তার প্রভুদের (পশ্চিম পাকিস্তানি) বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা জয়ী হতে যাচ্ছি।'<sup>৮</sup> মুজিব যে ঐতিহাসিক সমান্তরাল রেখা টানেন তা ছিল অমঙ্গলজনক। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তিনি পাকিস্তানের সুষ্ঠার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যাচ্ছেন—যিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনার ব্যাপারে ১৯৪৬ সালে গণরায় লাভ করেছিলেন। মুজিব কী সেই একই পরিণতির লক্ষ্যে কাজ করছেন? ঢাকায় ইয়াহিয়ার একজন প্রতিনিধি ঘৰোয়াভাবে তার কাছে এই বিষয়ের ওপর প্রশ্ন রেখেছিলেন, মুজিব অঙ্গীকার করলেন। এটা তার সর্বগ্রণ্থম রাজনৈতিক ডিগবাজি ছিল না কিংবা সর্বশেষও নয়। কয়েকটি ঘটনার কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠল। দেখা গেছে, জনসমক্ষে তিনি হাজির হয়েছেন ভয়াবহ চেহারায় কিন্তু ঘরে পরিণত হয়েছেন একজন শান্তশিষ্ট মানুষে। এই দ্বিতীয় জনগণকে যেমন তার স্বপক্ষে এনেছে তেমনি তিনি তার সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কৃত্পক্ষের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তিনি তার রাজনৈতিক ভেলায় চড়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে পৌছলেন।

৬. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা ৫ জুন, ১৯৭০

৭. প্রাতঃক ৬ জুন, ১৯৭০

৮. প্রাতঃক ৭ জুন, ১৯৭০

## সামরিক আইনের তামাশা

ঢাকার বেসরকারি ও সামরিক আইন প্রশাসক উদাসীন দৃষ্টিতে রাজনৈতিক জোয়ার-ভাটার প্রবাহ অবলোকন করছিল। জোয়ার ছিল আওয়ামী লীগের পক্ষে আর ভাটা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য। ঘটনা প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য তেমন কিছুই করা হলো না। এবং এমন বিশেষ কিছু কর্তব্য কর্ম অবহেলা প্রদর্শন করা হলো, যা মুজিবের হস্তকে আরো উন্মুক্ত করলো। সংখ্যাগরিষ্ঠকে তার বশীভূত করে দিল। এটা হয়েছিল সম্ভবত এই বাঞ্ছালি নেতার প্রতি ইয়াহিয়া খানের নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অনুমান নির্ভর ধারণার বিস্তার ঘটেছিল। অনেকেই বিশ্বিত হয়েছিলেন এই ভেবে, একজন একনায়ক কেন এমন একজন রাজনীতিকের প্রতি এতটা স্বাচ্ছন্দ্য (দ্রষ্টান্তস্বরূপ, একজনের এক ভোট) দিচ্ছেন—যাকে তার পূর্বসূরিয়া দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কাঠগড়ায় হাজির করেছিলো? জনপ্রিয় ধারণা এই ছিল, ইয়াহিয়া খান মুজিবের মন জয় করতে চেয়েছিলেন যাতে সামরিক আইন তুলে নেয়ার পরও তিনি প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেন। এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান অবশ্য ভিন্ন কারণ দেখিয়েছিলেন। আমার উপস্থিতিতেই তিনি বেশ কয়েকবার বলেছিলেন, ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানকে আমি সঙ্গে নিয়ে এগোতে চাই। যদি মুজিব না হন তবে আর কে আছেন যিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন?’

ইয়াহিয়া খানের বাধ্যবাধকতা যাই হোক, আওয়ামী লীগ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাধু বা অসাধু উপায় অবলম্বনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। মার্শাল ল’ সদর দফতরের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং গভর্নমেন্ট হাউসের প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান—দু’জনের কেউই আওয়ামী লীগের অশ্বের রশি টেনে ধরার জন্য কিছুই করলেন না। কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক অশ্বেকেও বিজয়ী করবার জন্য পরিচালিত করলেন না। সম্ভবত এটা শেছাপরিকল্পিত নীতি ছিল নির্বাচনী প্রচারাভিযান নিরপেক্ষ থাক।

১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে গভর্নর এস এম আহসানের ওপর (সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াকুব খান থাকা সত্ত্বেও) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ যাবতীয় প্রাদেশিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। সামরিক আইন প্রশাসন যত্ন তখনই সাহায্যের জন্য এগোবে যখন বেসরকারি প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে কিংবা অকেজো হয়ে যাবে। তাঁদের দু’জনকে সরাসরি জবাবদিহি করতে হবে ইয়াহিয়া খানের কাছে—যিনি একাধারে প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও সেনাবাহিনী প্রধান।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চেতনা পুনরুজ্জীবনের সময়কালে ইয়াহিয়া খানের ‘ধীরে পা দানি চালাও’ নীতি প্রয়োগে ন্যূন স্বভাবের বুদ্ধিজীবী দৃষ্টিকোণসম্পন্ন মানুষ জেনারেল ইয়াকুব ছিলেন উপর্যুক্ত মনোনীত ব্যক্তি। তার ব্যক্তি আকর্ষণ ছিল একটি অতিরিক্ত মূল্যবান বস্তু। ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তান নৌবাহিনীর অধিনায়কের মতো সম্মানজনক পদ থেকে সরিয়ে প্রাদেশিক গভর্নর করা হয়েছিল। মানসিক ধাতের দিক

দিয়ে এই নতুন চাকরি তার জন্য উপযুক্ত ছিল না। ওই ধরনের সংকটকালে গভর্নর পদের জন্য দরকার ছিল অসাধারণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, দৃঢ় প্রশাসনিক দক্ষতা ও বহিমুখী মেজাজসম্পন্ন একজন ব্যক্তির। পরিবর্তে আহসানের মধ্যে ছিল সাধু সন্ন্যাসীর মত নির্জনপ্রিয়তা, পণ্ডিতের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং কূটনীতিকের আনুষ্ঠানিকতা। এই সমস্ত গুণাবলি অন্য কোথাও হয়তো বড়-সড় ব্যাপার হয়ে উঠতে পারতো কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা ছিল দুর্বলতা।

এটা তার জন্য খারাপ অবস্থা তৈরি করলো। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের দুই প্রধান স্তম্ভ হলো প্রেসিডেন্ট এবং সৈন্যদের কমান্ড, দু'টোর কোনটাই আস্থা অর্জন করতে পারলেন না। তার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক সরকারি নথিপত্রের মধ্যে কঠোরভাবে সীমিত হয়ে পড়লো। কর্তব্য কর্মের সাধারণ ধারা অনুযায়ী প্রধান নির্বাহীকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানাতেন। সহচর হয়ে যেতেন প্রেসিডেন্ট ভবন পর্যন্ত। তারপর সেখান থেকে নিজের নিরাপদ অগ্রণ্যস্থল গভর্নমেন্ট হাউসে এসে চুপচাপ বসে থাকতেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হাউসে ফিরতেন তখনই, যখন তাকে সরকারি কাজের জন্য ডাকা হতো। এবং এ ধরনের ঘটনা কদাচিত ঘটতো।

ফলে আহসানকে পুরোপুরি তার বাঙালি চিফ সেক্রেটারি মি. শফিউল আজমের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হতো, যিনি একই সাথে আওয়ামী লীগ, মার্শাল ল' হেড কোর্টার ও গভর্নমেন্ট হাউসকে খুশি রাখার বিল প্রতিভা ধরতেন। দেখতে তিনি কচ্ছপের মতো (লম্বা গলা দ্রুত ঠেলে বেরিয়ে আসা এবং দ্রুত পলায়নক্ষম) পুরু চর্ম এবং স্থির পদক্ষেপসম্বলিত। জেনারেলদের গতির বিরুদ্ধে গিয়ে আওয়ামী লীগের দৌড়বাজিকে কীভাবে জয় করতে হয়, তা তিনি জানতেন। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ পদে তাকে পেয়ে আওয়ামী লীগ খুশিই ছিল। এমনকি কিছু লোক এই ধরনের জল্লনা-কজ্জলনা শুরু করে যে, প্রাদেশিক প্রশাসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাকে ধ্রুণ করেছেন। এই দুর্বল প্রশাসনের গড় ফল দাঁড়ালো এই—পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অভাব পরিলক্ষিত হলো। সাধারণ আইনকে সরিয়ে আসা সামরিক আইন দুর্বল প্রমাণিত হলো। অ্যাডমিরাল আহসান গভর্নর হিসেবে তার ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরে আমাকে বলেছিলেন, ‘সামরিক আইনে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। সমস্ত প্রধান অপরাধগুলির বিচার সামরিক আইনের আদেশে ও নিয়মের অধীনে হওয়ার কথা। অথচ এসব প্রয়োগের ক্ষমতাই আমার নেই। সামরিক আইন প্রশাসক একাই এটা করতে পারেন। কিন্তু মনে রেখ, তাকে জবাবদিহি করতে হবে ইয়াহিয়া খানের কাছে, আমার কাছে নয়।’

প্রশাসনের ক্রম অবনতিশীল দুর্বলতা এবং মজিবুর রহমানের ক্রমবর্ধমান শক্তি অনিবার্য কিছু ফলাফলের জন্য দিল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তো অবনতি ঘটলাই—এই সাথে শিল্প এলাকা, বাণিজ্যিক তৎপরতা এবং শিক্ষাসনের দৈনন্দিন জীবনে সৃষ্টি হলো অনিষ্টয়তা, অস্থিরতা এবং বিশ্বজ্ঞলা। সবচেয়ে বেশি আঘাত এলো ফ্যাট্টরি ও কলকারখানাগুলো ওপর। ধর্মঘট, লকআউট কিংবা লে-অফ হরহামেশাই ঘটতে থাকলো। কখনো কখনো এগুলো এমন আশ্চর্যজনক কায়দায় বন্ধ হয়ে যেত তাতে মনে হতো, যেন পেছনে কোন যাদু-হস্ত রয়েছে এসবের শাটার নিয়ন্ত্রণে। ফলে শিল্প-কারখানা যেমন আদমজী জুট মিলস, নিশতার

জুট মিল, খুলনা জুট মিল, চট্টগ্রাম স্টিল মিলস, বিক্রমপুর জাহাঙ্গীর স্টিল মিলস এবং খুলনা নিউজ প্রিস্ট মিলস মাঝে-মধ্যে খুলতো পরস্পর বিরোধী শ্রমিক গ্রহণের মধ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হবার জন্য অথবা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকের মধ্যে। এক সময় সামরিক আইন প্রশাসন তার উষ্ণ মন্তিক হড়কোর পশ্চাতে স্থাপন করেছিল। কিন্তু কদাচিং পরিস্থিতিকে শান্ত করতে পারে। এটা ধর্ঘঘটী শ্রমিকদের আরো উত্তোলিত করে ফেলে। মে মাসের ২৯ এবং ৩০ তারিখে প্রায় দশ হাজার শ্রমিক খুলনা জেল গেট ভেঙ্গে তাদের সাথীদের মুক্ত করে আনার চেষ্টা করে। এর এক সন্তান আগে একদল শ্রমিক সহকারি সুপারিনেন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ মি. ফজলুর রহমানকে হত্যা করে। তিনি একটি স্টিল মিলের বাইরে শ্রমিকদের পিকেটিং ভাড়তে চেষ্টা করেছিলেন। তার দেহ টেনে ছিঁড়ে নিয়ে আসা হয় এবং অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। কারণ ‘পশ্চিম পাকিস্তানিদের দালাল’ হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা হয়। মৃত ব্যক্তির জন্য মুজিব সহানুভূতিসূচক একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। সরকার বিরোধী শক্তির সপক্ষে তার সমর্থন রয়ে গেল।

শিল্পাঞ্চলের বিরাজমান এই বিভাস্তিক পরিবেশে ইক্সাটন রোডের একটি নামি বন্দের দেকানে গেলাম। তাদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উচ্চমানসম্পন্ন পণ্যের গাঠিত প্রচার আমাকে চমৎকৃত করলো। এটাকে ম্যানেজার তার অভিযোগ পেশের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলো। বললো, ‘আমরা ১২.৫ মিলিয়ন টাকা খরচ করে এই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহিত কারখানাটি তৈরি করেছি। বছরে এই কারখানাটি ১২৫ মিলিয়ন টাকার পর্য উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। দেশের ভেতরে ব্যবহারের জন্য ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার মাল আলাদা করে রেখে আমরা রঙানির জন্য বিদেশী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু বিরামহীন শ্রমিক অসন্তোষের দরক্ষণ দেয় অঙ্গীকারের সম্মান আমরা রাখতে পারছি না। সিঙ্গাপুর মক্কেলের প্রতিনিধি তার প্রতিষ্ঠানের জন্য জাহাজে মাল ওঠানোর নিশ্চয়তা লাভের আশায় এক সন্তান যাবৎ শহরে এসে বসে আছে। কেননা, সে ক্রেতার কাছে পাকা কথা দিয়ে এসেছে। তাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমাদের সমস্যার ব্যাপারে সে সহানুভূতিশীল। কিন্তু নতুন এবং পাকা তারিখ দেয়ার জন্য সে চাপ দিচ্ছে। আমি কীভাবে তাকে পাকা কথা দিতে পারি? কেননা আমি নিজেই জানিনা আমার ফ্যাট্রি কবে খুলবে। আর খুললে তা কতদিনের জন্য?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কর্তৃপক্ষকে আপনি আপনার সমস্যার কথা জানিয়েছেন?’ তিনি বললেন, ‘বেশ কয়েকবার। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে গেছে তারা বলে এটা বেসামরিক ব্যাপার। বেসামরিক সরকারের কাছে গেলে তারা আমাকে কিছু মিষ্টি অঙ্গীকার উপহার দিয়ে বিদায় দেয় এবং কার্যকর কিছুই করেনি। দেখে শুনে মনে হচ্ছে কোন সরকার নেই। অন্তত এমন কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করতে পারে।’

শ্রমিক ছাড়া ছাত্রাও পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্বাল পরিস্থিতিতে অবদান রাখে। পরীক্ষা নেবার সময় হচ্ছে গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে। তারা একটা না একটা অছিলায় পরীক্ষা বয়কট করে চলে। তারা ঘেরাও, পরীক্ষক এবং পরীক্ষা তত্ত্ববিধায়ককে লাপ্তিত ও ছুরি মারতে দিখা করতো না। যখন তারা ক্ষিণ হয়ে উঠতো তখন জানালার কাঁচ, বিদ্যুৎ বাতির ঢাকনা—ফুলের টব ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলতো। কলেজের আসবাবপত্রেও আগুন লাগতো।

যখন পরীক্ষা থাকতো না সে সময় সরকারকে চাবকানোর জন্য ছিল সর্বক্ষণের জন্য দণ্ডায়মান তাদের ১১ দফা। মূলত দফাগুলো থেকে শিক্ষাবিষয়ক দাবি ছেঁটে ফেলা হয়েছিল।

দাবিগুলি ছিল মূলত রাজনৈতিক, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের, বাঙালি জাতীয়তাবাদের। মজার ব্যাপার ছিল এই, পরীক্ষার হলে ছাত্রদের অসদুপায় অবলম্বনে যে সব শিক্ষক বিরক্তাচরণ করতেন, সেইসব শিক্ষকই ১১ দফাকে সমর্থন করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন।

যে চেতনা শিল্প শ্রমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চার করে, দ্রুত তা সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে গিয়ে বাসা বাঁধে। তাদের নয় দফা দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা জুলাইয়ের গোড়ার দিকে ধর্মঘট করে বসে। ধর্মঘটাদের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজারের উর্দ্ধে। সরকার এই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে। কিন্তু মুজিব ধর্মঘট সরকারি কর্মচারীদের প্রতি খোলাযুলি তার সমর্থন দিলেন। এবং গভর্নরের কাছে টেলিগ্রাফ পাঠালেন। তাদের দাবি অনিতিবিলম্বে মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে<sup>১</sup> এই সমর্থন সরকারি কর্মচারীদের মনে এই ধারণা দৃঢ়তর করলো যে সরকার নয়, মুজিবই তাদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল।

দ্রুত অন্যান্য গ্রন্থ যেমন স্বর্ণকার, ট্যানারি শ্রমিক, সাংবাদিক, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এবং শিল্পের কর্মচারীরা ঝাঁপ দিয়ে আন্দোলনকারীদের দলে এসে ভিড়লো। তাদের দাবিগুলোর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলো ১৯৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। ওই দিন ভিক্ষুকরা পূর্ব পাকিস্তান ভিক্ষুক সমিতি গঠন করলো। এবং তাদের পাঁচ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিখ্যাত পল্টন ময়দানে জনসভাও করলো।<sup>২</sup>

দাবি এবং ধর্মঘটের এই প্রচণ্ড দৈত আঘাতও যেন যথেষ্ট বলে মনে হলো না। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা কয়েক দফা বোমা ফাটিয়ে সত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা করলো। প্রতীকী হিসেবে বেছে নিল তোপখানা রোডের পাকিস্তান কাউপিল ফর ন্যাশনাল ইন্ডিগেশনের প্রাঙ্গণকে। উদ্বোধনী বোমাবাজিটি হলো মে মাসের পাঁচ তারিখে। ঘটনাটি ঘটলো সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কয়েক ব্যক্তির উপস্থিতিতে। তারা তিনজন বোমা নিষেকপকারীর আদেশ মেনে নিয়ে পাঠাগার কক্ষ ত্যাগ করলো। লাইব্রেরির আসবাবপত্র যখন পড়েছিল সে সময় নিতান্ত অলস দৃষ্টিতে পাঠকরা তা চেয়ে চেয়ে দুর্বিল। অন্যদিকে ধীরে-সুস্থে সত্রাসবাদীরা জিপে গিয়ে উঠলো এবং গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। কেউই তাদের ধরার চেষ্টা করলো না কিংবা স্বেচ্ছাপ্রগোদ্দিত হয়ে কেউই তদন্ত কর্মিটির কাছে কোন তথ্যও দিল না।

বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারটি হিসাবমার্কিং পুনঃ পুনঃ ঘটতে থাকলো। যে মুহূর্তে শহরে একটা শান্তভাব ফিরে আসতে শুরু করেছে তখনি আরেকটি বিস্ফোরণ শান্তভাবকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর এবং অন্যান্য শহর একই ধরনের বিস্ফোরণজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করলো। কিন্তু তাদের আসল আঘাতটা অনুভব করা গেল প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা নগরীতে,— পূর্ব পাকিস্তানের স্নায় কেন্দ্র যে নগরী।

এই উচ্ছ্বল কার্যকলাপ এবং শিল্প এলাকার গোলযোগ একটা ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার 'জন্ম' দিল। শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা মৃত্যুর কানাগলিতে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ঘরে থাকাই শ্রেয় মনে করলো। পূরনো ঢাকায় বাস করতেন মি. জহুরুল হক নামের এক উর্দু কবি। তাঁর বাসায় প্রথম যেদিন আমি গিয়েছিলাম, সেদিনের কথা আমার মনে আছে। আমার সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের একজন কবি। আমাদের আগমন বার্তা জানানোর

১. দি মনিং নিউজ, ঢাকা, ৬ জুলাই, ১৯৭০

২. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

জন্যে তার লোহার গেটে বেশ কয়েকবার করাঘাত করলাম। লৌহ রক্ষাব্যহের ওপাশ থেকে একটি চাকর ছেলে আমাদের আগমণের সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথমে নিশ্চিত হলো, তারপর দরোজা খুলে দিল। পান খাইয়ে ও গজল শুনিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করা হলো। তার কাব্যময় রাচনাশৈলী খাঁচায় আটক কোকিলের বিলাপ সঙ্গীতের মতোই শোনাচ্ছিল। বিদায় নেবার মুহূর্তে তিনি আমাদের বললেন, ‘আপনারা সেনাবাহিনীর লোকেরা এদিকে আসেনই না। আমাদের মান-মর্যাদা এবং জীবনের জিম্মাদার আপনারাই। কিন্তু সব শ্রেণীর সামরিক লোকের জন্য শহরটিকে আপনারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা জানেন না, সময় আমাদের ওপর কী রকম ভারি চেপে বসেছে।’

ফেরার পথে আমি একটি খবরের কাগজের অফিসের গেলাম। সেখানে একজন বাঙালি ব্যারিস্টারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি খবরের কাগজে লিঙ্গাল নোটিশ লেখেন। স্বাভাবিক কারণেই বিরাজমান অবস্থা আলোচনায় এলো। তিনি বললেন, ‘আইন নিয়ে তামশা করবেন না। সামরিক আইন নিয়েও না। হয় সঠিকভাবে প্রয়োগ করুন নতুবা তুলে নিন।’

একটি একান্ত ঘৰোয়া বৈঠকে আমি জেনারেল ইয়াকুবকে সামরিক আইনের দন্তহীনতা সম্পর্কিত সাধারণ্যের আলোচনা জ্ঞাত করলাম। তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এবং ঢাকার পত্রিকা সম্পাদকদের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী মাসিক বৈঠকে উত্থাপন করলেন। তিনি সামরিক শাসন আইনের ‘দন্তহীনতা’ সম্পর্কে এভাবে ব্যাখ্যা দিলেন।

পাকিস্তানের জনগণের কাছে সামরিক আইন একটি ভীতির প্রতিমূর্তি। কিন্তু তারা এও ভুলে গেছে যে, এই সামরিক সরকার দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মূলত সামরিক আইন এবং গণতন্ত্রের সম্পর্ক বৈরিতামূলক। সামরিক আইনের ঐতিহ্যগত ধারা গণতন্ত্রের অঙ্কুরোদগমন করতে দেয় না। সুতরাং এই দেশে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সামরিক আইন তার চিরপরিচিত বাঁধনকে আলগা করেছে। আমাদেরকে অতি কর্মতৎপরতা এবং আলস্যের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কখনো কখনো আপনারা মনে করতে পারেন যে, ‘আমরা কর্মতৎপরতার অভাব দেখাচ্ছি। কিন্তু আমাদের বিচার করতে হবে সেটাও অতি কর্মতৎপরতার পর্যায়ে পড়ছে কী না। উল্টোও অবশ্য সত্য। আমরা বিমান চালনা কৌশল থেকে উপর্যুক্ত করতে পারি। বৈমানিক কল্পনা করতে পারে তার বিমান ঠিকই কাজ করছে কিন্তু ডাইনে ঘূরতেই সেটা খাড়া পাহাড়ের সাথে লেগে ধ্বংস হলো। অন্যথায় তার যন্ত্রটি নিরাপদে উপত্যকাটি পেরিয়ে যেতে পারতো।’

সম্পাদকরা তার যুক্তি ও উপমায় অভিভূত হয়ে গেলেন। তারা জেনারেলের প্রজ্ঞা ও বাণিজ্যিক প্রশংসন করলেন। তথাপি সবাই অনুভব করলেন তরী মারাত্মক দিকে মোড় নিচ্ছে। যদি ঠিক সময় এটাকে ঠিকঠাক না করা যায় তাহলে আঘাতপ্রাণ হবে এবং ধ্বংস হবে। বেসরকাবি কিংবা সামরিক আইন সরকার কেউই কোন সংশোধনযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকলো। শিল্পাঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না। শিক্ষাবিষয়ক লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষানগনগুলো বন্ধ রইল। আওয়ামী লীগের উৎকৃষ্ট স্বাদেশিকতা বাড়তে থাকলো। প্রতিদ্বন্দ্বিদের অধিকাংশই একে একে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে সরে এলো।

এই পরিবেশে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিয়ে সাধারণ নির্বাচনের দিকে পূর্ব পাকিস্তান এগিয়ে চললো।

## নির্বাচন : সবকিছু জন্য মুক্ত

বঙ্গত নির্বাচনের আগেই দিনই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গেল। ৭ ডিসেম্বর মুজিবুর রহমানের প্রকৃত বিজয়কে শুধু আনুষ্ঠানিকতার মালা পরানো হলো। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হবে—অনেকেই নভেম্বরের শেষাশেষি থেকে তাদের এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে।

১ ডিসেম্বর ঢাকা টেলিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার আমাকে বললেন, ‘আমার অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য অবশ্যই আমি শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো। আমি মফস্বল এলাকায় অনুষ্ঠিত তার সভাগুলোর বিবরণী টিভিতে আনতে পারছি না। কেননা, রাওয়ালপিণ্ডি তাঁর প্রচার প্রধান প্রধান শহরগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। নিশ্চয়ই শেখ সাহেব আমার প্রতি অসম্মত। যখন তিনি ক্ষমতায় আসবেন তখন তিনি হয়তো আপনাদের (ইউনিফরমাধারীদের) স্পর্শ করবেন না কিন্তু আমাকে তো ছাড়বেন না।’ ঢাকার একজন ডেপুটি সুপারিনিউটেন্ডেন্ট অব পুলিশ একই ধরনের আশংকা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, ‘২২ মে’র পোস্টাগোলার ঘটনায় আমি মুজিবপন্থী শ্রমিকদের ওপর লাঠি চার্জের আদেশ দেই। তারা তার কাছে আমার নামটি বলে দিয়েছে এবং শেখ সাহেবের স্মৃতিশক্তি দারুণ।’ মি. রহমান নামের এক বেসামরিক কর্মকর্তা সাধারণের মোটামুটি বর্ণনা দিলেন। বললেন, ‘দেশ সংকটের দিকে এগোচ্ছে। যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনা হয় তাহলে বিরঞ্জনাদীদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠবে। যদি বিপরীতটা ঘটে তাহলে সহিংসতার আশ্রয় নেবে। কেননা, দেশ শাসনের চাবি সে ভাবেই ঘুরানো হয়েছে।’

এই ভীতি শুধু বেসরকারি জনগণের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল না। এর প্রকাশ সামরিক পরিমণ্ডলেও পরিলক্ষিত হলো। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন সিনিয়র অফিসারের কথা মনে পড়লো। তিনি বলছিলেন, ‘ক্ষমতায় যাওয়ার পর শেখ সাহেবে যদি আগরতলা মড়যন্ত মামলার সমস্ত কাগজপত্র চেয়ে পাঠান তাহলে নিশ্চয়ই বেশ কয়েক জায়গায় আমার নাম দেখতে পাবেন। এবং ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করার মত উদার মুজিব নন।’ সামরিক বাহিনীর যে সব অফিসার তাদের চাকরি জীবনে কখনোই মুজিবকে অসম্মত করেননি, তারা ছয় দফার পক্ষে উচ্চ কঠে প্রচারাভিযানে নেমে পড়লেন। আওয়ামী লীগের কর্মসূচির গুণগুণ নির্ণয়ের ব্যাপারে বজ্বজ্ব রাখাকালে তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। বজ্বজ্ব রাখতো তারাই—যারা ছয় দফার সদেহজনক বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রচণ্ড রকমের বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলো। তারা ভেবেছিলে, এই কৌশলে তারা দেশের তবিষ্যৎ শাসকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে।

আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে একে একে সবাই যখন এই পার্টির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত তখন পার্টির মধ্যেই আশংকার বিস্তার ঘটলো। নির্বাচন কি আদৌ অনুষ্ঠিত হতে দেয়া হবে? আওয়ামী লীগ কি তার এই প্রচারাভিযানের ফসল ঘরে

তুলতে পারবে? এগুলো ছিল কান্তিমিক ভীতি। চরম উত্তেজনাকর ও অনিচ্ছিত পরিস্থিতিই এর জন্ম দেয়। এই ভীতি এ গুজব পল্লবিত করে যে, সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে সকল ক্ষমতা দখল করে নিয়েছেন। তিনি নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দেবেন এবং নতুন আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলবেন। তারা দু'জনেই তখন ঢাকায়।

এ নিয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন। কেউ করলেন সরাসরি কেউ বা ঘুরিয়ে। তারা অন্যান্য জায়গায়ও খোঁজ-খবর নেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ কোন সন্তোষজনক জবাব পেল না। অবশ্যে একজন বিদেশী সাংবাদিক এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। ১৯৭০ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার পথে যখন বিমানে উঠেছিলেন, সে সময় তিনি তার কাছে প্রশ্ন রেখে।

সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, ‘মি. প্রেসিডেন্ট, দেশের পুরো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কী আপনার হতে আছে?’ ‘হ্যাঃহ্যাঃ—সম্পূর্ণই’ প্রেসিডেন্ট তার পুরু ঝু নাচিয়ে বললেন। ‘কিন্তু ভৌগোলিক কথা শেষ করতে পারলেন না। প্রেসিডেন্ট ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। বললেন, ‘এটা অলীক কল্পনাপ্রসূত। নেহায়েতই বাজে।’ বলেই তিনি ঘট শরে বাঁয়ে মুখ ঘুরালেন—যদিকে অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়েছিলাম এবং বললেন, ‘কে আমার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করছে...? যতক্ষণ আমি না পরে দাঁড়াই ততক্ষণে কেউই আমাকে সরাতে পারবে না।’ বলে শূন্যে ছড়ি ঘুরিয়ে এবং ঢেঁট শুচকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে পিআইএ বোয়িংয়ের ভেতরে ঢুকলেন। তার একথায় গুজব প্রশংসিত করে।

নির্বাচনের তারিখ কাছাকাছি আসতেই একশো’র ওপর বিদেশী সংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি ঢাকায় এসে জড় হলেন। জাতীয় কোন দুর্যোগকালে যেমন, বন্যা কিংবা ধূর্ণিবাড়ের হোবলের পরেও এত সাংবাদিকের ভিড় আমি দেখিনি। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় ৬ ডিসেম্বর হোটেল পূর্বামীতে তাদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করে। সে ভোজে আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

খাবার টেবিলে পাশাত্ত্যের তিনজন সংবাদপত্র প্রতিনিধির সাথে বসেছিলাম। এবং আগামীকাল অনুষ্ঠৈয় নির্বাচনেই স্বাভাবিক কারণে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিষত হলো। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মেজের, ‘কোন দলে তুমি ভোট দিচ্ছো?’ বললাম, ‘একটাই তো দল আছে। আর সেটা আওয়ামী লীগ।’ মনে হলো আমার এই কৌতুককে কৌতুক হিসেবে নিলেন না। গুরুত্বসূহকারে গ্রহণ করলেন।

ভোজ শেষে আমি সংসদ ভবনে মার্শাল ল’ হেড কোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে তখন ১৪৪ ধারা (যা নির্বাচনের দিনের চার বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ এবং অন্তর্বিত্ত বহন নির্মিত করে) জারি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। এই ঐতিহাসিক দিনে আইন-শংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে ১৪৪ ধারা জারির সপক্ষে ছিলেন কয়েকজন খফিসার। অন্যদিকে, অন্যরা এর অকার্যকরতার প্রেক্ষাপটে বিরোধিতা করছিল। সেই ১৬সড় অফিস ঘরে যেইমাত্র আমি প্রবেশ করেছি সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক স্বরে কয়েকজন

চীৎকার করে উঠলো, ‘এই যে এসে গেছেন আমাদের জনমত বিশেষজ্ঞ, তার কাছ থেকে কিছু শোনা যাক।’ আমিও নিজেকে বিশেষজ্ঞের আবরণে ঢেকে গঁটীর কঠে বললাম, ‘বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার হিসাব মতে, যে কোন ধরনের বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে হৃশিয়ার করে দিচ্ছে। এ ইতিমধ্যে অতি উত্তজনাকর হয়ে থাকা পরিস্থিতিকে চরমে নিয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ অবশ্যই জিতে যাচ্ছে। সুতরাং শান্তি রক্ষা তারাই করবে।’ তারা আমার উপদেশ মেনে নিল। আমার মজাই লাগলো। এই ভেবে যে, একজন নবিশও নির্দেশ দিতে পারে যদি সে বিশেষজ্ঞের মত ভাবসাব দেখাতে পারে।

আগেই রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, সশস্ত্রাহিনী (প্রধানত সেনাবাহিনী) নির্বাচনের তদারকে থাকবে। কিন্তু চাকায় যে নির্দেশ এলো তাহলো (ক) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই নিজেকে জড়িত করবে না, (খ) প্রধান প্রধান কেন্দ্রের প্রতি নজর রাখ, (গ) সর্বক্ষণ জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকবে যাতে তারা তোমাদের দেখতে না পায়, তাতে জনসাধারণের মধ্যে তোমাদের উপস্থিতি তাদের মধ্যে ত্রোধের উদ্বেক না ঘটায়; এবং (ঘ) দাঙ্গা দমনের জন্যই মাত্র নামবে।

নির্বাচনে সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধান সমষ্টিয়ের জন্য সামরিক আইন সদর দণ্ডের একটি ‘অপারেশন রুম’ সৃষ্টি করা হয়। জেনারেল ইয়াকুব সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী কেন্দ্রের ওপর দিয়ে উড়ে এলেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং শৃংখলা মেনে চলা জনতাকে দেখে তিনি খুশি হলেন।

দিনের বাকি সময় আমি ‘অপারেশন রুমে’ কাটালাম। প্রথমদিকে এখানকার পরিবেশ ছিল উত্তেজনাময়। দুপুর পর্যন্ত কোনখান থেকে যখন কোন রকমের সহিংসতার খবর এলো না তখন সবাই গা এলিয়ে দিল। গল্পগুজব শুরু করলো। মাত্র একজন স্টাফ অফিসার টেলিফোন ও বেতার যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত বলে মনে হলো। খবর এহণ করছিল বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার খবর আসছিল সবখান থেকে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দণ্ডের খেজু-খবরের জবাব একই ভাষায় আশ্বাস দিয়ে (রাওয়ালপিণ্ডি) পাঠানো হচ্ছিল।

নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোর যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনী কৌশলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হবার ব্যাপারটিতে অবদান রাখলো। পোলিং এবং প্রিসাইডিং অফিসাররাও তাদের ভবিষ্যৎ শাসকদের বিরক্তভাজন হতে চাইলো না।

বস্তুত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেসব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন তাদের জন্য সময়টা ছিলো কঠিনতর। আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের সামনে দাঁড়াবার মত অনুরূপ শক্তিও ছিল না তাদের। এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে ছত্রায়ামূলক রক্ষাবরূপীও তারা লাভ করেনি। কয়েকজন বিকুল প্রার্থী এসেছিল সেনাবাহিনীর কাছে কিন্তু কোন প্রতিবিধানই তারা পেল না। কেননা, সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ ছিল একমাত্র ব্যাপক সহিংসতা ছাড়া সেনাবাহিনী যেন নির্বাচন সংক্রান্ত আর কোন বিষয়েই নিজেদেরকে জড়িত না করে। আমি দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই।

চৌমুহনীতে (নোয়াখালী) বার বছর বয়স্ক একটি বালক 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে ভোট কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ বিপক্ষ একজন প্রার্থী তাকে ধরে ফেলেন এবং ভোট কেন্দ্র ভবনের পিছনে তাকে নিয়ে আসেন। সেখানে ক্যাপ্টেন চৌধুরী তার প্লাটুন নিয়ে বেসিলিলেন। প্রার্থী অভিযোগ করেন (ক) বালকটির বয়স এতই অল্প যে সে ভোট দেবার উপযুক্ত নয় (খ) আইন উপেক্ষা করে সে ভোট কেন্দ্রের মধ্যে গিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিলো। ক্যাপ্টেন বললেন, 'প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করুন। এই ধরনের বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি না।'

দ্বিতীয় ঘটনাটি টাঙ্গাইলের। সেখানে জনেক রহমানকে মেজর খানের সামনে এনে হাজির করা হয়। তার বিকর্দে অভিযোগ, সে পক্ষমবার ভোট দিতে যাচ্ছিল পোলিং অফিসারের পরোক্ষ প্রশ্নে। মেজর বললেন, 'হ্যাতো আপনি সঠিক বলেছেন। কিন্তু এ নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। বলুন, কোন দাঙা ফ্যাসাদ হয়েছে?' কোন দাঙা ফ্যাসাদ হয়নি। আওয়ামী লীগের গুভাদের (শক্তিধর সশস্ত্র বালক) ধন্যবাদ।

দিনের শেষে ভোট গণনা যখন শেষ হয়ে গেল সে সময় জেনারেল ইয়াকুব হেঁটে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর অফিস কক্ষে গিয়ে ঢেকেন। তিনি সামরিক আইন সদর দণ্ডের বেসামরিক বিষয়াবলির দায়িত্বে ছিলেন। জেনারেল ইয়াকুব স্পষ্টতই গর্বিত কঢ়ে বললেন, 'সবকিছুই শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমি আনন্দিত। ভোটপর্ব অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে।' ফরমান শান্ত কঢ়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তারা মুক্ত ছিলো সব কিছু করার জন্য মুক্ত।'

চার দিন পর (১১ ডিসেম্বর) প্রেডিসেন্ট ইয়াহিয়া খান সেনাপ্রধানদের নিম্নলিখিত বাণী পাঠান 'সাধারণ নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করার নিশ্চয়তা বিধান করাতে গিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সকল শ্রেণির সকল সদস্য যে নিরপেক্ষতা, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তার জন্যে সবাই প্রশংসার পাত্রে পরিণত হয়েছেন এবং তার স্বীকৃতি দিচ্ছি।'

'শান্তিপূর্ণ' পরিবেশের দরুণ আওয়ামী লীগ উপকৃত হলো। পূর্ব পাকিস্তানে দুটি বাদে আর সবগুলো আসনই সে দখল করলো। বেসরকারি গণনা শেষ হতেই একটা টেলিফোন এলো। টেলিফোন করলেন সেই ইউরোপীয় সাংবাদিক—যার সাথে আমি ৬ ডিসেম্বর নেশভোজে অংশ নিয়েছিলাম। সাংবাদিক তার হোটেল রুম থেকে বললেন, 'তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, মেজর তোমার দল নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে গেছে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দনটি পকেটস্থ করলাম। বিজয়ী ঘোড়াকে উপেক্ষা করে কে !

আওয়ামী লীগের মেজাজ এখন কী হবে? জনগণের আবেগকে যে পুঁজি করেছে, সে কী নমনীয় হবে? ডষ্টের কামল হোসেনের কথা আমার মনে পড়লো। এক মাস আগে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তিনি মুজিবের প্রধান পরামর্শদাতা।<sup>১</sup> হোটেল ইটারকস্টিনেটালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বারে বসে তাকে বললাম, 'আওয়ামী লীগের বিজয়ের ব্যাপারটি নির্ধারিত এখন যদি আপনারা শেখ মুজিবুর রহামনের ভাবমূর্তি জাতীয় নেতা (প্রাদেশিকের চেয়ে) হিসেবে তুলে ধরার পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। তার জন্যও যেমন

১. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭০

২. পরে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য ও স্বাধীন বাংলাদেশে মৃত্তী হন।

এবং দেশেরও জন্যে তেমন ভালো হতো, যদি তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে যেতেন, এবং সেখানকার প্রধান প্রধান শহরে জনসভায় বক্তৃতা করতেন। পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য।<sup>3</sup>

তিনি বললেন, ‘একটি ভাল পরামর্শ। নির্বাচন শেষ হবার পর আমরা এই কার্যক্রমে নামবো। আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেছি ছয় দফা ও বাড়ালি জাতীয়তাবাদ ধিরে। যদি আমরা আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাই তাহলে নির্বাচনে হেরে যেতে পারি। যখন একবার আমরা জনগণের আবেগকে পাকাপাকিভাবে ভোট প্রাপ্তিতে পরিণত করতে পেরেছি তখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নেও ছয় দফাকে সংশোধন করতে পারবো।’ নির্বাচন শেষ হবার পর আমি আবার তার সাথে দেখা করলাম এবং তার প্রতিক্রিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের খামখেয়ালি আবহাওয়ার ধরনে মত বদলে ফেলেছেন। তিনি বললেন, ‘না, ছয় দফায় পরিবর্তন আনা যাবে না। এটা এখন জনগণের সম্পত্তি। যে কোন ধরনের সংশোধন জনগণের আঙ্গুলীয়ান প্রতি বিশ্বাসযাতকতার সামিল হবে।’ তার পার্টিপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আরো কঠিন হয়ে গেলেন। নির্বাচন শেষ হবার দু’দিন পরেই তিনি ঘোষণা করলেন, ‘ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে প্রণীত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসনের ওপর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন এই গণভূট....সুতৰাং ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।’<sup>4</sup>

এই ছিল জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার রায়। যদি তিনি একাই চলতে চান তাহলে এমন কেউ কী আছে যে তাঁকে পাকিস্তানের অগ্রতিদন্তী শাসক হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে? সেনাবাহিনী কি বিনম্র বদনে ঘটনার কেন্দ্র থেকে সরে আসবে এবং নির্বাচিত নেতাদের তাদের নিজের মতো করে কাজ করার সুযোগ দিয়ে চলে আসবে? নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় আমাদের মনে এই ধরনের প্রশ্ন আলোড়ন তুললো।

এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল ইয়াহিয়ার আঙ্গুলাজন এক জেনারেলের কাছ থেকে, যিনি ডিসেম্বরের শেষাবস্থি ঢাকায় এসেছিলেন। গভর্নমেন্ট হাউজে সুস্থাদু ভোজ পর্ব সমাধার পর ঘরোয়া পর্যায়ে আলাপচারিতাকালে তিনি ঘোষণা করলেন, ‘চিন্ত করো না....আমাদের ওপর শাসন চালাতে এই কালো জারজদের সুযোগ দেব না।’ ইয়াহিয়া খানের এই মন্তব্য মনে হয় মুজিবুর রহমানের কাছে চলে যায়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিতি রক্ষার জন্য তিনি প্রকাশ্যে ইয়াহিয়া খানকে অভিনন্দন জানালেন। সেই সাথে তিনি আরো বলেন, ‘এইসব ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ কেউ সম্প্রতি ঢাকায় এসেছিল এবং গোপন সভা করেছে।’ তিনি এইসব ষড়যন্ত্রকারীদের ঠেকাবার জন্যে প্রেসিডেন্টের প্রতি হাঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘অন্যথায় বাংলাদেশের মানুষ বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে এইসব লোকদের মোকাবেলা করবে।’

৩. দি পাকিস্তান আবজারভার, ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০

## সংকট সৃষ্টি

পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন দখল করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হলো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও দখল করতে ব্যর্থ হল। সেখানে জেড এ ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রার্থী দেয়নি) ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি কেন্দ্রে বিজয়ী হলো। এটা একটি কৌতুহল উদ্দীপক ও স্পর্শকাতর পরিস্থিতির জন্ম দিল।

আমি আগেই নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর শেখ মুজিবের কঠিন মনোভাবের কথা বলেছি। মি. ভুট্টো, যিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মুখ্যত পাঞ্জাব ও সিঙ্গুর মত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ দু'টিতে, তিনিও তাঁর নির্বাচনোন্তর উচ্চারণের নমনীয়তার পরিচয় দিলেন অন্তর্হী। ২০ ডিসেম্বর লাহোরে তিনি বললেন, ‘আমার দলের সহযোগিতা ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কিংবা কেন্দ্রে কোন সরকার পরিচালিত করা যাবে না।’ তিনি আরো বললেন, ‘পাঞ্জাব এবং সিঙ্গুর পাকিস্তানের ক্ষমতার দুর্গবিশেষ। যেহেতু এই প্রদেশ দুটিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পিপিপি’র উথান ঘটেছে সে কারণে যে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য তাঁর দলের সহযোগিতা অপরিহার্য।’ একই সাথে জনগণকে তিনি এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, ‘পিপিপি তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে এক ইঙ্গিত সরে আসবে না। যখন এ দল ক্ষমতায় আসবে তখন এর কর্মসূচি আক্ষরিক অর্থেই এবং চেতনাও কার্যকর করবে।’<sup>১</sup>

ভুট্টোর এই বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ করলেন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি মি. তাজউদ্দীন।

তিনি বললেন, ‘আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে সম্পূর্ণ যোগ্য। সেটা করা হবে যে কোন দলের সমর্থন অথবা বিনা সমর্থনে... পাঞ্জাব এবং সিঙ্গুর আর কোনভাবেই “ক্ষমতার দুর্গ” হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে না। যদি একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের এগোতে হয় তাহলে ওই ধরনের দাবি পরিত্যাগ করতে হবে। এ কেবল অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর বির্তকের জন্য দেয়।’<sup>২</sup>

নির্বাচনোন্তর পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এই মোকাবেলা ঢাকায় আমাদের কাছে নতুন ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। যে সমস্ত জুনিয়র অফিসার রাজনৈতিক জটিল সমস্যাবলি নিয়ে কদাচিং মাথা ঘামায়, তাদের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে, তা বুঝতে পারি। যারা ভুট্টোকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পক্ষে সর্বজয়ী বীর মনে করলো তারা বললো, কীভাবে একটি প্রদেশ সারা দেশ শাসন করতে পারে? অন্যরা—যাদের মনে স্থানীয় অবস্থার প্রতি খাঁটি দরদ রয়েছে—তারা বললো, ‘তেইশ বছর ধরে আমরা তাদের (বাংলাদেশের) ওপর আধিপত্য করেছি। এখন তাদের সময়। সব সময় তাদের ঠকানো উচিত নয়।’

১. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

২. প্রাপ্ত ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২

আমাদের অনুভূতি যা-ই হোক, সেই শিখৰ,—যেখানে জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হবে,—তা অনেক দূরে সরে গেল। তৃষ্ণাবৃত্ত হয়ে গেল। বছরের গোড়ার দিকে বরফ গলার লক্ষণ দেখা গেল। উদ্যোগটা এলো পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টার তরফ থেকে। তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংলাপে যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। আমরা ঢাকায় বসে এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তার অনুপস্থিতিতেই তাকে স্যালুট করলাম। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় মুজিবকে তার ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানাবার জন্যে তিনি ১৯৭১ সালের জানুয়ারি ঢাকায় বিশেষ দৃত প্রেরণ করলেন ভবিষৎ খোলামেলা আলোচনার জন্য ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা। অবশ্য ২৭ ডিসেম্বরে একটি সৌহার্দ্যমূলক বিবৃতি দিলেন ভুট্টা। বিবৃতিতে তিনি বললেন, ‘আমরা সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদের প্রতি আমাদের আস্থা জ্ঞাপন করছি।’<sup>১</sup>

মুজিব স্পষ্টত এই উদ্যোগে সাড়া দিলেন ঢাকার একটি জনসমাবেশে ঘোষণার মাধ্যমে বললেন, ‘আইন সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও আমি বলতে পছন্দ করি না যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাই না। অবশ্যই আমরা এটা চাই।’<sup>২</sup> মনে হলো সঠিকু দিকেই ঘটনা প্রবাহের গতি মোড় নিতে শুরু করেছে। ইয়াহিয়া খানের একজন আশ্রিত ব্যক্তি এতে প্রেসিডেন্টের আনুকূল্যে প্রভাব বিস্তার করলেন—তিনি একাধারে এই রাজনৈতিক খেলার আস্পায়ার ছিলেন এবং প্রভাবশালী অংশী ছিলেন। কে এই কৃতিত্বটা নিছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ না বিপজ্জনক মোকাবেলা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ঢাকায় ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের এক গণসমাবেশ আমাকে আমার গোলাপি স্বপ্নের জগত থেকে টেনে বের করে নিয়ে এলো। ওই সমাবেশে আওয়ামী লীগের এম,এন এ এবং এম পি এ-রা (মোট সংখ্যা ৪১৭) ছয় দফার প্রতি আনুগত্যের শপথ বাক্য পাঠ করলেন।

#### তারা শপথ নিলেন

- ‘সর্বশক্তিমান দয়ালু আল্লাহর নামে;’
- ‘সেই সব বীর শহীদ ও যোদ্ধারা—যারা নিজেদের জীবনদান করেছেন এবং প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সূত্রপাত করেছেন—তাদের নামে;’
- ‘এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, খেটে খাওয়া মানুষসহ সকল শ্রেণীর মানুষের নামে;’
- ‘আমরা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, এই মর্মে শপথ গ্রহণ করছি যে, জনগণের দেয়া ছয় দফা ও এগার দফা ম্যান্ডেটের প্রতি আমরা সর্বাত্মকরণে বিশ্বস্ত থাকবো।’

মনে হল আমরা আবার চতুর্কোণ পরিসরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আওয়ামী লীগ এবং তার নির্বাচিত সদস্যরা ছয়দফার ব্যাপারে শপথ নিয়ে প্রকাশে নিজেদেরকে বেঁধে ফেললেন। দেয়া-নেয়ার ঘৰতীয় আশা ছিল হয়ে গেল। আমি এ বিষয়টি মুজিবুর রহমানের

৩. দি ডন, করাচি, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০

৪. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিকের কাছে উথাপন করি। বলি, ‘আমি বছরখানেক ধরে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জনমনে যে বিশুরু আবেগ সৃষ্টি হয়েছে এই সময়টিতে নির্বাচনোন্তরকাল থেকে সংসদ বৈঠকের আগ পর্যন্ত) সেটাকে প্রশংসিত করার কাজে লাগানো উচিত যাতে শাসনতাত্ত্বিক বিলে একটি এক সময়োত্তাভিত্তিক রফায় আসা যেত।’

তিনি বললেন, ‘শেখ সাহেব কথনোই জনগণের আবেগকে শীতল করতে পারেন না। কেননা, তোমাদের বন্দুক ও ট্যাক্সের বিরলদে এটাই তার একমাত্র অস্ত্র।’

চাকা সমাবেশের পর দিনই ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের তেইশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবস। মনে হলো লক্ষ্য অর্জনে মুজিব থেকে ছাত্রাই অধিকতর অধৈর্য হয়ে উঠছে। তারা তার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলো তাদের ইচ্ছার কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিয়ে বললেন, ‘যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমি বিপুরের ডাক দেব। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে।’<sup>14</sup>

মুজিবের অনমনীয় মনোভাবের দরুণ বরফগলার প্রাথমিক আশা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। মনে হলো, ভুট্টোর উদ্যোগকে পদদলিত করে সরিয়ে দিলেন।

এ অচলাবস্থা ভাঙ্গার জন্যে কেউ যদি হস্তক্ষেপ করতে পারেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানই। ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় এলেন। ছয় দফাকে পূর্ণাঙ্গ উপলক্ষ্মির উদ্দেশ্যে তিনি এই উপলক্ষ্মিকে ব্যবহার করলেন। মুজিব এবং তার অর্ধজন সিনিয়র সহকর্মীকে তার সামনে ছয় দয়া ‘উপস্থাপন’-এর জন্য প্রেসিডেন্ট হাউজে আমন্ত্রণ জানানো হলো। প্রেসিডেন্টের মুখ্য স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল এস জি এম পীরজাদা গভর্নর আহসানকে বৈঠকে যোগদানের জন্য ডেকে পাঠালেন। গভর্নর আহসান, যাকে পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিন্ডিকেট নেবার বেলায় সর্বদাই উপেক্ষা করা হয়েছে, নিতান্ত অনিছ্ছা ভরে এলেন। তিনি ভাবলেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচির ‘পূর্ণাঙ্গ উপলক্ষ্মি’ পদক্ষেপটিতে ইতিমধ্যে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। এটা আরো আগে নেয়া যেতে পারতো। তাতেও সময় মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতো। যখন সারা প্রদেশ তাদের পক্ষে ভোট দিয়ে ফেলিছে তখন এ ব্যাপারটি খুব অল্পই কাজ দেবে।

ইয়াহিয়া, পীরজাদা এবং আহসান আলোচনা টেবিলের একপাশে বসলেন। অন্যপাশে মুজিব, খোন্দকার মোশতাক, তাজউদ্দিন এবং অন্যান্য সহকর্মী। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মুজিবই বললেন বেশি। তার ছয় দফাকে তিনি এক এক করে তুলে ধরলেন। প্রত্যেকটি দফা ব্যাখ্যার পর তিনি বললেন, ‘দেখুন এর মধ্যে আপত্তিজনক কিছুই নেই। এখানে খারাপ কী আছে? এটা অতি সরল।’ ইয়াহিয়া এবং তাঁর সহকর্মীরা কেবল শুনলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া মাঝে মধ্যে এক আধটা মন্তব্য করলেন। কিন্তু মুজিব অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাকে হঠিয়ে দিলেন। সব শেষে ইয়াহিয়া খান বললেন, ‘আমি আপনার ছয় দফা গ্রহণ করছি। কিন্তু পঞ্চিম পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধবাদী মতামত দারুণ প্রবল। পঞ্চিম পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে আপনার এগোতে হবে।’

মুজিব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘অবশ্যই, অবশ্যই। আমরা পঞ্চিম পাকিস্তানকে আমাদের

১৪. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ৫ জানুয়ারি, ১৯৭১

সঙ্গে নিয়েই এগোবো । আমরা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবো । আমরা সংবিধান তৈরি করবো । আমরা ছয় দফার ভিত্তিতেই সেটা প্রণয়ন করবো । এর ভেতর কোন গলদ থাকবে না ।’ ইয়াহিয়া খান তার পুরু ভ্রং জোড়া নাচিয়ে বিদেশী সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন এবং চুপচাপ রইলেন ।

এই ভাষ্য প্রাপ্তির জন্য আমি ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানের কাছে ঝঁঁঁী । ওই বৈঠকের আরেকটি বিবরণ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী প্রফেসর জি ডেলিউ চৌধুরী । তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এই ঐতিহাসিক ঢাকা মিশনের সঙ্গী ছিলেন । তিনি আমাদের বলছেন, মুজিবের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসিডেন্টের মনে দারুণ আঘাত লাগে । তিনি বলছেন:

‘যে মুহূর্তে (মুজিব-ইয়াহিয়া) বৈঠক শেষ হলো তার পর মুহূর্তেই প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে ডাক এলো ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করার জন্য । আমি তাকে অপ্রসন্ন ও হতাশাহ্রস্ত দেখলাম । তিনি আমাকে বললেন, ‘মুজিব আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছে । যারা তার ব্যাপারে আমাকে ছাঁশিয়ারি করে দিয়েছিল, দেখছি তারাই সঠিক । আমি ওই লোকটিকে বিশ্বাস করে ভুল করেছি।’ আমি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে জিজেস করলাম, ‘আপনি কী মুজিবকে নির্বাচনের আগে দেয়া তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন?’ ইয়াহিয়ার জবাব ছিল মানসিক যত্নণা কাতরতামূলক । বললেন, ‘আপনি এবং আমি কেউই রাজনীতিবিদ নই । তাঁদের মন ও চিন্তাধারা আমার পক্ষে বোঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার । তবু আসুন আমরা ভালোর জন্য আশা পোষণ করতে পারি । এবং প্রার্থনা করতে পারি ।’<sup>৬</sup>

একই ধরনের মানসিক অস্থিরতা নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া ১৪ জানুয়ারি করাচির উদ্দেশ্যে বিমানে চড়লেন । ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবদানকালে আমিও সেখানে ছিলাম । মনে হলো, ভবিষ্যতের জন্য সব আশাই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন । এমন কোন জবাব, মন্তব্য ক্লিংবা স্বত্ব উক্তি করলেন না, যাতে তার উদ্দেশ্যের সামান্যতম ইঙ্গিত মেলে । মুজিবুর রহমানের ওপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত প্রহণের ভার ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে তাকে অধৈর্য মনে হলো । এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘তাকে (মুজিব) গিয়ে জিজেস করুন । তিনিই তো পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী । যখন তিনি আসবেন এবং ক্ষমতা নেবেন তখন আমি সেখানে থাকবো না । শিগগিরই তার সরকার হতে যাচ্ছে।’<sup>৭</sup>

ইয়াহিয়ার চলে যাওয়ার পর পরই একজন বাঙালি সাংবাদিক আমাকে বললেন, ‘প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের আসল বাক্যটি হলো, “আমি সেখানে থাকছি না” — কারণ, যতক্ষণে তিনি আওয়ামী লীগ প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন না ততক্ষণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলির অধীনে আওয়ামী লীগ তাকে প্রেসিডেন্টের গদিতে বহাল রাখার আশ্বাস প্রদানে অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করেছে।’

এই স্বার্থসর্বস্ব দালালাটি একদিনের জন্য করাচিতে বিশ্রাম নিয়ে ভুট্টোর অতিথি হয়ে গেলেন লারকানায় । পিপিপি-র চেয়ারম্যান স্বত্ত্বাবিক কারণেই ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রেখেছিলেন । তিনি প্রেসিডেন্ট ও তার সহচরদের প্রতি

৬. জি ডেলিউ চৌধুরী দি লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, পৃ-১৪৯, ১৫১

৭. দি ডেন, করাচি, ১৫, জানুয়ারি, ১৯৭১

ঐতিহ্যগত আতিথেয়তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। প্রেসিডেন্টের ‘বুনো ইঁস’ শিকারে আর যারা সঙ্গী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদও ছিলেন। তার উপস্থিতি সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ভৌতিজনক জলনা-কল্পনার বিস্তার ঘটায়। আওয়ামী লীগ তাবলো, সাম্প্রতিক আলোচনায় মুজিব যে অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছেন তার জন্যে তাকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে জেনারেল হামিদের প্রত্যক্ষ সমর্থনে একটি ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে।

এরপরেই ঢাকার খবরের কাগজগুলোর প্রথম পাতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি ছাপা হলো। আল মুরতজা'র সুপরিসর লনে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। ঢাকা বৈঠক যে উভেজনাকর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এই ছবিটি ছিল তার থেকে একেবারে বিপরীতধর্মী। আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিক আমাকে বললেন, ‘এই ছবিটি দেখুন। যখন ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন সে সময় প্রেসিডেন্টের একজন স্টাফ অফিসার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রেসিডেন্ট হাউজে আসতে বলেন টেলিফোন করে। বলা হয়, প্রেসিডেন্টের সামনে তার বক্তব্য পেশ করতে। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা ভুট্টোর বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। গণতন্ত্রের প্রতি সেনাবাহিনীর সম্মান প্রদর্শনের নমুনা কী এই?’

ভুট্টোর কাছ থেকে লারকানা সলাপরামর্শের ‘সংক্ষিপ্তসার শোনা যাক

‘ঢাকা থেকে ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার কয়েকজন উপদেষ্টাসহ ১৭ জানুয়ারি আমার নিজ শহর লারকানায় আসেন। ঢাকা আলোচনার বিষয়বস্তু আমাকে অবহিত করেন। ওই আলোচনায় তিনি মুজিবুর রহমানকে বলেন যে, আওয়ামী লীগের জন্য তিনটি বিকল্প খোলা রয়েছে। যথা, এককভাবে চলার চেষ্টা করা, পিপলস পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করা অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের ছেট এবং পরাজিত পার্টিগুলোর সাথে সহযোগিতা করা। এবং তার মতে উন্নত হচ্ছে দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে একটি সমরোতায় উপনীত হওয়া। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রেসিডেন্টের সামনে ছয় দফার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা তাদের সম্পর্কে আমাদের ভয়ানক আশংকার কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছি। এতদসত্ত্বেও আমরা তাকে আশ্বাস দেই যে আমরা একটি আপসরফায় আসার যে কোন ধরনের প্রচেষ্টা নিতে স্থির প্রতিজ্ঞ। আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমরা অদূর ভবিষ্যতে ঢাকায় যাব।’<sup>৮</sup>

লারকানায় ‘বুনো ইঁস’, শিকার শেষে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর উপদেষ্টারা রাওয়ালপিণ্ডি চলে গেলেন। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য ও নিজের চিন্তাধারার আলোকে সজ্জিত হয়ে ভুট্টো ঢাকার উদ্দেশ্যে ২৭ জানুয়ারি রওনা হলেন। কয়েকজন সহচর তাঁর সঙ্গী হলেন।

ভুট্টো দেখলেন, ঢাকায় ‘লারকানা ষড়যন্ত্র’র মেষ তাকে ঘিরে রেখেছে। মনে হলো, তার নিজ শহরের বাড়িতে প্রেসিডেন্টকে আতিথেয়তা প্রদান না করে যদি তিনি তাঁর দলবলসহ মুজিব এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে মিলিত হতেন তাহলে অনেক ভালো হতো। বর্তমানে ঢাকার পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ দিকে মোড় নিয়েছে। তথাপি আওয়ামী লীগ ভুট্টোর সফরের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করলো। কেননা, তারা উপলব্ধি করলো, ইয়াহিয়ার পরই আছে পিপলস পার্টি এবং একমাত্র এদেরই সহযোগিতা কামনার মধ্যে দিয়ে

৮. জেড এ ভুট্টো দি ছেট ট্রাজেডি, পৃষ্ঠা-২০

তারা প্রেসিডেন্টের ভূট্টোকে অকার্যকর করে দিতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দু'টি সং�্খ্যাগরিষ্ঠ দল সমর্থিত শাসনতন্ত্রিক বিল কী ভাবে প্রেসিডেন্টে অনুমোদনে অধীকৃতি জানাবেন? কিন্তু ভূট্টো কী পশ্চিম পাকিস্তানে তার ক্ষমতার উৎসের স্বার্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারবেন? যদি তাই হয়, তাহলে এ থেকে তিনি কী সুবিধা লাভ করবেন?

মি. রেহমান সোবহান আমাদেরকে এই আলোচনায় আওয়ামী লীগের বজ্বোর বিবরণ দেন। তিনি বলছেন, ‘মিঃ ভূট্টো জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় এসেছিলেন। মুজিবের সঙ্গে তার সরাসরি বৈঠক হয়। এরপর তার দলের ‘শাসনতন্ত্রিক’ বিষয়ক টিম আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষের সঙ্গে বসেন। আলোচনা চলতে থাকাকালে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পিপিপি কোন শাসনতন্ত্রিক খসড়া প্রস্তুত করেনি। শুধু ইয়াহিয়া আল্লে যেমন করেছিলেন তেমনি ‘ছয়-দফা’কে তারা পরিপূর্ণভাবে বোঝার চেষ্টা করছেন। এই অবস্থা আনুষ্ঠানিক সমরোত্তার বিষয়কে অসম্ভব করে তোলে, যেহেতু দূরত্ত কমিয়ে আনতে বিকল্প অবস্থান সন্নিবেশের কথাই বলে।’<sup>৯</sup>

এই বিবরণ আলোচনার ছ’মাস পরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বৈঠকের পর পরই আওয়ামী লীগের একটি উৎস থেকে (ব্যারিস্টার মদ্সনুল হোসেন) আমি আরেকটি মতব্য শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ‘দেখুন, ঢাকায় ভূট্টোকে গ্রহণযোগ্য করাতে আমাদের কঠোরভাবে চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্রিক মৌল বিষয়ের প্রতি তিনি অগ্রহই দেখালেন না। আলোচনার পুরো সময়টাই তিনি ব্যয় করেছেন ক্ষমতার ভাগভাগি এবং মন্ত্রিসভার পোর্টফোলিও প্রাপ্তির বিষয় নিয়ে।’

এই সম্পর্কে অধ্যাপক জি. ডিলিউ চৌধুরী বলেন, ‘তিনি (ভূট্টো) এবং তার দল সেখানে (ঢাকা) এলেন ২৭ জানুয়ারি। এই দুজন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে যাদের উত্থান ঘটেছে, তাঁদের রাজনৈতিক সংলাপের ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য আমি সেখানে ছিলাম। সংলাপ বিনিময় হয়েছিল তিনিদিন। কিন্তু পারম্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে আলোচনায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে কোন অগ্রগতিই হয়নি। আমি বিভিন্ন স্তর থেকে জেনেছিলাম যে, মুজিব ভূট্টোকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তিনি ছয় দফার কোনই অদল-বদল করতে প্রস্তুত নন। অন্যদিকে ভূট্টোও জানিয়ে দেন যে, তিনি এই পরিকল্পনার ছায়াবরণে বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করতে পারেন না।’<sup>১০</sup>

এ সম্পর্কে ভূট্টোর একটি পুরো বিবরণ রয়েছে। তিনি লিখেছেন

‘১৯৭১ জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ পিপলস পার্টির নেতারা ঢাকায় গেলেন। আমাদের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করলাম শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয় দফার ব্যাপারে অনমনীয়। আমাদের সোজাসুজি বললেন, তিনি ছয় দফার প্রশ্নে জনগণের কাছ থেকে ম্যাস্টেট লাভ করেছেন। এর থেকে এক ইঞ্জিও সরে আসার অবস্থানে তিনি নেই। আমরা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে বললাম, আমরা ছয় দফার প্রশ্নে কোন ম্যাস্টেট লাভ করিনি। আমরা কিছু

৯. রেহমান সোবহান নেগোশিয়েল ফর বাংলাদেশ, এ পারটিসিটপ্যাটস ডিউ দি সাউথ এশিয় রিভিউ, লস্টন, জুলাই, ১৯৭১

১০. জি. ডিলিউ চৌধুরী দি লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, পৃ-১৯

শাসনতাত্ত্বিক প্রস্তাব উপস্থাপন করলাম। কিন্তু যতক্ষণ ছয়দফাকে পুরোপুরি গ্রহণ না করা হচ্ছে ততক্ষণ আওয়ামী লীগ নেতারা পরবর্তী কোন আলোচনায় যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা মুজিবুর রহমানকে জানালাম যে, দেশের পশ্চিমাংশের জনগণ ছয়দফার বিরুদ্ধে। আমরা তাকে আরো বললাম, দেশের পশ্চিমাংশের জনগণের ধারণা এই যে, ছয়দফার অবশ্যস্তাবী পরিণতি হচ্ছে পাকিস্তানের সমাপ্তি এবং আমাদের মতে আমাদের মূল্যায়ন দৃষ্টিগোচর সীমা থেকে দূরে নয়। আওয়ামী লীগ নেতা আমাদের অসুবিধা পুরোপুরি উপলক্ষ্মি করলেন কিন্তু সে সব গ্রহণে রাজি হলেন না। তিনি তাঁর কৌশল নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন। এবং আমাদের অনুরোধ তার পরিকল্পনার জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হলো না। কৌশল হলো সময় নষ্ট না করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা এবং ছয় দফাকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়া যাতে দেশকে ছয় দফাভিত্তিক একটি শাসনত্বের দিকে ঠেলে দেয়া যায়। দেশের পশ্চিমাংশে তথা পূর্বাঞ্চলেও এর ফলাফল সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতনতা সৃষ্টির আগেই তিনি এটা করতে চেয়েছিলেন।<sup>১১</sup>

ভুট্টো এবং তার সহচররা ৩০ জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেলেন। সমাধানের কোন ইঙ্গিতই কোন দিক থেকে পরিদ্রষ্ট হলো না। দেশের দুই অংশের ব্যবধান আগের যে কোন সময়ের চেয়ে জন্য অনেক বেশি দেখা গেল।

এই ব্যবধানকে আরো বড় করার ব্যাপারে ভাবতও তার অবদান রাখলো। ভারতীয় ফকার বিমান হাইজ্যাকের অভ্যুত্তে সে তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো।<sup>১২</sup> পিআইএ বিমানের আগে যেখানে দু'ঘন্টা সময় লাগতো এখন সিলোন (শ্রীলংকা) হয়ে ঘুরে আসতে ছয় ঘন্টা লাগে। আমার ধারণার পক্ষে কোন প্রমাণ ছিল না যে ভারত ৩০ জানুয়ারির বেশ আগে এই বড়যত্ন পাকিয়েছে কিন্তু মুজিব-ভুট্টোর নিষ্ফল বৈঠকের সময়ের সাথে এটা মিলে যায়। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলির বিকাশ এই ব্যাপারে আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে যে, জানুয়ারির শেষভাগে আওয়ামী লীগ উপলক্ষ্মি করে কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোও বুঝে ফেলেন তাদের অবস্থান সম্পর্কে। আমরা পুরোপুরিভাবে একটি কানাগলির মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। দেরি না করে জাতীয় পরিষদ ডাকার জন্যে মুজিব প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করে দিলেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি সাধারণ চুক্তিতে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে প্রভাবিত করার জন্যে অধিক সময় দেয়ার যুক্তির অবতারণা করলেন। ইয়াহিয়া তার উপদেষ্টাদের নিয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়নে রত হলেন। দিগন্তে কোন আলো দৃশ্যমান হলো না।

এই অন্ধকার বিষণ্ণ সময়ে আমি জেনারেল ইয়াকুবের দিকে ফিরলাম। তার প্রেক্ষা সর্বদাই আমার জন্যে শক্তির উৎস ছিল। আমি তাকে পরিস্থিতির ওপর তার বিশ্বেষণের জন্য বললাম। তিনি বললেন, ‘আমি অন্ত চালনা পেশায় প্রশিক্ষণ পেয়েছি। সামরিক গতিবিধির

১১. জেড এ ভুট্টো, দি প্রেট ট্রাইজেটি, পৃষ্ঠা-২২

১২. দুই জন কাশ্মীরি ৩০ জানুয়ারি ফকার বিমানটি লাহোর নিয়ে আসে। পরবর্তী কালে বিচার বিভাগীয় তদন্ত নিশ্চিত করে যে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করার অভ্যুত্ত খাড়া করার জন্য এটা ছিল একটি ভারতীয় ষড়মত্ত।

ক্ষেত্রে আমার মননের তত্ত্বাতে নাড়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা যখন ভারতীয় মাউন্টেইন ডিভিশনকে নির্বাচন তদারকের কাজে কাশীর থেকে পশ্চিম বাংলায় সরিয়ে আনে, বাহ্যত এটাই প্রতীয়মান হয়, আমি সঙ্গে সঙ্গে এর অর্থ উপলব্ধি করে নিতে পারি। যেমন: সত্য কী এটাকে ঘোষিত উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে? অথবা অন্য কোন ভূমিকা রয়েছে? সে কী মাউন্টেইনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে? এর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে আত্মারক্ষার জন্য অথবা পূর্বপাক্ষিক আক্রমণাত্মক কিছু? কিন্তু আমার রাজনৈতিক তত্ত্ব দারুণ ভৌতা। যখন মুজিব কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তখন আমি তার পুরো অর্থ বুঝে উঠতে পারি না....সত্যিই আমি বুঝি না। তিনি (মুজিব) আমাকে এক কথা বলেন আর পুরো উল্টোটা বলেন তার জনগণের কাছে। আমি বুঝতেই পারি না তিনি কি বলতে চান।'

দশ দিনের এক ভীতিকর নীরবতার পর পশ্চিমাঞ্চলে নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। দুই দিনের বিরতির পর নতুন অগ্রগতির পট উন্মোচিত হলো। ২১ ফেব্রুয়ারি মি. ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক দীর্ঘ আলোচনায় বসলেন। দু'দিন পর ঘোষণা করা হলো যে, ও মার্চ ঢাকাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। আরো দু'দিন পর মি. ভুট্টো পেশায়ারে ১৫ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফায় কোন সমবোতা, আপোষ কিংবা সমব্য ছাড়াই জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তার পার্টির যোগদানের অপরাগতার কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি আমার লোকদের দ্বিতীয় বিপদের মধ্যে নিষ্কেপ (ঢাকায় পাঠিয়ে) করতে পারি না।' তিনি হংক দিলেন, 'পিপলস পার্টি যদি বাইরে রাখা হয় তাহলে খাইবার থেকে করাচি পর্যন্ত বিপ্লব হবে।'

ভুট্টোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার দু'দিন পর ইয়াহিয়া খান তার বেসামরিক মন্ত্রিসভা তেঙ্গে দিলেন। এই সিদ্ধান্ত তার শাসনকালে বেসামরিক ব্যক্তির সম্পৃক্তার অবসান ঘটালো এবং খাঁটি সামরিক আইন শাসনের অধীনে দেশ আবার ফিরে গেল। দুদিন পর রাওয়ালপিণ্ডিতে তিনি তাঁর সামরিক গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের সম্মেলন ডাকলেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুব এবং ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেতে হবে। ২২ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ঘরোয়াভাবে মতামত বিনিময়ের জন্যে জেনারেল ইয়াকুব ১৯ ফেব্রুয়ারি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দু'টি বিষয় উত্থাপন করলেন। প্রথমত, বললেন যে, মি. ভুট্টো তার অবস্থান নমনীয় রেখেছেন। যদি মুজিব কিংবা প্রেসিডেন্ট তার মতামত গ্রহণ করার আশ্বাস দেন তাহলে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবেন। তিনি বললেন, 'আমি মনে করি, নিজের কথা কার্যকর করার ব্যাপারে জেনারেল ইয়াহিয়া লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে নিজেকে সজ্জিত রেখেছেন।' দ্বিতীয়ত, তিনি মত প্রকাশ করলেন, যদি এই অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে তাহলে এ অনিবার্যভাবে সামরিক পরিস্থিতির উন্নত ঘটাবে এবং সেটা হবে বিপর্যয়কর। মনে হতে পারে, ইয়াহিয়া খান বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করছেন, মৃত্যু তিনি এটাকে তরাষ্ঠিত করছেন। অবশ্য জোর দিয়ে বললেন যে, 'অনুমানসিদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।' যদি সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে তিনি আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'একজন শল্যচিকিৎসকের ছুরির

মতই এ দ্রুত হওয়া উচিত। এবং আরোগ্যের জন্য সাথে সাথে বড় রকমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।'

রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার আগে জেনারেল ইয়াকুব ও অ্যাডমিরাল আহসান মুজিবের সঙ্গে দেখা করলেন। 'ছয় দফা আপোষমূলক' বলে তিনি তাদের আশ্বাস দিলেন। কী ধুরন্দর লোক! নিজ অবস্থানকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারে তিনি অসাধারণ চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারতেন। সম্ভবত একেই বলে রাজনীতি।

রাওয়ালপিণ্ডিতে কি আলোচনা হয়েছে এবং কী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তাদের আলোচনার ফলাফল ঢাকায় কি হতে পারে, সে সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম। আমাদের কাছে খবর এলো যে, মুজিবকে আরেকটি সুযোগ দেয়া হবে তার উদ্দেশ্যের সতত প্রমাণের জন্য। অন্যথায় 'সামরিক আইনের পুনঃ প্রবর্তন (প্রয়োগ) ঘটবে এর চিরাচরিত ধারা অনুযায়ী।' এর দুটো অর্থ বহন করে। এক, মুজিবের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপ শুরুর নতুন প্রচেষ্টা নেয়া। দুই, নিয়ন্ত্রণকে পুরোপুরি করায়তের জন্য সামরিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা। জেনারেল ইয়াকুব ও অ্যাডমিরাল আহসান ঢাকায় ফিরে আসার সাথে সাথেই একই সঙ্গে দুইক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়ে গেল। আহসান মুজিবের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে বসলেন বোৰানোর চেষ্টা করলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য তাকে ছয় দফার অবস্থান থেকে নেমে আসা উচিত। আহসান তাকে বললেন, 'আপনি ছয় দফা প্রচারকালে বলছেন, এটা পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছেও তেমনি। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের জনগণ এর চরম বিরুদ্ধে। অতএব, আপনার এমন এক পদক্ষেপ নেয়া উচিত—যা ওই মনোভাবকে ধ্বং মুছে দিতে পারে।' অ্যাডমিরাল আহসানের কথানুযায়ী মুজিব তেমন পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি কয়েকদিন পর ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে ছয় দফা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি জোর করবেন না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় ছয় দফার পুরো আধেয় প্রয়োগে এক ইঞ্জিও নড়বেন না।

জেনারেল ইয়াকুব তার স্টাফকে 'ব্রিংস' নামধেয়ে অপারেশন-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করার আদেশ দিলেন। মূলত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের জন্যে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল ১৪শ' ডিভিশনের সদর দফতর। পূর্ব পাকিস্তানে পুরোপুরি প্রেস সেসরশিপ প্রয়োগের জন্যে আমাকে আমার ছোটখাটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে বলা হলো। মূল 'ব্রিংস' পরিকল্পনার সাথে একে সংযোজিত করতে হবে। বিশ্বেডিয়ার বললেন, 'এমনভাবে তৈরি কর যাতে সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্রই কেন প্রশ্ন তোলার আগেই যেন তুমি সেটা প্রয়োগ করতে পার।' 'আমি কী এখন একটি প্রশ্ন করতে পারি?' 'হ্যাঁ,' তিনি জবাব দিলেন।

আমি বললাম, 'এই পরিকল্পনার ভিত্তি কী হবে? আমি কী ধরে নেব যে, বেসামরিক কর্মচারীরা আমাদের সঙ্গে আছে, কেননা, সেসরশীপের পুরো ব্যাপারটিই পরিচালনা করা হয় বেসামরিক প্রেস অফিসারদের সাহায্যে।'

তিনি বরং রেগেই বললেন, 'আমি ওসব কিছুই জানি না। তাদের প্রতিক্রিয়া মাপা তোমারই কাজ। তা থেকেই তোমার সমস্যার উত্তর খুঁজে নাও....কিন্তু টাইপ (পরিকল্পনা) করবে না। নিজের হাতে লিখে একটি মাত্র কপি তৈরি করবে এবং আজই আমাকে দেবে।'

২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পিআইএ'র বিমানে ২৭ বালুচ ও ১৩ ক্রন্তিয়ার ফোর্সের পদাতিক ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা ঢাকায় আসতে শুরু করলো। ১ মার্চ পর্যন্ত সৈন্য আনার প্রক্রিয়া চললো। স্থানীয় ব্রিগেড সদর দফতরকে (৫৭ ব্রিগেড) তাদের নিজস্ব নতুন পরিকল্পনার সাথে এই অতিরিক্ত সৈন্যদের সংযুক্ত করে নিতে বলা হলো। নিরাপত্তার কারণেই বাঙালি ব্রিগেড মেজরকে এই নতুন ব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলো। যে বিমান বন্দরের কর্মচারীর অধিকাংশই বাঙালি সেখানে শত শত সৈন্য বিমানে করে আসছে, তা আর গোপন রাখা গেল না।

সামরিক দিক দিয়ে পরিস্থিতি যখন সামরিক আইনের পুনঃপ্রয়োগের অবস্থায় গিয়ে পৌছলো, তখন আওয়ামী লীগ বিচলিত হয়ে পড়লো। একটা মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে বলে ধরে নিল। মুজিবুর রহমানের একজন সহচর বলেছিলেন যে, মুজিবের সংকল্প টলে গিয়েছিল। কেননা, আপোষহীন মনোভাবের দরূণ যে মৃত্যু ও ধ্বংসের অবতারণা হবে তার দায়িত্ব নিতে তিনি সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তার বিদেশী পৃষ্ঠপোষকরা, যারা তাকে গোপনে মদদ দিচ্ছিল, তারা ওই মুহূর্তে শক্তি প্রদর্শনের বিষয়টিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে সশস্ত্র মোকাবেলা এড়াবার জন্য অথবা নিজস্ব মোকাবেলা মেশিনারিকে জোরদার করার লক্ষ্যে সময় নেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের আগ্রাণ চেষ্টা করলো।

২৫ ফেব্রুয়ারি একটি প্রভাবশালী বাংলা দৈনিকের সম্পাদক আমাকে টেলিফোন করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠকে বসার জন্যে জোরাজুরি করতে থাকলেন। আমি জানতাম যে, আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের তিনি খুব ঘনিষ্ঠ এবং বিষয়টি, ভাবলাম, সর্বশেষ পরিস্থিতি সংক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আমি সকাল এগারটায় গাড়ি চালিয়ে তার অফিসে গেলাম। সেখানে তিনি দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে আবিষ্কার করি, তারা দুজন আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তারা বললেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে দ্রুত ঢাকা সফরে আসতে বলা উচিত। আমি বললাম, ‘দুঃখিত, আমি প্রেসিডেন্টের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করি না।’

তারা বললেন, ‘কিন্তু আপনার কথা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছাতে পারে। বিষয়টি অতীব জরুরি।’ এরপর তারা জানালেন, যদি প্রেসিডেন্ট আসেন তাহলে আওয়ামী লীগ তার সফরকে সম্মানিত করবে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুবিধা দান করে। তারা বললেন, ‘প্রকাশ্যে আমরা ছয় দফার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। আসলে ভেতরে এমন কিছু সংশোধনী আনবো—যা আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।’ তারা তাদের বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য জানান, মুজিবের অনুমোদন নিয়েই তারা কথা বলছেন। যেসব সংশোধনীর কথা তারা বলেন, সেগুলো হলো।

(১) বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাদেশিক বিষয় হিসেবে থাকবে। প্রদেশগুলি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল পাঠাবে। এরাই বৈদেশিক বাণিজ্যের বাজার অনুসন্ধান এবং বাণিজ্য চুক্তির মধ্যস্থতা করবে। কিন্তু কোন বাণিজ্য সমরোহ কার্যকর হবে না যতক্ষণ না কেন্দ্র অনুমোদন করছে।

(২) প্রদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র থেকে আয়কৃত অর্থ প্রাদেশিক রিজার্ভ ব্যাংকে জমা থাকবে। কিন্তু এই অর্থ কোন প্রকল্পেই ব্যায়িত হবে না যতক্ষণ কেন্দ্রীয় সম্বয় কমিটি অনুমোদন করছে। এই সম্বয় কমিটিতে প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিটের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে।

(৩) খাজনা এবং অন্যান্য অর্থ আদায়ের বিষয়টি প্রাদেশিক বিষয় হিসেবেই থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার খাজনা আদায়ের ব্যাপারটি নিজেই যদি তার প্রশাসন দিয়ে করাতে চায়, করতে দেয়া হবে।

(৪) আলাদা মুদ্রার জন্যে আমরা চাপ দেব না।

তারা এই বলে সমাপ্তি টানলেন যে এ বিষয়ে তারা লিখিত প্রতিশ্রূতি দিতে প্রস্তুত। যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের মতামত পৌছে দেয়ার প্রতিশ্রূতি দিলাম এবং প্রস্তাব দিলাম, মুজিবের জন্যে এখনও পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যাওয়ার সময় হাতে আছে। বললাম, ‘আমি নিশ্চিত যে, তার সফর কাজে দেবে। অবশ্য এ বিষয়ে কাজ করার জন্যে আমাকে নিয়োগ করা হয়নি।’ দ্বিপাহারিক আহারের সময় তারা এই প্রস্তাব নিয়ে মুজিবের সঙ্গে আলাপ করবেন এবং বিকেলে আমাকে জানাবেন বলে কথা দিলেন।

একই অফিসে আমরা বিকেল ৪টায় মিলিত হলাম। আমার প্রস্তাবে তারা আমাকে মুজিবের এই প্রতিক্রিয়া জানালো ‘সম্প্রতি আমার (মুজিব) সঙ্গে গর্ভন আহসানের অত্যন্ত সন্তোষজনক আলাপ হয়েছে। তিনি এমন কোন ইঙ্গিত দেননি যে, রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টের আমাকে প্রয়োজন। ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠৰ্য পার্টি কনভেনশনের আয়োজন নিয়ে আমি খুবই ব্যস্ত এবং আমি যেতে পারি না যতক্ষণ না আমাকে আশৃষ্ট করা হচ্ছে যে, কোন নতুন অঞ্চলিত হয়েছে, যার ওপর জরুরি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।’

সন্ধায় আমি জেনারেল ইয়াকুবকে আমার সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেরিত একটি বড়সড় টেলিগ্রামের অফিস কপি তুললেন যা তিনি ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টকে পাঠিয়েছেন, তাতে তাকে সময় নষ্ট না করে ঢাকায় আসতে অনুরোধ করেছেন। মনে হলো, আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিরা আমাকে যা শুনিয়েছিলেন—তা ইতিমধ্যেই জেনারেল ইয়াকুবকে জানানো হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের সফরের জন্যে আমরা একান্তভাবে আশা ও কায়মনোবাকে প্রার্থনা করলাম। আমরা মনে করলাম, সংকট এড়াবার এখনও সময় আছে। আমি এ-ও দেখলাম, কয়েকজন জুনিয়র অফিসার প্রেসিডেন্টের আসন্ন সফরের জন্যে স্বাভাবিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে লেগে গেছে। যদি তিনি হঠাতে করে এসেই যান সেক্ষেত্রে তিনি যাতে নিয়মমাফিক অভিবাদন প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত না হন—সেজন্যেই এ ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা।

প্রেসিডেন্ট এলেন না। বদলে এলো আরো অশুভ একটা কিছু।

## মুজিব ক্ষমতা নিলেন

প্রেসিডেন্টের প্রিসিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস জি এম পীরজাদা ২৮ ফেব্রুয়ারি গৱর্নর আহসানকে এক অশুভ বার্তা নিয়ে টেলিফোন করলেন। জানালেন, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিষদ কক্ষের বাইরে খসড়া শাসনত্বের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলো যাতে একটা সময়োত্তায় পৌছতে পারে সে ব্যাপারে সময়দানের উদ্দেশ্যে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পীরজাদার কথানূয়ায়ী একই দিন সন্ধ্যা সাতটায় মুজিবকে গভর্নমেন্ট হাউজে ডেকে আনা হলো। দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা শেষে আহসান তাকে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। হতবাক করার মত, মুজিব চলে গেলেন না। তিনি তার যুক্তিহীন মিঠতা ধরে রাখলেন এবং বললেন, এটাকে আমি ইস্যু করবো না যদি আমাকে নতুন কোন তারিখ দেয়া হয়। দলের ভেতরকার চরমপন্থীদের সামাল দেয়া ভারি শক্ত। যদি নতুন তারিখটি সামনের মাসে (মার্চ) হয়, আমি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবো। এখনে হলে আমার পক্ষে কঠকর হবে। কিন্তু স্থগিতকরণ যদি অনিদিষ্টকালের জন্য হয় তাহলে আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।' গভর্নমেন্ট হাউজ ছেড়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি মেজের জেনারেল ফরমানকে বললেন, 'আমরা অবস্থা দু'পাশে আগুন—মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থীরা। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? একটা ফোন দেবেন এবং আমি চলে আসবো।'

একই সন্ধ্যায় মুজিবের প্রতিক্রিয়া জানানো হলো রাওয়ালপিণ্ডিকে। এই সঙ্গে অধিবেশনের জন্যে রাওয়ালপিণ্ডিকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো। প্রতি উত্তরে রাওয়ালপিণ্ডি হিমশীতল কঠে বললো, 'আপনার বার্তা পুরোপুরি অনুধাবন করা গেছে।'

ঢাকা এই বার্তাকে নিজেদের পক্ষে মৌন সম্মতি হিসেবে ব্যাখ্যা করলো এবং আশা নিয়ে নতুন তারিখ ঘোষণার অপেক্ষায় রাইল। ঘোষণাটি প্রচারিত হলো ১ মার্চ (পূর্ব পাকিস্তান সময়) বেলা ১টা ৫ মিনিটে। প্রচও আশা আর আবেগ আমাদেরকে রেডিওর সাথে একাকার করে দিল। আমি বার্তা গ্রহণ এবং প্রেরণ বিভাগে গিয়ে বসলাম যাতে একটি শব্দও আমার শ্বরবণেন্দ্রিয় থেকে বাদ না পড়ে। আমরা শুধু বিশ্বিত হইলাম না—ভীত হয়ে পড়লাম ঘোষণায় নতুন তারিখ সম্পর্কে কিছু বলা হলো না। অণ্ণতি ভয়াবহ দৃশ্যবলি আমার মানসপটে ভেসে উঠলো।

তারিখ বাদ পড়ার বিষয়টি ছাড়াও আমাকে আরেকটি বিষয় দার্শনভাবে বিশ্বিত করলো। কয়েকটি গুরুত্বহীন অগ্রগতির বিষয় ঘোষিত হবার আগে যেটা আমাদের শ্বরণ ইন্দিয়কে কয়েকবার ধাক্কা মারলো, সেটা ছিল প্রেসিডেন্টের কঠের অনুপস্থিতি। এর অর্থ কী এই—তিনি ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ নন? এটাই আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন অধ্যাপক জি ড্রিউ চৌধুরী। তিনি বলছেন, 'এই ঘোষণায় ইয়াহিয়া শুধু সই করেছিলেন

মাত্র।’<sup>১</sup> কে তাহলে লিখেছেন এটা? এই গুরুত্বপূর্ণ অংগগতির সন্ধান নিতে গিয়ে আমি কথা বললাম মেজর জেনারেল ‘আই’-এর সাথে। তিনি ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত স্টাফ ছিলেন। বললেন, ‘ওই সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমরা সবাই নীচ তলায় ছিলাম। মেজর জেনারেল, ‘এইচ’ ও মেজর জেনারেল ‘ও’ বারবার ওপর নীচ করছিলেন। তারা প্রেসিডেন্টের কাছে এমন একটি ছবি তুলে ধরেন যে, তাতে তাকে খসড়া ঘোষণায় সম্মতি দিতে হয়।’ আত্মরক্ষায় জেনারেল ইয়াহিয়ার জন্য এটাই কী যথেষ্ট? ইয়াহিয়া ছিলেন কটুরপন্থী জেনারেলদের চাপের মাঝে, মুজিব ছিলেন চরমপন্থীদের চাপের মুখে আর ভুঁটো ছিলেন নির্বাচকদের হাতে বাধা। তাহলে মুক্ত ছিলেন কে? যে ব্যক্তি জাতীয় নেতার দায়িত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট; তার পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে যায় এই নিরিখে যে, এই ধরনের চাপের মুখে কতটুকু তিনি আত্মসমর্পণ করছেন এবং কতটুকু তিনি কাজের স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে পারছেন, তার ওপর।

ঢাকাতে অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণিকভাবে দেখা গেল। আগেই অবহিত হওয়ায় মুজিবকে তার প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতে সময় দান করলো। ঘোষণার আধ ঘটার মধ্যেই ক্রুদ্ধ জনতা রাস্তায় নেমে এলো। হাতে বাঁশের লাঠি ঘুরিয়ে, লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে প্রচণ্ড শব্দ তুলে এবং অবমাননাকর শ্বেগান দিয়ে তাদের ক্রোধের প্রকাশ ঘটালো। সমস্ত শহর যেন ক্রোধাগ্নিতে ফুটতে থাকলো। দোকানপাট লুট হলো—প্রধানত অবাঙালিদের। যানবাহন ধ্বংস করা হলো। ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানরত বিসিসিপি (বোর্ড ফর কট্টোল অব ক্রিকেট ইন পাকিস্তান) একাদশ বনাম আন্তর্জাতিক একাদশ ক্রিকেট খেলা পও করে দেয়া হলো। অঙ্গের জন্য খেলোয়াড়ুরা বেঁচে গেলেন। তাদেরকে দ্রুত এম এন এ হস্টেলে তোলা হল।

সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ওই দিন বিকেলে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি স্থানীয় এক হোটেলে বৈঠকে বসলো। পরে সন্ধ্যায় এক জনকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে মুজিব ঘোষণা করলেন, ‘একে আমরা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দিতে পারি না’<sup>২</sup> তিনি ২ মার্চ ঢাকা এবং পরদিন ৩ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলেন। পরবর্তী তিন দিন তিনি ‘সরকারকে চিন্তা-ভাবনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দান করে’ এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, ৭ মার্চ এক জনসভা করে। তিনি সেখানে তাঁর ভাবধ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন।

জনগণের সামনে দৃঢ়তা দেখিয়ে তিনি চলে এলেন গভর্নমেন্ট হাউজে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের নতুন তারিখ নির্ধারণের জন্য আবারো অনুরোধ করলেন। বললেন, ‘আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি এবং বলছি এখনও সময় আছে। এখানে যদি আমাকে একটা নতুন তারিখ দেন তাহলে আগামীকালই জনগণের ক্রোধ প্রশংসিত করতে পারবো। এরপরে হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।’

একই রাতে ঢাকার সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ ব্যক্তিরা আলোচনায় বসলেন। এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তারা টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শুধু

১. জি ডেলিউ চৌধুরী দি লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, পৃষ্ঠা-১৫৯

২. দি পাকিস্তান অবজ্ঞারতাৱ, ঢাকা, ২ মার্চ, ১৯৭১

পীরজাদা পর্যন্ত পৌছতে পারলেন। তিনি তাদের কথায় কান দিতে চাইলেন না। এরপর তারা জেনারেল হামিদকে পাওয়ার চেষ্টা করলেন (ওই সময় তিনি রাওয়ালপিণ্ডির বাইরে ছিলেন) — যাতে তিনি তার পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইয়াহিয়া খানকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে পারেন। জেনারেল হামিদ সব শুনলেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়াকে বলবেন বলে প্রতিশ্রূতি দিলেন। কিন্তু কিছুই এলো না। পরে ওই রাতে জেনারেল পীরজাদা জেনারেল ইয়াকুবকে টেলিফোন করলেন এবং অ্যাডমিরাল আহসানের কাছ থেকে গভর্নরের দায়িত্বভার নিয়ে নেয়ার জন্য তাকে বলদেন। অ্যাডমিরাল আহসান অত্যন্ত অনানুষ্ঠানিকভাবে গভর্নমেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেশ নিষিদ্ধ হলো। আমার ধারণা মতে, ‘ঘটনার এই আবর্ত ঘড়্যন্ত্রের অভিত্তি সম্পর্কে মুজিবের ধারণাকে দৃঢ়তর করলো।’ তিনি প্রচণ্ড আঘাতে সমরোচ্চির সব দরোজা বন্ধ করে দিলেন। ‘আহিংসা অসহযোগ’ আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং যুদ্ধের পথে পা বাঢ়ালেন।

ঢাকা বিমান বন্দরে পিআইএ’র বাঙালি কর্মচারীরা সর্বপ্রথম কাজ বন্ধ করে দিল। যে সব ফ্লাইটে করাচি থেকে সৈন্য (২২ বালুচ ও ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) আসছিল সেগুলোর কাজকর্ম হাত লাগাতে অস্থীকার করলো। দুই বাঙালি যুবক পিআইএ-র একটি বোয়িং উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তাদের পরিকল্পনার কথা আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়ার ১ মার্চ থেকে পাকিস্তান এয়ার ফোর্স ফ্লাইট পরিচালনা ও বিমান বন্দর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। পরের উথাল-পাথাল সময়কালেও তারা এ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করে।

সৈন্য আগমন মুজিবের আশংকাকে বন্ধমূল করলো। তিনি প্রতিবাদী কঠো বললেন, ‘যে বোয়িংয়ে করে এম এন এ-দের আসার কথা তাতে করে আনা হচ্ছে সৈন্য। আনা হচ্ছে বাঙালির আশা-আকাঞ্চকাকে দমনের জন্য।’ জেনারেল ইয়াকুব রাওয়ালপিণ্ডিকে অবিলম্বে সৈন্য প্রেরণ বক্সের অনুরোধ জানালেন কারণ আরো সৈন্য ভালোর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর হবে।

মুজিব আগুন উসকে দিলেন। কত দ্রুত এই আগুন সারা প্রদেশ অথবা দেশকে প্রাস করবে, সে ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত নয়। স্থানীয় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ একটি সামরিক আইন বিধি (১১০ নম্বর) জারি করলেন আগুন প্রশমনের জন্য। এই বিধি পত্র-পত্রিকায় এমন ধরনের খবর, মতামত কিংবা ছবি প্রকাশ নিষিদ্ধ করলো যা পাকিস্তানের সংহতি এবং সার্বভৌমত্ব বিরুদ্ধ। ওই অগ্রিমিক্ষা সামরিক আইন বিধিসম্বলিত কাগজের টুকরোকেও প্রাস করলো।

সাংবাদিকরা জারিকৃত বিধিমালার আধেয় মেনে চলতে পারতো কেবলমাত্র তার ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের জীবন বিপন্ন করে। আওয়ামী লীগের গুরুত্ব (শক্তিশালী সশস্ত্র যুবকদল) তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো যারা তাদের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারলো না। অন্যদিকে প্রশাসন ওই সব সন্ত্রাসিত সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের লোকজনদের রক্ষার জন্য কিছুই করতে সক্ষম হলো না। সুতরাং অনিবার্য ফলাফল স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে চিফ সেক্রেটারি শফিউল আজম আওয়ামী লীগের জন্য দারুণ

উপকারী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করলেন। গোলযোগকে আরো জটিল এবং পূর্ব পার্কিস্টানে ইয়াহিয়া সরকারকে অকার্যকর করে তোলার খেলায় নামলেন। আওয়ামী লীগ শফিউল আজমের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে এগোলো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী নিয়োগের ‘অনুরোধ’ জানিয়ে শফিউল আজম বেসামরিক বিষয়াবলির অধিকর্তা মেজর জেনারেল ফরমানকে টেলিফোন করলেন। জবাবে ফরমান বললেন, ‘যতটা সোজা মনে করছেন ততটা নয়। এ মারাত্মক পরিণতিবহ। আপনি বরং আপনার স্বাভাবিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিয়োগ করুন।’ মি. শফিউল আজম জোর দিয়ে বললেন, ‘না, জেনারেল সাহেব, ওরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে না। সেনাবাহিনীকে পা বাড়াতে হবে।’ সিনিয়র মার্শাল ল’ অফিসারদের কাছে একই ধরনের টেলিফোন করলেন স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশের ইসপেক্টর জেনারেল। কয়েক মিনিট পর শফিউল আজম আবার জেনারেল ফরমানকে টেলিফোন করলেন। তাঁর ‘অনুরোধ’ রক্ষার জন্যে জোরাজুরি শুরু করলেন। তখন জেনারেল ফরমান বললেন, ‘আপনি কি শেখ সাহেবের সাথে পরামর্শ করেছেন?’ শফিউল আজম জবাবে বললেন, ‘হ্যাঁ, কথা বলেছি। তার অনুমোদন নিয়েই কথা বলেছি।’

সেনাবাহিনী রাজি হয়ে গেল এবং ফাঁদে পা দিল। যে মুহূর্তে কার্ফু জারি করা হলো (২ মার্চ সন্ধ্যা) এবং সেনাবাহিনী এগোলো কার্ফু বলবৎ-এর উদ্দেশ্যে—সেই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ তার কর্মীবাহিনীকে পাঠালো কার্ফু অমান্যের জন্যে। সহিংস জনতার রোষ থেকে গর্ভন্মেন্ট হাউজকে রক্ষার জন্যে ৩২ পাঞ্জাবের এক প্লাটুন সৈন্য হেলিকপ্টারে করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। গুলি না ছোঁড়ার কড়া নির্দেশ ছিল সৈন্যদের ওপর। অন্যদিকে মনে হলো, গুলি যাতে বর্ষিত হয় সে ব্যাপারে উক্ফানি সৃষ্টির কড়া নির্দেশ ছিল আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর। ভয়ানক রকমের জটিল মুহূর্ত ছিল সেটা। বিগেড়িয়ার ‘এ’ তার অফিসারদের অধীনে সৈন্যদের রেখে বিপজ্জনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ জানাবার জন্য মার্শাল ল’ সদর দফতরে চলে এলেন। বললেন, ‘তোমরা আমার হাত বেধে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছো। সৈন্যদের বিদ্রূপ করা হচ্ছে। এখনও তারা গুলি না করার আদেশ মান্য করে যাচ্ছে। কিন্তু দ্রুত তাদের দৈর্ঘ্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে।’ আমিও তার প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষ শুনলাম। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তাকে যেমন দেখেছিলাম, তার চেয়েও তাকে বেশি বিচলিত মনে হলো।

পরে সেই রাতেই চাপ আরো প্রচও হলো এবং সৈন্যদের দৈর্ঘ্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়লো। সৈন্যরা সামান্য আহত (ইট ও এই ধরনের অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র নিষ্কেপজনিত কারণে) হলো। কিন্তু জনতার মধ্যে ছয়জনের জীবনহানি ঘটলো। এদের তিনজন গর্ভন্মেন্ট হাউজের বাইরে মারা পড়লো। তারা ভাঁচুর ও লুঁষনের চেষ্টায় ছিল। এক রাতে ছয় ছয়টা মৃতদেহ! দিনটিতে শফিউল আজম এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের বিজয় ঘোষিত হলো। এই ঘটনা সেনাবাহিনীর জন্যে পরিস্থিতিকে শুধু জটিলতার করে তুললো না—আওয়ামী লীগের আন্দোলনেও নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো।

পর দিন তারা মৃতদেহগুলো নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় মিছিল করলো। এরপর মুজিব মৃতদেহগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে একজন বাগী হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তার আগুনঝরা বক্তৃতা মিছিলে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো যে, তারা তার

জন্য জীবন বাজি রেখে যে কোন ধরনের ভয়াবহ কাজে তাৎক্ষণিকভাবে নেমে যেতে পারে। এরপর তিন চার পৃষ্ঠার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠালেন। তাতে তিনি 'জনপ্রতিনিধিদেরকে' 'একমাত্র বৈধ ক্ষমতার উৎস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'বেআইনি সরকার'-এর বিরুদ্ধে রখে দাঁড়াবার জন্যে সরকারি কর্মচারীসহ সমাজের সকল শরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন।<sup>৩</sup>

এই উক্তানিমূলক বিবৃতি খবরের কাগজে পৌছে গেল। প্রায় একই সময়ে পৌছে গেল সামরিক আইন সদর দফতরে,— ২ মার্চ মধ্যরাতের কিছু আগে। একজন 'বিজ্ঞ' মার্শাল ল' অফিসার পরামর্শ দিলেন এই বিবৃতি ছাপাতে না দিতে। আমি বললাম, 'সেটা হয়তো সম্ভব। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে হশ্যিয়ার থাকতে হবে। এটা মুজিবকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলবে এবং আগামীকাল সরকারকে তিনি আরো প্রবলভাবে আঘাত করবেন।' তখন জেনারেল ইয়াকুব আঘাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তার অফিস রুমে। বললেন, 'তুমি কী পরামর্শ দিতে চাও?' যদিও জানি, মুজিবের সঙ্গে তিনি এক ধরনের সমীকরণে রয়েছেন, তবু বললাম, 'যদি বিবৃতিটি প্রত্যাহারে মুজিবকে রাজি করাতে পারেন কিংবা বক্তব্যের ব্যাপারে তিনি যদি আরো কিছুটা নমনীয় হন তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার উপস্থিতিতে মুজিবের সাথে টেলিফোনে আলাপ করলেন চল্লিশ মিনিট ধরে—রাতে সাড়ে এগারোটা থেকে মধ্যরাত্রি অতিক্রম করা পর্যন্ত। মুজিবকে রাজি করানোর জন্যে তিনি তার যাবতীয় কৌশল, প্রজ্ঞা এবং কৃতীতি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। জেনারেল বললেন, 'শেখ সাহেব, আপ খুউদ সেয়ানে হ্যায়।'<sup>৪</sup> আপনি জানেন পরিস্থিতি দারুণ উত্তেজনাকর। এ ধরনের বিবৃতি পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে মাত্র।' মুজিব পাল্টা যুক্তি তুলে বললেন, 'না এত উত্তেজনামূলক কিছুই নেই। এটা শুধুমাত্র আরেকটা রাজনৈতিক বিবৃতি।' বিতর্ক চলতে লাগলো। মুজিব মানতে রাজি হলেন না। টেলিফোন রেখে বকঝকে টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে আমাকে বললেন, 'তিনি বলছেন আমি নমনীয় হতে পারছি না। আমি চাপের মধ্যে আছি। ভাল হয় আপনি এসে আমাকে প্রেরণ করুন। এতে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' আমি প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম, 'এতে আমারটা সমাধান হবে না।' কিন্তু সম্ভবত এ বলার সময় এটা নয় ঠিক আছে বল, এখন আমরা কী করতে পারি।'

এরপর তিনি একটি 'ক্ষুদ্র যুক্ত পরিযন্দ'-এর বৈঠক ডাকলেন। আমাকেও রাখা হয় সে বৈঠকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, বিবৃতি প্রকাশের ফলস্বরূপ যদি কোন এলাকায় কোনরূপ উত্থান ঘটে তাহলে তা মোকাবেলার জন্যে সারা ধর্দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সেনানিবাসগুলোকে আগেভাগেই সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতে হবে।

পরদিন সকালে জেনারেল ইয়াকুব আবারও যোগাযোগ করলেন রাওয়ালপিডির সঙ্গে। অনুরোধ করলেন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা প্রদানের জন্য। কেননা, পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্টের জবাব ছিল, 'আপনার বিচারবোধের ওপর আমার আস্থা আছে। যদি 'রাওয়ালপিডি ও ঢাকার মধ্যে টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন' হয়ে যায় তাহলে আপনি তা প্রয়োগ করতে পারেন।' কিন্তু ঢাকা ও

৩. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, মার্চ ৩, ১৯৭১

৪. আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি

রাওয়ালপিডির মধ্যে আসল যোগাযোগ ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। শুধু বেতার যোগাযোগই ছিল কার্যকর।

ইতিমধ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলো। তেজোদীপ্ত জনতা ঢাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলো। সেনাবাহিনীর সঙ্গেও সংঘর্ষ হলো। ফলে প্রাণহানি হলো বেশ কিছু। একই ধরনের খবর এলো চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট এবং রংপুর থেকে। যেখানে সেনাবাহিনী ছিল না সেখানে জনতা অবাঙালিদের জানমাল এবং সম্মান নিয়ে খেলায় মেতে উঠলো।

পরিস্থিতির সার্বক্ষণিক অগ্রগতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অবহিত রাখা হচ্ছিল। শুরুতে তিনি নড়াচড়া করলেন না। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে তখন তিনি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান দিলেন।

১০ মার্চ ঢাকার সব রাজনীতিকের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। মুজিবের কাছে আগেই বার্তা প্রেরণ করা হলো, তার প্রতিক্রিয়া পরিমাপের জন্য। তার সম্মতিসূচক বার্তা রাওয়ালপিডিকে অবহিত করা হলো। যখন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব ঘোষণা করা হলো সঙ্গে সঙ্গে তিনি তৈরি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, ‘আর কোন আরটিসি নয়; আর কোন তামাশা নয়।’<sup>৫</sup> তার ক্ষেত্র প্রশংসিত হলে তাকে তার পরিবর্তিত চেহারা সম্পর্কে প্রশংসন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, ‘রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এককভাবে অথবা গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনার প্রশ্নে আমি ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বৈঠকে অংশ নিতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু আমি চাইনি কিংবা চাইও না ভুট্টোর মত লোকের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের মতো একটি আলোচনায় বসতে, যে ব্যক্তি বাঙালির রক্তপাতের জন্য দায়ী।’ ভুট্টোই যে পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগের জন্য দায়ী মুজিব তার এ অভিযোগের ব্যাপারে আর রাখ ঢাক করলেন না।

হতাহতের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়তে থাকলো। ৩ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ট কলেজে ১৫৫ জন আহতকে ভর্তি করা হলো। পরদিন আটজন মারা গেল। চারজন ঘটনাস্থলে এবং চারজন হাসপাতালে। মুজিব হাসপাতালে গেলেন আহতদের দেখতে এবং সবাইকে রক্তদানের আহান জানালেন।

মুজিবের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং শফিউল আজমের অনুরোধে আনা সৈন্যদের শহরে অবস্থানকালের দুদিনের মধ্যেই তাদের উপস্থিতি ‘জনগণের প্রতি উষ্ণানিমূলক’ বলে অভিহিত করা হলো। মুজিব এখন চাইলেন যে, তারা তাদের ব্যারাকে ফিরে যাক। মনে হলো, তিনি তাদের ‘কার্যক্ষমতা’ পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করবে কে? মুজিব জবাবে বললেন, ‘আমার ওপর ছেড়ে দাও।’ আমি আমার স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগাতে পারবো। প্রয়োজন পড়লে আনসারদের (প্রাদেশিক আধাসামরিক বাহিনী) ডাকবো এবং পুলিশের সাহায্য নেব। কিন্তু তোমাদের সেনাবাহিনীর আমার দরকার নেই। এদেরকে ব্যারাকে পাঠিয়ে দাও।’

মুজিবের প্রস্তাব গুরুত্বসহকারে মার্শাল ল’ সদর দফতরে বিবেচিত হলো। সদর দফতরে সভায় সাধারণ ধারণা হলো, আওয়ামী লীগের কার্যকর সহযোগিতা ছাড়া শান্তি

৫. ১৯৬৯ সালের ১১-১৩ মার্চ রাওয়ালপিডিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট আইউব খানে ঢাকা গোল টেবিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়।

অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে একটি সুপারিশ পাঠানো হলো রাওয়ালপিণ্ডিতে। এবং সেনানিবাসে সৈন্যদের ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল। এর অর্থ দাঁড়ালো, আওয়ামী লীগের রক্তপিপাসু ষেছাসেবকদের শাস্তি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করা। কিন্তু সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা হলো।

সুতরাং সরকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুজিবের পক্ষ হয়ে ক্ষমতা থেকে সরে এলো, যিনি এখন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসকে পরিণত হলেন। মুজিবের অধীনে অবাঙালিদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠলো। অনেকেই ক্যাটনমেটে আশ্রয় নিলো, যা হয়ে দাঁড়ালো নির্যাতন সমুদ্রের মাঝে নিরাপত্তার একটুকরো দ্বিপ। সেনানিবাসে এমন কোন বাড়ি ছিল না—যেখানে পাঁচ হতে পঞ্চাশজন মানুষ শহুর থেকে এসে আশ্রয় নেয়নি। বারান্দায়, বাড়ির পেছনে, অলিন্দে, চাকর-বাকরদের কোয়ার্টারে এমন কী বান্না ঘরেও তারা থাকার জায়গা করে নেয়। যাদের টিকিট কেনার ক্ষমতা ছিল তারা নিরাপদ স্থান পঞ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অবাঙালিকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছিল।

মানুষের দুঃখ-দুর্দার ব্যাপারে জেনারেল ইয়াকুব দারুণ সংবেদনশীল মনের মানুষ ছিলেন। সেহেতু ৪ মার্চ জেনারেল পৌরজাদাকে টেলিফোন করলেন প্রেসিডেন্টকে জানানোর জন্যে যে, তিনি যেন কালবিলস্ব না করে ঢাকা সফরে অবশ্যই আসেন। কেননা, একেকটি ঘট্ট পার হয়ে যাওয়া মানে সম্ভাব্য সমাধানের পথ থেকে আরো দূরে সরে যাওয়া। পৌরজাদা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে পাঁচটা টেলিফোন করলেন। জানালেন, প্রেসিডেন্ট যুব শিগগিরই ঢাকা সফরে যাচ্ছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন নুতন তারিখ দেয়া অসুবিধাজনক। জেনারেল পৌরজাদা আরো জানান, প্রেসিডেন্ট ‘এক্ষুণি’ মুজিবের সঙ্গে কথা বলবেন এবং ‘অবস্থা জটিল না করার জন্য’ তাঁকে বলবেন। ইয়াহিয়া একটি ব্যক্তিগত টেলিফোনে মুজিবের সাথে যোগযোগ করলেন। টেলিফোনটির নথর টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে ছিল না।

এই অগ্রগতি জেনারেল ইয়াকুবকে দারুণ স্বষ্টি দিল এবং তাদেরও—যাদের ওপর তার আস্থা ছিল। একই রাতে (৪/৯ মার্চ) গভর্নর আহসানের পঞ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার কথা। তিনি ১ মার্চ জেনারেল ইয়াকুবের হাতে গভর্নরের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন। জেনারেল ইয়াকুবের বাসভবনে তাকে এক বিদ্যায়ী নৈশভোজ দেয়া হয়। মেজর জেনারেল খাদিম রাজা ও মেজর জেনারেল ফরমান আলীও ওই বিদ্যায়ী ভোজে উপস্থিত ছিলেন। ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানকে বিদায় দিয়ে তিনি জেনারেল আলোচনায় বসলেন। প্রেসিডেন্টের আসন্ন সফর এবং পরিস্থিতির ওপর তার সফরের প্রভাব সম্পর্কে মতামত বিনিময় করছিলেন। ৯টা ১০ মিনিটে অক্ষম্বাণ্ড টেলিফোন বেজে উঠলো এবং তাদের আলোচনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলো। টেলিফোনের অপর প্রান্তে আছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি জেনারেল ইয়াকুবের সাথে কথা বলতে চান। জেনারেল ইয়াকুব আশংকিত পায়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্যদিকে বেগম ইয়াকুব, জেনারেল রাজা, জেনারেল ফরমান এবং তাদের পাত্তীরা রইলেন উৎকর্ষায়। ইয়াহিয়া বললেন, ‘আমি আমার মত বদলেছি। আমি ঢাকায় আসছি না।’ জেনারেল ইয়াকুব দু’একটা কথামাত্র বললেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। বললেন, ‘না আমি আসতে পারি না। কেননা, আমি বুঝে ফেলেছি, এই সফর আমাকে সমস্যা সমাধানের কাছাকাছিও নিয়ে যেতে পারবে না।’ এ কথা বলেই তিনি টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

তাৎক্ষণিকভাবে তিনি জেনারেলের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার জন্ম নিল যে, তারা যেন হতাশা ও শুন্যতার মধ্যে নিষ্ক্রিয় হলেন। কী করা যেতে পারে এখন? প্রেসিডেন্ট আশার একমাত্র শিখাটি নির্বাপিত করে দিলেন। তৎক্ষণাং জেনারেল ইয়াকুব জেনারেল পীরজাদাকে টেলিফোন করলেন। তাকে মিনিটের মধ্যেই পাওয়া গেল। তিনি বললেন, ‘পীর, যদি প্রেসিডেন্টকে (ঢাকায়) আসতে রাজি করানো না যায় তাহলে আমার দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দেয়া হতে পারে। কাল সকালেই আমি আমার আনুষ্ঠানিক ইস্তফাপত্র আপনার পাঠিয়ে দেব।’ টেলিফোনে কথা শেষ হতেই খাদিম ও ফরমান দু'জনই ইস্তফা দিতে চাইলেন। ওই দুই ভদ্রলোকের ভাষ্য অনুযায়ী জেনারেল ইয়াকুব বললেন, ‘এই সমর্থনের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। এটা ট্রেড ইউনিয়ন নয়, সেনাবাহিনী। তোমরা কাজ চালিয়ে যাও।’ বৈঠক শেষ হবার আগে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, জেনারেল ফরমানকে মধ্যরাতের ফ্লাইটে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতরে (রাওয়ালপিণ্ডি) যেতে হবে পীরজাদা ও প্রেসিডেন্টকে উপস্থিতির গুরুত্ব জ্ঞাত করানোর জন্য। প্রেনে উঠে তিনি আটটি ঘন্টা সময় পাবেন এই সংবেদনশীল মিশনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে। পরদিন সকালে (৫ মার্চ) জেনারেল ইয়াকুব সিগন্যালের (টেলিগ্রাম) মাধ্যমে রাওয়ালপিণ্ডিতে তার ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিলেন। ইস্তফাপত্রটির বিষয়বস্তু ছিল চলমান পরিস্থিতির একটি মুক্ককর আদর্শ প্রতিচিন্ত।

ইস্তফাপত্র পৌছবার আগেই প্রেসিডেন্ট পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি সামরিক আইন প্রশাসক (পাঞ্চাব) ও কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে রাওয়ালপিণ্ডিতে ডেকে পাঠালেন জেনারেল ইয়াকুবের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেয়ার জন্য। জেনারেল ফরমান ও জেনারেল টিক্কা দুই জ্যাগা থেকে এবং ভিন্ন ধরনের মিশন নিয়ে একই সময়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌছুলেন। প্রেসিডেন্ট দু'জনের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে দেখা করলেন। জেনারেল টিক্কাকে সংক্ষেপে তার নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন ঘাঁটি পেশাদার সৈনিকের মত দায়িত্বভার নিয়ে নিতে সম্মত হলেন। যখন জেনারেল ফরমান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন এবং পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবেদন জানালেন তখন জেনারেল ইয়াহিয়া বললেন, ‘আমার ঘাঁটি সম্পর্কে আমাকে ভাবতে হয়, বাচ্চু। পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে আমাকে ভাবতে হবে। আমি তো আমার নিজের ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারি না।’

ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আরো রক্তপাত হলো। শিকার হলো সেইসব নিরস্ত্র অবাঙালিরা—যারা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারলো না। অবাঙালি বেসামরিক লোকজনদের ওপর আসন্ন ভয়াল মৃত্যু ভারি হয়ে চেপে বসলো। করাচিগামী বিমানের টিকিট কেনার জন্য অনেকেই তাদের ঘর-গেরস্তালীর জিনিসপত্র বিক্রি করে দিল। গুলশান ও বৰানী কলোনির কিছু ধনী বাসিন্দা পিআইএ'র একটি সিটের জন্য তাদের নতুন মডেলের গাড়ি অদল-বদল করলো। অর্থ করাচির ভাড়া ছিল মাত্র দুশো পঞ্চাশ টাকা। বিমানবন্দরে অপেক্ষামান নারী-পুরুষের লম্বা লাইন পড়ে গেল। এদের অনেকেই ‘এগিয়ে’ থাকার জন্যে নির্মুম দিবস-রজনী পার করে লাইনে বসে থেকে। এমন বেদনাদায়ক দৃশ্যের অবতারণা হলো,—যা সেই সব সমন্ব্যচারী মানুষের

হৃদয়বিদ্যারক ঘটনার সাথে তুলনীয়, যারা জলোচ্ছাসের তোড়ে এক অচেনা ঠাণ্ডা-শীতল উপকূলে নিষিঞ্চ হয়েছে।

আওয়ামী লীগ ষষ্ঠেছাসেবকরা বিমান বন্দর যাওয়ার প্রধান প্রধান সড়কে 'বাংলাদেশের সম্পদের বহির্মুখ প্রবহন' রোধের জন্য চেক পোস্ট বসালো। সবচেয়ে শক্তিশালী চৌকিটি বসানো হয় নগরীর বিমান বন্দর রোডের ফার্ম গেটে। সে পথে এক পাঠান রিকশা করে যাচ্ছিল। তাকে তল্লাশীর জন্য থামানো হলো। সে প্রতিরোধ করে। ফলাফল হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে তার নির্মম মৃত্যু। তার মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে কাছাকাছি একটি গর্তে ফেলে দেয়া হয়। ঘটনাটি ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা নগর সামরিক আইন সদর দফতরের কয়েকশ মিটার দূরত্বে। সেনাবাহিনী একদল সৈন্য পাঠালো মৃতদেহটি উদ্ধার ও ক্যান্টনমেন্টে সমাধিস্থ করার জন্য,— যা ছিল জীবন্ত ও মৃতদেহের জন্য একমাত্র নিরাপদ স্থান।

সেই চৰম কঠিন দিন, ৭ মার্চ,— যেদিন রেসকোর্স ময়দানে মুজিব জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন— সেই দিনটি এগিয়ে এলো। ঢাকা অস্থির হয়ে উঠলো। গুজব ডালপালা বিস্তার করলো। ভয়-ভীতি এবং সংশয় দানা বাধলো। ব্যাপকভাবে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্যে একপক্ষীয় (ইউ.ডি.আই.) শারীনতা যোগ্য করবেন। অনেকে ভাবলো, তার ঘোষণা বাস্তব পরিস্থিতিকে বীতিসিন্ধ করবে। অন্যরা মনে করলেন, এর অর্থ সোজাসুজি পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া এবং এই অবস্থা সেনাবাহিনী কখনোই মেনে নেবে না।

এই ধরনের ঘোষণার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগও সজাগ ছিল। পার্টির ভেতরকার চরমপক্ষীরা তখনও ওই যোষণা দেবার জন্যে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মধ্যপক্ষীরা এর বিরোধিতা করছিল। বলা হয়, এই দুইয়ের মধ্যে মুজিবের অবস্থা ছিলো ঘড়ির পেন্তুলামের মতো দোলায়মান এবং চরম পদক্ষেপের খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিমাপ করছিলেন।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে ৬ মার্চ বৈশত্তোজ সেরে আওয়ামী লীগ বৈঠকে বসলো। সরকারের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিবিট হলো ওই সভার ওপর। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতরকে সন্ত্বাব্য 'বোমা বিফোরণ' সম্পর্কে জানান দেয়া হলো। সিদ্ধান্ত ছাড়ি মধ্যরাত্রে সভা মূলত<sup>৬</sup> হয়ে গেল। পরদিন খুব ভোরে সভা বসবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ইতিমধ্যে ঘটনায় দু'দুটো অগ্রগতি সংযোজিত হলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ মার্চ টেলিফোনে মুজিবের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন এবং তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করেন যে, 'এমন পদক্ষেপ যেন তিনি না নেন—যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় রুক্ষ হয়ে যায়।'<sup>৭</sup> পরে তিনি মুজিবের জন্য টেলিপ্রিন্টারে একটা বার্তা প্রেরণ করেন। মধ্য রাত্রে আমার উপস্থিতিতে এই বার্তাটি ঢাকার সামরিক আইন সদর দফতরে পৌঁছে। পাঠাবার আগে আমি তাড়াতাড়ি পড়ে নিলাম। পরে আমার স্মরণের ওপর নির্ভর করে আমি সেটা ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করে ফেলি। বার্তা সম্পর্কে আমার ডাইরিতে লিপিবদ্ধ আছে

'অনুগ্রহ করে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শিগগিরই ঢাকায় আসছি এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমি আপনার

৬. জি ডেবলিউ চৌধুরী দি লাস্ট ডেজ অব ইন্দাইটেড পাকিস্তান, পৃষ্ঠা-১৫৩

আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে—যা আপনাকে আপনার ছয় দফা থেকেও বেশি খুশি করবে। আমি সন্তুষ্ট অনুরোধ করছি, কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না।'

একজন ব্রিগেডিয়ার নিজে ধানমন্ডির বাসভবনে গিয়ে মুজিবের হাতে বার্তাটি পৌছে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে তিনি মুজিবের অতিথেয়তা, অদ্র আচরণ, বাসভবনের সামনে দাঁড়ানো উজন উজন গাড়ি, শত শত মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে অনুর্গল বলে যেতে থাকেন। বলেন, 'বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো যেন কোন উৎসবের রৌদ্রে অবগাহন করছে।'

বলা হয়, ঢাকা কর্তৃপক্ষের পরামর্শেই প্রেসিডেন্ট এই বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন—যাতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করা যায়।<sup>9</sup> এটা পুরোপুরিই বানোয়াট কথা। আসলে ঢাকা কর্তৃপক্ষ এই সময়ে যে কোন ধরনের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিল। এমনকি স্বাভাবিক সৈন্য চলাচলও বন্ধ রাখা হয়েছিল। ইয়াহিয়ার মনে কি ছিল, সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

একই দিন (৬ মার্চ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, '২৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।' যদি এই সিদ্ধান্তটি এক সপ্তাহ আগে নেয়া হতো তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো।

ওই রাতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো ঢাকা ক্যাস্টনমেটের ভেতর—জিওসি'র বাসভবনে তাঁকে রাত দুটোয় যুম থেকে ডেকে তোলে তার গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার। আওয়ামী লীগের দু'জন প্রতিনিধি ছিল তার সঙ্গে। মুজিবের দৃতরা বললেন, শেখ সাহেব চৰমপঞ্চাদের তরক থেকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছেন। তারা তাঁকে একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাদেরকে উপেক্ষা করার মত যথেষ্ট শক্তি তার নেই। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, তাঁকে সামরিক বাহিনীর হেফাজতে নিয়ে আসা হোক। জিওসি বললেন,

'আমি নিশ্চিত, কীভাবে চাপ প্রতিহত করতে হয়, মুজিবের মত একজন জনপ্রিয় নেতা তা ভালভাবেই জানেন। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। তাঁকে বলবেন, আমি সেখানেই (রমনা রেসকোর্সে) থাকবো চৰমপঞ্চাদের আক্রেশ থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য। কিন্তু এও বলে দেবেন, যদি তিনি পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তাহলে আমি সন্তুষ্য সব কিছুই জড় করবো। বিশ্বাসঘাতকদের হত্যার জন্য ট্যাংক, কামান, মেশিনগান—সবই এবং প্রয়োজন যদি হ্যাঁ ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব। শাসন করার জন্য কেউ থাকবে না কিংবা শাসিত হবার জন্যও কিছু থাকবে না।'

পরদিন (৭ মার্চ) পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদ্রুত মি. ফারল্যান্ড মুজিবের সঙ্গে দেখা করলেন। কিছুক্ষণ পর এক বাঙালি সাংবাদিক, নাম মি. রহমান, টেলিফোনে আমাকে বললেন, একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারটি অপসারিত হয়েছে। মুজিবের সঙ্গে ফারল্যান্ডের দেখা করার ব্যাপারটি নিয়ে জি ডেবলিউ চৌধুরী আরো বললেছেন। তিনি বলছেন,

৭. রবার্ট জ্যাকসন, সাউথ এশিয়ান স্টাইল ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি-পাকিস্তান-বাংলাদেশ, সাতো আব্দ উইনডোস, লতন, পৃষ্ঠা-২৯

‘রাষ্ট্রদৃত ফারল্যান্ড মুজিবের কাছে আমেরিকার নীতিমালা পরিষ্কার তুলে ধরেন। তিনি তাকে এই পরামর্শ দেন, তার বিচ্ছিন্নতাবাদী খেলায় সাহায্যের আশায় তিনি যেন ওয়াশিংটনের দিকে না তাকান।’<sup>৮</sup>

সেই চরম সন্দেহগ্রস্ত এসে গেল। মুজিবের ভাষণ দেবার কথা ছিল ২ টা ৩০ মিনিটে (স্থানীয় সময়)। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র মুজিবের ভাষণ নিজ উদ্যোগে সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। রেডিওর ঘোষকরা আগে থেকেই রেসকোর্স থেকে ইস্পাত দৃঢ় লক্ষ দর্শকের নজীরবিহীন উদ্দীপনার কথা প্রচার করতে শুরু করে।

এ ব্যাপারে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর হস্তক্ষেপ করলো এবং এই ‘বাজে’ ব্যাপারটি বন্ধ করার নির্দেশ দিল। আমি বেতার কেন্দ্রে আদেশটি জানিয়ে দিলাম। আদেশটি শেনার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের অপর প্রান্তের বাঙালি বস্তুটি তৈরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। বললেন, ‘আমরা যদি সাড়ে সাত কোটি জনগণের কষ্টকে প্রচার করতে না পারি তাহলে আমরা কাজই করবো না।’ এই কথার সাথে সাথে বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গেল।<sup>৯</sup>

যে মুজিব সকালে তার বাসভবনের ছাদে ছাত্রনেতাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুমতি দেন, তিনিই জনসভায় পতাকা উত্তোলনের ব্যাপারটি নাকচ করে দিলেন। কুওলী পাকানো টান টান উত্তেজনার মধ্যে তিনি মধ্যে আরোহণ করলেন। একটি ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ বিশাল জনসমূহের দিকে তাকালেন। মুজিব তার স্বভাবসূলভ বজ্ঞ কঠে শুরু করলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কঠস্বর নীচুগ্রামে নামিয়ে আনলেন বক্তব্যের বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। তিনি একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। কিন্তু ২৫ মার্চে অনুষ্ঠৈয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ঘোগদানের বিষয়ে চারাটি পূর্বশর্ত আরোপ করলেন। এগুলো হলো:

১. মার্শাল ল’ তুলে নেয়া
২. জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা;
৩. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া; এবং
৪. বাংলাল হত্যার কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা।

বক্তৃতার শেষ দিকে তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দিলেন। যে জনতা সাগরের ঢেউয়ের মত প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে রেসকোর্সে ভেঙ্গে পড়েছিলো—ভাটার টান ধরা জোয়ারের মত তারা ঘরে ফিরে চললো। তাদেরকে মসজিদ কিংবা গির্জায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সমাবেশ থেকে ফিরে আসা জনতার ঢেলের মতই দেখাচ্ছিল। এবং ফিরে আসছে তারা সন্তুষ্টিতে—ধর্মীয় পদেশামৃত শুনে। তাদের ভেতরকার সেই ক্রোধ যেন থিতিয়ে গেছে, যাকে প্ররোচিত করা যেতো ক্যাটসমেন্ট আক্রমণে। আমাদের অনেকেরই আশংকা ছিল এ রকমই। এই বক্তৃতা সামরিক আইন সদর দফতরে স্থিত বাতাস বইয়ে দিল। সদর দফতর থেকে টেলিফোনে কথোপকথনকালে একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তৃকর্তা জানান যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেছেন, ‘এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।’

এখন তো তাৎক্ষণিকভাবে সংকট উত্তরণ সম্ভব হলো। কিন্তু মুজিবের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে

৮. জি ডবলিউ কৌরুরী দি লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, পৃষ্ঠা-১২০  
৯. মুজিবের ভাষণের টেপ প্রচারের অনুমতি দেয়া হলে পরদিন আবার বেতার কেন্দ্র চালু হয়।

কোন কোন বিষয়গুলো প্রভাব ফেলেছিলো, তা নির্ধারণের চেষ্টায় বসে গেলেন বিশেষজ্ঞরা। তারা তিনটি কারণ তালিকাভুক্ত করলেন। হতে পারে প্রেসিডেন্ট যে জলপাই শাখা উঠিয়ে ধরেছিলেন, সেটাকে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন। হতে পারে ফারল্যাডের সফর ভারসাম্য রক্ষা করেছে। এও হতে পারে, জিওসি যে হুমকি দিয়েছিলেন সেটা হয়তো কৌশলে পরিণত হয়ে গেছে। হতে পারে, তিনটেরই প্রভাব একসঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু কেউই একে পাকিস্তানের প্রতি মুজিবের নিখাদ ভালবাসা হিসেবে দেখতে চাইলো না।

বড় শাস্তি হবার পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান তুটা ৪০ মিনিটে ঢাকায় এলেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুব, মেজর জেনারেল খাদিম রাজা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমিও সেখানে ছিলাম। জেনারেল টিক্কার পরাণে ছিল নীল স্যুট। প্লেন থেকে যখন নামলেন মনে হল, প্রাণবন্ত উচ্ছল এবং আস্থাবান। তার সামনে প্রায় ভেঙ্গে পড়া, ক্লস্ট ও অবসন্ন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুবকে একদম খাপছাড়া মনে হচ্ছিল। তিনি খাকি ইউনিফর্ম পরে ছিলেন। মনে হল, আন্দোলিত পাজামার ঝাপটা তার মানসিক আক্ষেপকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। দু'জনকে একদমই আলাদা দেখাচ্ছিল এবং ভূমিকাও ছিল ভিন্নতর। গাড়ির বহর টারম্যাক ছেড়ে আসতেই বসন্ত-সূর্যের শেষ রশ্মি ছড়িয়ে পড়লো কালো মার্সিডিসের ঝকমকে ছাদের ওপর। রাত্রি দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলো।

মেজর জেনারেল খাদিম হোসনে রাজা জেনারেল টিক্কা খানের গাড়িতে ছিলেন। পথে জেনারেল টিক্কা খাদিমকে বললেন, ‘এখানে কি গোলমাল পাকিয়েছো তোমরা? জিওসি-কে রাজনৈতিক এবং আবহগত বেশ কয়েকটা বড় মোকাবেলা করতে হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই তিনি উৎসাহব্যঙ্গক বাক্য আশা করেছিলেন। এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে থ বনে গেলেন। বাট করে সিটের এক কোণায় সরে গিয়ে বললেন, ‘মনে রাখবেন স্যার, আমরা এখানে নরকের মধ্যে দিন যাপন করছি। এটাই কি আপনার পুরক্ষার? যতক্ষণ আপনি নিজে পরিস্থিতিকে না দেখছেন, দয়া করে তার আগে কোন মন্তব্য করবেন না।’ জেনারেল টিক্কা চুপ হয়ে গেলেন। প্রথম দিনেই উভয়ের মধ্যে যে ফারাক সৃষ্টি হল তা পূরণ হতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

একই দিন সন্ধ্যায় জেনারেল টিক্কাকে সরকারিভাবে পরিস্থিতি অবহিত করা হলো। ব্রিফিংয়ের সময় আমাকে লাগোয়া কক্ষে থাকতে বলা হয়। যাতে আমাকে পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ আমাকে ডাকতে আসেন। ৭টা ৩০ মিনিটে জেনারেল ইয়াকুব ব্রিফিং শেষ করে কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। এবং তার স্নেহভরা হাত আমার কাঁধে রেখে বললেন ‘নাহি খেল আরেঁ দাগ বাকুছে খুন্দো কে আতি হে অওর দোঁ জবা আঁতে আঁতে।’ (প্রথম দৃষ্টিতে কেউই সমস্যার পুরোপুরি তাংপর্য অনুধাবন করতে পারে না।)

রাত আটটায় রাওয়ালপিণ্ডিকে জানানো হলো যে, জেনারেল টিক্কা দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। এবার তিনি মন্তকে তিনটে টুপি ধারণ করলেন: গভর্নর, সামরিক আইন প্রশাসক ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার। তিনি তার সৈনিকসূলভ গুণাবলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির প্রেরণা জোগালেন। আমরা জেনারেল ইয়াকুবকে শ্রদ্ধা করতাম একজন ভাষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে। কিন্তু আমরা জানতাম, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংকট সৃষ্টি এবং

এর সাথে নির্যাতন চালাবার নীতির কাছে তিনি মাথা নত করতে পারেননি বলেই তাকে সরিয়ে দেয়া হল ।

মুজিবুর রহমান তখনও প্রদেশে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন । আর জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ নেবার জন্য কোন বিচারপতি খুঁজে পেলেন না । 'অসুস্থ শরীরের কারণে' পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যি. জাস্টিস সিদ্দিকী শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনায় অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করলেন । মূলত তিনি প্রদেশের ডিফ্যান্সে শাসক আওয়ামী লীগকে ক্ষুঁক করতে চাইলেন না । কয়েকদিন পর ঢাকা বার এসোসিয়েশন এক প্রস্তাব পাস করিয়ে যি. সিদ্দিকীকে তার এই সাহসিকতার জন্য অভিনন্দন জানালো ।

ঢাকার সামরিক আইন অফিসারবা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করলো । কিন্তু আইনগত দিক থেকে,—যে আইন প্রেসিডেন্ট প্রণীত । তাতে বলা আছে, সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রধান বিচারপতি শপথ অনুষ্ঠান পরিচালিত করবেন । এই আইন যতক্ষণ সংশাধিত না হচ্ছে ততক্ষণ তার কোন মনোনীত ব্যক্তি কিংবা সুযোগ কোর্টের স্থানীয় কোন বিচারপতি শপথ অনুষ্ঠান পরিচালিত করতে পারবেন না । শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য জেনারেল টিক্কা নিজে চিফ সেক্রেটারি শফিউল আজমকে টেলিফোন করলেন । তিনি নানা অভিহাত দেখিয়ে অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করলেন । এইভাবে তিনি চিফ সেক্রেটারির চাকরি না হারিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে চললেন ।

ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ তার শাসনকে সংহত করার জন্য একের পর এক নির্দেশ (মোট সংখ্যা ৩১) জারি করে চললো । এইসব নির্দেশাবলি সমাজের সর্বস্তরে তথা সরকারের সব বিভাগ, কলকারখানা, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাকি সব প্রতিষ্ঠানই মেনে চললো । এমনকী সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন রেডিও এবং টিভিও মুজিবের আদেশ অনুসারে চলতে থাকে । মুজিবের শাসন সারা প্রদেশকে গ্রাস করলো । ব্যতিক্রম ছিল সেনানিবাসের সাতটি পকেট, যেখানে অফিসার ও সৈন্যরা দিবস রজনী পার করছিলো নিরাকৃত দুর্দশার মধ্যে । ক্রোধ তাদের আবেগকে গিলে ফেলেছিল ঠিকই । কিন্তু নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি তারা দৃঢ়ভাবে সেঁটে ছিল । প্ররোচনা সৃষ্টির জন্য মুজিব কোন চেষ্টারই বাদ রাখলেন না । তিনি সেনাবাহিনীকে রেল ও সড়কে প্রবেশ করতে না দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন । স্থানীয় ঠিকাদাররা সরবরাহ বক্ষ করে দিল । ফলে খাদের জন্য অফিসার ও জোয়ানরা মজুদ শুকনো রেশনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । তবু তারা আদেশ মেনে চললো ।

এদের অনেকেই তখনো পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর (ইপিআর) সঙ্গে মিলে গুরুত্বপূর্ণ ভবন, যেমন ব্যাংক, রেডিও, টেলিভিশন কেন্দ্র, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রহরায় অংশ নিছিল । জনতা কর্তব্যরত ওইসব জোয়ানদের প্রায়শই ব্যঙ্গ-বিক্রম করতো । গালিগালাজ করতো । পথে যাতায়াতকালে বাধা সৃষ্টি করতো । এক সময় এই ধরনের আচরণ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সংস্থার সঙ্গে জনতার সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তোলে । ফলাফল: দুপক্ষেই হতাহত হয় । সরকারি পক্ষে কয়েকজন জনতার দিকে বেশি ।

৭ মার্চ সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে সংগ্রহের হতাহতের কথা স্বীকার করা হলো ।

১৭২ জন নিহত ও ৩৫৮ জন আহত। তথ্য বিবরণীতে আরো বলা হলো ‘এর ভেতর নিজেদের মধ্যে দাপ্তার চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, ফিরোজবাগ কলোনি ও ওয়ারলেস কলোনিতে মারা গেছে ৭৮ জন এবং আহত হয়েছে ২০৫ জন। সেনাবাহিনীর নিহত হয় ৫ জন, আহত ১ অন্যদিকে ইপিআর-এর বুলেটে মারা গেছে দু’জন। খুলনায় ৩ ও ৪ মার্চে স্থানীয় ও অঙ্গনীয় দাঙ্গা দমনকালে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ৪১ জন। স্থানীয় গোলযোগ প্রশমনে পুলিশের বুলেটবিদ্ধ হয়ে রংপুরে গুলিতে মারা গেছে ৩ জন এবং জখম হয়েছে ১১ জন। একটি ট্রেন লাইনচুট্যত করাকালে ৪ মার্চ খুলনাতে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ৪ জন এবং আহত হয়েছে ১ জন। ৩৪১ জন আসামি ও বিচারাধীন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৬ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানা ভেঙ্গে পালাবার চেষ্টা করেছিল। ফলে পুলিশকে গুলি করতে হয়। এত প্রাণ হারায় ৭ জন এবং আহত হয় ৩০ জন। একদল সহিংস জনতা ৩ ও ৪ মার্চে যশোর, খুলনা ও রাজশাহীর টেলিফোন কেন্দ্রে হামলা চালায়। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলির প্রহরায় ছিলো। তারা জনতার ওপর গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়। এতে ৮ জন প্রাণ হারায় এবং ১৯ জন আহত হয়। ৫ মার্চ সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যশোর থেকে খুলনা যাচ্ছিল। পথিমধ্যে জনতা তাদের ওপর হামলা চালায়। তাদেরকে গুলি ছুঁড়তে হয়। এতে ৩ ব্যক্তি মারা যায় এবং কয়েকজন আহত হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তাদের দায়িত্ব পালনকালে হতাহতের শিকার হয়। মারা যায় একজন অফিসার ও আহত হয় একজন। ২-৩ মার্চ রাতে নওয়াবপুর-তাঁতীবাজার ঘটনায় ইপিআর-এর গুলিতে মারা গেছে ৬ জন এবং আহত হয় ৫৩ জন। আত্মরক্ষার জন্য একজন ইপিআর সদস্য গুলি ছোঁড়ে তাতে নিহত হয় চারজন এবং আহত হয় তিনজন। প্রদেশব্যাপী সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃতের সংখ্যা ২৩ এবং আহত ২৬। এর ভেতর ২-৩ মার্চ রাতে যখন সদরঘাটে (ঢাকা) সেনাবাহিনীর ওপর জনতা হামলা করে তখন গুলি চালানো হয় এবং ৬ জন প্রাণ হারায়। সহিংস জনতা ৩ মার্চ স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্রে চড়াও হলে সেনাবাহিনীর গুলিতে একজন মারা যায়।<sup>১০</sup>

বাঙালিরা হতাহতের এই সংখ্যা বিশ্বাস করলো না। তারা ভাবলো তথ্যবিবরণী আসল ঘটনাকে কম করে দেখানো হয়েছে। বরং তারা খবরের কাগজের শোর তোলা হেড লাইনকে বিশ্বাস করলো। তাতে বলা হলো, ‘কয়েকশত বুলেটবিদ্ধ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে,’ ‘সেনাবাহিনীর গুলিতে হাজার হাজার লোক নিহত.’ ‘নিরপরাধ নারী ও শিশুরাও হামলার শিকার’ ইত্যাদি।

তথ্য বিবরণী ও সংবাদপত্র যা রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হলো তা হলো, আবাঙালিদের (বেসামরিক পশ্চিম পাকিস্তানিসহ) দৃঃসহ যাতনা, যারা আওয়ামী লীগ সত্ত্বাসীদের হাতে সর্বক্ষণ যাতনার শিকার ছিল। কর্তৃপক্ষকে এই পরামর্শ দেয়া হয় যে, আওয়ামী লীগের এই ডিফ্যান্ট শাসনামলে তাদের নৃশংসতার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ একে অগ্রহ্য করেন। তারা এ ব্যাপারে দুটো কারণ দর্শন। প্রথমত, বলেন, এই প্রস্তাবের পক্ষে গেল দ্বিজাতিতত্ত্বকে (মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে) ‘অস্বীকার’ করা হয়। দ্বিতীয়ত, এটা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পারে, যেখানে এক বিরাট সংঘর্ষক বাঙালি শাস্তিতে বসবাস করছে।

১০. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ৮ মার্চ, ১৯৭১

বিষয়টি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকদের দফতরে পাঠানো হলো। পরামর্শ দেয়া হল, যদি নৃশংসতার কাহিনী দেরিতে প্রকাশ করা হয় তাহলে এটাকে পশ্চাত চিন্তা হিসেবে ধরে নেয়া হতে পারে। এই ফুটন্ট রক্তের ব্যারেলের ঢাকনি জোরে চেপে প্রেসিডেন্ট এখানে রাওয়ালপিণ্ডিতে কালক্ষেপন করছেন। তিনি কী পরিস্থিতির আরো অবনতির জন্য অপেক্ষা করছেন—যেখানে এলে তার সফরও আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আরোহণের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করবে না?

মুজিব ইতিমধ্যে তার সশন্ত সংগঠন তৈরি করে ফেললেন। যদি প্রেসিডেন্ট বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনে অস্থীকার করেন তাহলে তিনি শক্তি প্রদর্শনে নামবেন। কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম এ জি ওসমানী কার্যত মুজিবের কমান্ডার-ইন-চিফ হলেন। তার প্রাইভেট বাহিনী গড়ে উঠলো আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে। সরকারি অঙ্গাগারে প্রহরাবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকা এবং বন্দুকের দোকান থেকে লুট করে আনা অন্ত দিয়ে তাদেরকে সজ্জিত করা হলো। আনসারদের সমস্ত রাইফেল ছিল প্রাদেশিক সরকারের অধীনে।

এসব রাইফেল তাদেরকে দেওয়া হলো। ঘূর্ণিঝড়োভর বিদেশী ত্রাণ সামগ্ৰীৰ সঙ্গে গোপনে বিদেশী অস্ত্রের চালান প্রধানত ভাৱতীয় অন্তৰ দেশীয় অন্তৰভাগারকে ভাৱি করে তুললো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীৰা তাদের ল্যাবৱেটোৱিতে কাঁচা বোমা তৈরি কৱলো। তারা রোড ব্লক সৃষ্টি ও ব্যারিকেড তৈরিৰ মহড়া দিল। রাজনীতিৰ সাথে সক্রিয়ভাৱে জড়িত ছিলেন না, এমন একজন পুৱনো আওয়ামী লিগার মুজিবকে সতৰ্ক করে দিয়ে বলেন, ‘এভাৱে আপনি একটি পেশাদার সেনাবাহিনীৰ সাথে লড়তে পারবেন না।’ জবাবে তিন বলেন, ‘সেনাবাহিনীৰ শক্তি আমৰা জানা আছে। এৱা ঢাকায় কাৰ্য্য জাৰি কৰেও ধৰে রাখতে পাৱলো না। যদিও সেকেলে অন্তে সজ্জিত—তবু, এই সাড়ে সাত কোটি মানুষ যদি উঠে দাঁড়ায় তাহলে এৱা কী অৰ্জন কৰবে?’

মুজিবেৰ নির্দেশে কর্নেল ওসমানী বাঙালি পুলিশ, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নেৰ সঙ্গে যোগাযোগ কৱেন বিশেষ তাৰিখ এবং বিশেষ সময়েৰ মধ্যে এদেৱ কাজেৰ সমন্বয় সাধনেৰ জন্যে। আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডেৰ সামৰিক বিভাগ নিয়মিত বৈঠকে কৱে চললো। সামৰিক বাহিনীতে কৰ্মৱত কয়েকজন বাঙালি অফিসারও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতো।<sup>11</sup> অবস্থার এই দিক পৰিবৰ্তন সম্পর্কে কৰ্তৃপক্ষকে অবহিত কৱা হলো। কিন্তু তারা ব্যবস্থা গ্ৰহণে অস্থীকৃত হলেন। যখন আমি একজন সিনিয়ৱ অফিসারকে বললাম যে, বাঙালি সৈন্যৰা বিশ্বাসযোগ্যতা কৱতে পাৱে তখন তিনি তীক্ষ্ণ কঢ়ে বলেন, ‘আৱ মুখ খুলবে না। তুমি সেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীৰ শৃংখলাৰ দুৰ্নাম কৱছো—যে বাহিনী বিশ্বেৰ সেৱা।’

১১. পৱে জিজাসাবাদকালে কয়েকজন সামৰিক অফিসার শীকাৰ কৱেন যে, তারা আওয়ামী লীগেৰ সামৰিক প্ৰত্তিৰ সাথে যুক্ত ছিলেন। এৱা হলেন, বিশ্বেতিয়াৰ মজুমদাৰ, কমান্ডান্ট, ইস্ট বেঙ্গল সেন্টাৱ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসুদুল হাসান, কমান্ডিং অফিসার এডভেল মেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াসিন, গৰ্ভৰেৱ ইল্পেকশন টিম। অন্যান্য যারা প্ৰেতৰ এডভেল সক্ষম হন এবং সগৰ্ভে ও উচ্চকষ্ট নিজেদেৱ জড়িত থাকাৰ কথা ঘোষণা কৱেন তারা হলেন মেজৱ (পৱে ব্ৰিগেডিয়াৱ) মুশাৱৱ, মেজৱ জলিল ও মেজৱ মদিন।

## ত্রিভূজ

আমি বেশ কয়েকজন প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধানের আগমন দেখেছি। কিন্তু ১৫ মার্চ যে পরিবেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন, তা কোন দিনই আমি ভুলবো না। বিমান বন্দরের প্রবেশের সব পথই বন্ধ করে দেয়া হয়। টার্মিনাল ভবনের ছাদের ওপর হেলিমেটারী সৈন্যের প্রহরা বসানো হলো। বিমান বন্দরে কর্মরত প্রতিটি লোকের ওপর কড়া নজরদারি চললো। পি এফ গেটের কাছে টারম্যাকে পৌছানোর একমাত্র গেটটিতে প্রহরার জন্য একদল নির্বাচিত সৈন্য বসানো হয়। প্রেসিডেন্টকে শহরের ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে পদাতিক ব্যাটালিয়নের (১৮ পাঞ্জাব) এক কোম্পানি (প্রায় একশতের কাছাকাছি) সৈন্য মেশিনগানে সজ্জিত হয়ে ট্রাকে বসে গেটের বাইরে অপেক্ষা করছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্বাচিত মাত্র কয়েকজন অফিসারকে বিমান বন্দরের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। তাদের জন্যে বিশেষ নিরাপত্তা পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাকেও একটা পাস দেওয়া হয়।

কোন ফুলের তোড়া ছিল না। ছিল না বেসামরিক উচ্চপদ্ধতি কর্মকর্তা কিংবা শহরের গণমান্য বাণিদের সারি। ছিল না সংবাদিকদের ধাকাধাকি কিংবা ফটোগ্রাফারের ফ্লাশের আলোর ঘূর্ণিক। এমন কী সরকারি ফটোগ্রাফারকেও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। এক অস্তুত ধরনের ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বিরাজ করছিল মৃতবৎ নিশ্চলতা। পি আই এ হ্যাঙ্গারের কাছে একটি ছেট কঠোল রুমের বাইরে আমরা দল বেধে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রেসিডেন্টের বিমান পৌছবার তখনও পাঁচ মিনিট বাকি। এই সময় আমাদের থেকে একশ' মিটার দূরত্বে সেনাপুরিবহনের একটি অ্যালিউট-৩ হেলিকপ্টার মাটি ছেড়ে শূন্যে ওঠা-নামা শুরু করলো। ওপরে ওঠা এবং নামার মহড়া দিচ্ছিল। এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বের প্রেসিডেন্ট হাউসে যাওয়ার জন্যে যদি প্রেসিডেন্ট শহরের বিপজ্জনক পথ পরিহার করতে চান তাহলে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওটা ব্যবহার করা হবে। যারা প্রেসিডেন্টের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খানিম রাজা, মেজর জেনারেল ফরমান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল মেজর জেনারেল এ ও মৃঠিং।

আমরা ঘড়ি দেখে পশ্চিম দিগন্তে দৃষ্টি নিবন্ধ করলাম। কিন্তু প্রেসিডেন্টের বোয়িং তখনো দৃষ্টি সীমার বাইরে। এই সময় একটা শকুন বায় দিক থেকে আবির্ভূত হলো এবং আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। 'সেই মুহূর্তে ঢাকার বাঙালি পুলিশ সুপার হাঁপাতে হাঁপাতে এসে 'খুশীর সংবাদ' পরিবেশন করলো। বললো, 'শেখ সাহেব তার অতিথিকে বিব্রত না করার জন্যে' ফার্মগেটের ব্যরিকেড সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছেন। পূর্বাঙ্গে মুজিব প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে 'বাংলাদেশের অতিথি' হিসেবে স্বাগত জানানো হবে।"

প্রেসিডেন্ট বেলা তিনটায় পৌছলেন। পিএফ-এর ক্ষোয়াড্রন লিডার কাজী অবতরণ নিয়াজি-৫

সিঁড়ি টেনে নিয়ে গেলেন বিশানের পাশে এবং তিনি বিমান থেকে নামলেন। তার ফোলা চেহারা ও সুস্থান্ত্র সতেজদীপ্ত জীবনীশক্তির পরিচয় বহন করছিলো। তিনি অমনোযোগীভাবে কথা বলছিলেন তবে তাতে আস্থা পরিষ্কৃট হয়ে ওঠে। যেসব বিমানচালক তাঁকে শ্রীলংকা ঘূরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, তাদের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ‘ওরা দারুণ সাহসী ছেলে। চমৎকার কাজ দেখিয়েছে।’ তারপর তিনি সবার সঙ্গে হাত মেলালেন, এমন কী আমার সঙ্গেও। মনে হল, তার বিবেক কিংবা মনের ওপর কোন বোৰা নেই। রুটিন অনুযায়ী সেনা ইউনিট পরিদর্শনকালে তাকে যেমন ভাবলেশ শূন্য মনে হয়, তেমনই মনে হল। প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি ঘন্টা এবং দিনের পর দিন ধরে আমরা যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে জীবন যাপন করছি সে সম্পর্কে তার ভেতর কোন সচেতনতা পরিলক্ষিত হলো না।

ইতিমধ্যে চার তারকা প্লেট লাগানো একটি গাড়ি ভিআইপি-দের সামনে এসে দাঁড়ালো। জেনারেল টিক্কা খান হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্টকে বলেন, ‘আপনি কী গাড়িতে করে যেতে চান?’ ‘তোমার কি সন্দেহ আছে তাতে?’ প্রেসিডেন্ট বললেন। ‘না তা নয়। আমি বলছিলাম, হেলিকপ্টারও তৈরি।’ ‘না, আমি সড়ক পথেই যাব।’ প্রেসিডেন্টের গাড়িতে টিক্কা খানও উঠলেন। অন্যরা তাদের অনুসরণ করলো। ১৮ পাঞ্চাব কোম্পানি প্রহরী দিয়ে এগিয়ে চললো। অয্যারলেসে প্রেসিডেন্টের যাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট হতে থাকলো.....‘তিনি নিরাপদে ফার্মগেট অতিক্রম করলেন... তিনি এখন ভিআইপি ভবনের দিকে এগোছেন....মোটর গাড়ির বহর এবার প্রেসিডেন্ট হাউসে যাবার সর্বশেষ মোড় অতিক্রম করছে... প্রেসিডেন্ট নিরাপদে তার নিবাসে পৌছে গেছেন।’ অনেকে স্বত্ত্বাস ফেললেন। একটা মন্ত বড় বাধা শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম করা গেল।

একই দিন সন্ধ্যায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান স্থানীয় সিনিয়র সামরিক অফিসারদের ডেকে পাঠালেন পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য। জেনারেলরা—টিক্কা, খাদিম, ফরমান এবং এয়ার কমোডর মাসুদও উপস্থিত ছিলেন ওই বৈঠকে। সেনাবাহিনীর নিজস্ব ধারায় ব্রিফিং শুরু হলো এবং এগিয়ে চললো নির্ধারিত মৌতিতে। যেমন, মিশনের ব্যাখ্যা, সমস্যার গুরুত্ব (আইন-শৃঙ্খলার নিরিখে) সংখ্যাগত দিক দিয়ে সেনাশক্তির প্রাপ্যতা এবং বিভিন্ন এলাকায় তাদের বাটোয়ারা ইত্যাদি বিষয়ক। সর্বশেষে আস্থাসূচক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ব্রিফিং শেষ হলো।

ব্রিফিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা ও গভীরতার সমীক্ষা প্রেসিডেন্টের সামনে তুলে ধরা হলো না। কোন সুপারিশও করা হলো না। এই বিষয়টি কেন বাদ পড়লো, তা জানতে চেয়েছিলাম একজন সিনিয়র অফিসারের কাছে। তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে কিছুই জানতে চাননি। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব উপদেশকরা রয়েছেন। তাঁদের বিশ্বেষণের ওপরই তিনি নির্ভর করছেন। ঘটনাস্থলের লোকজনের মতামতের তিনি থোড়াই কেয়ার করেন।’

ব্রিফিং শেষে প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ভাবনার কিছুই নেই। মুজিবের ব্যবস্থা কালকেই করছি আমি। তাকে আমার মনের ইচ্ছা একটুখানি জানিয়ে দেবো। শীতল চেহারা দেখাবো এবং তাকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজেও আয়ত্রণ জানাবো না। এরপর পরদিন আমি তার সাথে দেখা করবো এবং এতে তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখবো। যদি তিনি ভদ্র আচরণ না

করেন, তা হলে আমি জবাবটা জানিয়ে দেব।' একটি নিষ্ঠকতা নেমে এলো। একটি অশ্বস্তিকর মুহূর্ত। এই সময় দীর্ঘকায় ঝুঁজ দেহের পেশীবহুল এক ব্যক্তি' গর্বোভূত ক্ষণদেশ সোজা করে দাঁড়ালেন। এবং কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলেন। মাথা নেড়ে তাকে অনুমতি দেয়া হল। তিন মুখ খুললেন, 'স্যার, অবস্থা খুবই নাজুক। অপরিহার্যভাবে এটা একটি রাজনৈতিক ব্যাপার এবং রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। নইলে হাজার হাজার নিরপরাধ নারী, পুরুষ এবং শিশু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' ...ইয়াহিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন এবং অন্যরা শুনছিলেন দুরু দুরু বক্ষে। প্রেসিডেন্ট মাথা নাড়লেন। যেন চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন, এমনি স্বরে বললেন, 'মিঠাঠি, আমি জানি সেটা...আমি জানি।' মিঠাঠি বসে পড়লেন। (কয়েকদিন পর তার দায়িত্ব থেকে তাকে নীরবে অব্যাহতি দেয়া হল। পরবর্তী সময়ে তিনি শুধু নিজ মনোবলের ওপরই টিকে ছিলেন।) সভা ভেঙ্গে গেল। সেটাই ছিল ঢাকাতে ইয়াহিয়া খানের সর্বশেষ সামরিক সম্মেলন। এরপর তিনি তার রাজনৈতিক কার্যক্রমের দিকে মুখ ফেরালেন।

পরদিন প্রেসিডেন্ট হাউসে মুজিবের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। দু'জনের কারোরই কোন সাহায্যকারী ছিল না। মনে করা হল, ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্যে এটা একটি ঘরোয়া পদক্ষেপ। মুজিব যে তার হাতার ভাঁজে কিছু রেখেছেন, এ আবিষ্কার করতে ইয়াহিয়ার বেশি সময় লাগলো না। নির্বাচন পূর্বকালে তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতাবাবলিতে যেভাবে খোলাখুলি সাড়া দিয়েছিলেন, এবার সে রকম হলেন না। প্রেসিডেন্ট নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন। বিস্ময়জনক এই—তিনি স্পষ্টতই একবছর যাবৎ ঘাসের ভেতর বিচরণশীল সাপটিকে দেখতে ব্যর্থ হলেন। যদিও এ রকমই বলা হয়, নেতাদের এমনই সৃষ্টি অনুভূতিশীলসম্পন্ন হওয়া উচিত যে, ঘাসের অক্ষুর উদগমনের শব্দও তাদের শ্রতিগোচর হয়।

মূলত পূর্ববর্তী মাসের প্রথম পনের দিনেই সমর্থোত্তামূলক সমাধানের সাধারণ ভিত্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সময়টিতে মুজিব শক্ত হাতে প্রদেশটি শাসন করলেন। বেসামরিক প্রশাসন ও জনগণের ওপর তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল। তার এই ডি ফ্যাকটো নিয়ন্ত্রণের পেছনে সমর্থন জুগিয়েছিল গত নির্বাচনে জনগণের দেয়া শক্তিশালী ম্যাণ্ডেট। কেন তা হলে মুজিব শেছায় ক্ষমতা ভাগাভাগি করবেন? তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত একজন অতিথির জন্যে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে পারেন—যদি ওই অতিথিটি তার খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদনে পাল্টা সাড়া দেন।

অন্যদিকে, জেনারেল ইয়াহিয়া তখনো এই বিশ্বাসে অনড় যে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি একাধারে প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ। কেন তিনি একজন আঘাতিক নেতাকে ঝান করে দেবেন যতক্ষণ না তিনি তার কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সুবিধা লাভ করছেন? মূল বিরোধটা এখনেই। দু'জনেই ভিন্নমুখী অবস্থান থেকে কথা বলছিলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পর্কে ভাবছিলেন যে, তাকেই সুবিধা দানের জন্য বলা হচ্ছে।

১৭ মার্চ ইয়াহিয়া ও মুজিব পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সে এক কঠিন বৈঠক। আগোম রফার ক্ষেত্রে দু'পক্ষই লক্ষণীয় কোন মতামত তুলে ধরলেন না। চমৎকার

ব্রিফিং নিয়ে এসেছিলো আওয়ামী লীগের টি মি। কিন্তু প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের প্রত্যয়িত করতে পারলো না।

বৈঠক শেষ হবার পর মুজিব প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন। তার সাদা গাড়িতে কালো পতাকা উড়ছিল। গেটে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকরা তাকে থামালো। আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। কিন্তু আমার ইউনিফর্মের প্রতি মুজিব লক্ষ্য করলেন না। মনে হলো তিনি দারুণ বিকুন্ঠ। আমি তার বাম কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। চেহারা মলিন। তার দেহে কম্পন ছিল। উত্তেজনায় কাঁপছিল ঠোঁট। তিনি তিক্ত কঠে সাংবাদিকদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ দিয়ে শেষ করে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ধানমন্ডির বাসভবনে চলে গেলেন। সাংবাদিকরা তার পেছু পেছু ছুটলো। আমি হতভেরের মত শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রেসিডেন্ট হাউসের লোহার গেট-সঞ্চে বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে শুধু সাক্ষীর বেয়নেট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

ক্যান্টনমেন্টে এসে জানতে পারলাম যে, জি ও সি জেনারেল টিক্কা খানের কাছে গেছেন দিনের আলোচনার ফলাফল জানতে। জেনারেল টিক্কা খান তাকে বললেন, ‘খাদিম, তুমি যতটুকু জান—আমি ও ততটুকুই।’ কিন্তু স্যার, ‘খাদিম রাজা বললেন’ ‘স্যার ঘটনাস্থলের ব্যক্তি হিসেবে এটা আপনার অধিকার যে, ঘটনাক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকা যাতে কোন রকম অসতর্কতায় আপনি বিপক্ষে না পড়েন। ‘একই দিন সন্ধ্যায় জেনারেল টিক্কা খান জি ও সি’কে টেলিফোন করলেন। বললেন, ‘খাদিম, তুমি এগিয়ে যেতে পার।’ এর অর্থ এইভাবে ধরে নেয়া হল, সামরিক কার্যক্রম শুরু করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কাগজপত্র তৈরি করা যেতে পারে। কেননা, সেনাবাহিনী সম্ভাব্য সব ঘটনার জন্য তৈরি থাকে। কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনার অগ্রগতির ধারার ওপর নির্ভরশীল। ঢাকার সেবা কর্তৃপক্ষ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে প্রেসিডেন্টের ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করেনি। এরা তখনো রাজনৈতিক সমাধানের আশায় ছিল, যার পদক্ষেপ নেয়া হয় প্রেসিডেন্ট হাউসে। জোরের সাথে বলা যেতে পারে, প্রস্তুতি কখনো অপরিহার্যভাবে ইচ্ছাকে ইঙ্গিত করে না। যদি কেউ কখনো কোন দেশের সামরিক দলিল-দস্তাবেজ খুঁজে দেখে তাহলে সে দেখতে পাবে যে, আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে দেশের শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে। এটা একটি তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা মাত্র। কয়েকজন বিদেশী লেখক বলেছেন, ঢাকা আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করা হয় সামরিক শক্তি সংগঠন ও পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করার জন্য। আসলে এ হচ্ছে সবচেয়ে বাজে, বিদ্যেশপরায়ণ অভিযোগ এবং ভিত্তিহীন সংবাদ সূত্র প্রাপ্ত। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, মুজিবের ডি ফ্যাক্টো শাসনকালে কোন অতিরিক্ত সৈন্য পর্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আসেনি কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়নি। উপরন্তু, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারটি দশ দিনের বেশি (১৫ মার্চ ইয়াহিয়ার আগমন থেকে ২৫ মার্চের হামলা পর্যন্ত) লাগেনি। মূলত দশ ঘন্টার বেশি সময় ব্যয় হয়নি। এ কীভাবে এবং কখন প্রস্তুত ও উপস্থাপিত এবং অনুমোদিত হয়,—সেটাই আমি এখন বলবো।

মূল অপারেশনাল পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের জন্যে ১৮ মার্চ (সকালে) জি ও সি'র অফিসে মেজর জেনারেল খাদিম রাজা ও মেজর জেনারেল ফরমান বৈঠকে বসেন। তারা এই

ব্যাপারে একমত্যে পৌছেন, অপারেশন ‘রিংস’-এর (অর্থাৎ জনগণের সহযোগিতা) এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা ১ মার্চ পর্যন্ত তা যাষেষে পরিমাণে প্রদর্শিত হয়। তারা আরো একমত্যে পৌছলেন যে, অপারেশন ‘রিংস’-এর মূল লক্ষ্য (আদর্শ ধারায় সামরিক আইনের প্রয়োগ) নানা ঘটনায় তা ছাড়িয়ে গেছে। এখন যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং তা যখনই করা হোক—তার লক্ষ্য হবে, মুজিবের ডিফ্যাট্টো শাসনকে উৎখাত এবং সরকারের কর্তৃত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

ওই বৈঠকেই জেনারেল ফরমান হালকা নীল কাগজের অফিসিয়াল প্যাডের ওপর একটি সাধারণ কাঠ পেপিল দিয়ে নতুন পরিকল্পনাটি লিপিবদ্ধ করেন। আমি জেনারেল ফরমানের নির্দোষ হাতের মূল পরিকল্পনাটি দেখেছিলাম। পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশটি লেখেন জেনারেল খাদিম। তাতে প্রাপ্য সমর সম্ভারের বটন ও বিভিন্ন বিগেড ও ইউনিটের কাজ ভাগ করে দেয়া হয়েছিল।

১৬টি প্যারা সংক্ষিপ্ত পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী এই পরিকল্পনার নামকরণ করা হল অপারেশন সার্চ লাইট। ধারণা করা হল, এর কার্যকরণ প্রতিক্রিয়ায় নিয়মিত ইন্সট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নসহ সকল বাঙালি সৈন্য বিদ্রোহ করবে। সুতোঁৎ তাদের নিরস্ত্র করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মুজিব যে ‘অসহযোগ আন্দোলন’ শুরু করেছেন, সেই আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকরত অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে প্রেফতার করতে হবে। পরিকল্পনায় আরো ১৬ জন প্রখ্যাত লোকের নাম তালিকাভুক্ত করা হল। তাদের বাড়িতে হানা দেয়া এবং তাদের প্রেফতার করা হবে।

২০ মার্চ বিকেল ফ্লাগ স্টাফ হাউসে জেনারেল হামিদ ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সামনে হাতে লেখা পরিকল্পনাটি পড়া হল। দু’জনেই পরিকল্পনাটির প্রধান প্রধান আধেয় অনুমোদন করলেন। কিন্তু জেনারেল হামিদ বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রকরণের ধারাটি বাতিল করে দেন। কেননা তার মতে, ‘এই ধারাটি বিশ্বের একটি অন্যতম চমৎকার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করবে।’ তিনি অবশ্য আধা-সামরিক বাহিনী যেমন, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্রকরণের অনুমোদন করলেন। মাত্র একটি প্রশ্ন করলেন তিনি। ‘বিভিন্ন কাজের জন্য সেনা বন্টনের পর রিজার্ভ সৈন্য কী তোমাদের হাতে থাকবে?’ ‘না স্যার’ দ্রুত জবাব দিলেন জিওসি।

পরে প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনার একটি মৌল ধারা বাতিল করে দেন। নির্ধারিত তারিখে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকরত আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রেফতার করতে হবে—এই বিষয়টি তিনি মেনে নেন না। প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘রাজনৈতিক সমরোতার ওপর জনগণের আস্থাকে আমি নির্মূল করতে পারি না। গণতন্ত্রের প্রতি একজন বিশ্বাসযাতক হিসেবে আমি ইতিহাসে চিহ্নিত হতে চাই না।’ তার হ্রবহ এই কথাগুলো ওই বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি আমাকে বলেন। অবশ্য বিভিন্ন বিগেড ও ব্যাটালিয়নগুলো বন্টনকৃত কাজ ও দায়িত্ব পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রইল।

অন্যদিকে মুজিবের ডি ফ্যাট্টো কমান্ডার-ইন-চিফ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম এ জি ওসমানীও ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সৈন্যদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ

করেন—যাতে তারা মুজিবের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বেরিয়ে আসতে পারে। মেজর জেনারেল অবসারপ্রাণ্ড ডি কে পালিতের<sup>১</sup> মতে, নিম্নলিখিত কার্যক্রম কর্নেল ওসমানীর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল

ক) পূর্ব পাকিস্তান অবরোধের জন্য ঢাকা বিমান বন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দখল,

খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘাঁটি করে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ ও পুলিশ বাহিনীর ঢাকা নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, সহায়তায় থাকবে শশস্ত্র ছাত্ররা,

গ) পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিত্যাগকারী ব্যক্তিরা প্রচণ্ড আঘাত হানবে ক্যাটনমেট দখলের জন্য।

এইভাবে দু'পক্ষই অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কে প্রথম আঘাত হানবে কিংবা আঘাত হেনে কে সর্বপ্রথম ঘটনার সূত্রপাত ঘটাবে, তা জানা গেল না। মনে হল দু'পক্ষই রাজনৈতিক ধারামতে সমাধান কামনা করছিল।

১৮ মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এবং তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের আলোচনা যখন সমাধানের কাছাকাছি আনতে পারলো না, তখন নতুন অগ্রগতির সংবাদ এলো। মুজিব এই সংবাদের সত্যতাকে নিশ্চিত করলেন পরোক্ষভাবে। তিনি বললেন, যদি অগ্রগতি না-ই হতো তাহলে তিনি আলোচনা চালিয়ে যেতেন না।<sup>২</sup> জেনারেল টিক্কা খানকে এই ইতিবাচক অগ্রগতির সংবাদ জানানো হলো। এবং তার মাধ্যমে জানলেন মেজর জেনারেল খাদিম রাজা। ক্যাটনমেট নামক অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মধ্যে বসবাসকারী আমাদের মত কয়েকজনের কাছে খবরটির ছিটেফোটা এসে গেল। সম্ভবত কোন আলো তখন যা পৌছছে, তা অতিরিক্ত হয়েই আসছে সুড়ঙ্গবাসীদের কাছে। তবু, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হলাম। এবং আনন্দিতও হলাম। আমাদের কয়েকজন তাদের পরিবারবর্গকে পশ্চিম পাকিস্তান পাঠানোর পরিকল্পনা বাতিল করলো। অবশ্য আমাদের ভেতর যারা অতিমাত্রায় বাস্তববাদী, তারা পাঠিয়ে দিল।

আওয়ামী লীগের প্রস্তাববলির ওপরই ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রস্তাবগুলো ছিল—অন্তিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে কোন রকমের পরিবর্তন ছাড়াই পাঁচটি প্রদেশের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং আপাতত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় সরকার বহাল রাখা। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রস্তাব করলো যে, গোড়াতেই জাতীয় পরিষদকে দু'টি কমিটিতে ভাগ করতে হবে। দু'টি কমিটিই গঠিত হবে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এমএন এ-দের সমন্বয়ে। কমিটি দু'টি ইসলামাবাদ ও ঢাকাতে বৈঠক করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে। এরপর দু'টি রিপোর্ট নিয়ে জাতীয় পরিষদ বৈঠকে বসবে এবং দু'টির মধ্যে একটি আপস ফর্মুলা বের করে আনার চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সংশোধন করে ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত্বাসনের অধিকারকে নিশ্চিত করে সেটা জারি করা যেতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি

১. বেসরকারিভাবে ভারত সরকারের সহায়তায় ১৯৭১ সালের মুক্তের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রচারের জন্য প্রকাশ করা হয়
২. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৯ মার্চ, ১৯৭১

তাদের স্বায়ত্ত্বাসনের পরিধি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে পারবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি প্রেসিডেন্টের এক ঘোষণার মাধ্যমে জারি করতে হবে। এরমধ্যে প্রেসিডেন্ট একটি ভাল দিক দেখলেন। এই পরিকল্পনা তার অবস্থানের নড়চড় করছে না। তিনি তখনে প্রেসিডেন্ট থাকছেন এবং সহায়তার জন্যে নিজের পছন্দমত উপদেষ্টা বেছে নিতে পারছেন। এই হচ্ছে আশা ও আগ্রহগতির ভিত্তি। এনিয়েই খবরের কাগজ সংবাদ পরিবেশন করলো।

কিন্তু এই পদ্ধতি মারাত্মক পরিণতির সম্ভাবনা বহন করছিল। যদি সামরিক আইন তুলে নেয়া হয় তাহলে ইয়াহিয়া সরকার আইনগত বৈধতা হারাবে এবং প্রদেশগুলো স্বাধীন র্মাণ্ডা দাবি করার অবাধ অধিকার লাভ করবে। তবু প্রেসিডেন্ট মুজিবকে প্রতিশ্রুতি দিলেন এই বলে যে, এই পদ্ধতিতে ভূট্টো যদি কোন আপত্তি না তোলেন তাহলে তিনি এটা গ্রহণ করবেন। সুতরাং ভূট্টোকে আবার ঢাকায় আসতে বলা হল। তখনে তিনি করাচিতে ছিলেন এবং পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখছিলেন। সেখান থেকেই তিনি প্রেসিডেন্টকে টেলিফোন পাঠালেন। তাতে তিনি বলেন, যদি পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে পাশ কাটিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাহলে তা কার্যকর হবে না।<sup>১</sup> ভূট্টো ঢাকায় আসতে অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ, তিনি বললেন, ইতিমধ্যেই তিনি তার বক্তব্য প্রেসিডেন্টের কাছে পরিকারভাবে উত্থাপন করেছেন। অন্যদিকে সম্মেলন টেবিলে ভূট্টোর উপস্থিতির বিষয়টিতে মুজিবের বিরুদ্ধতা ছিল। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাতের ব্যাপারে তার ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। মুজিব যাতে তার সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত হন সে বিষয়ে ভূট্টো আশ্বাস লাভের জন্যে চাপ সৃষ্টি করলেন।

ভূট্টো যাতে ঢাকায় আসেন সেজন্য টেলিফোন ও টেলিপ্রিস্টারের মাধ্যমে যখন অনবরত চেষ্টা চলছিল সেই সময় আমি ঢাকা প্রেস ক্লাবে গেলাম। সেখানে দেখা হল মি. হোসেনের সঙ্গে। একজন সিনিয়র সাংবাদিক। মুজিবের ঘনিষ্ঠ। বললেন, ‘ভূট্টো এখন আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। যখন একবার আমরা ইয়াহিয়াকে বোঝাতে পেরেছি তখন ভূট্টোকে রাজি করানোর ব্যাপারটি তার। যদি ভূট্টো তাকে অমান্য করেন, তা হলে তার উচিত তার ওপর ঝাপিয়ে পড়া।’ তিনি পঞ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে স্পষ্টতই অজ্ঞ ছিলেন। এই ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে ইয়াহিয়া তার ‘নিজেরই’ ঘাঁটি ধ্বংস করবেন।

সেনাবাহিনীর কুৎসা গাইতে বানোয়াট কাহিনী ফেঁদে প্রকাশ করছিল যে কুখ্যাত ইংরেজী দৈনিকটি, সেই তীব্র বিদ্যে মনোভাবাপন্ন দি পিপল-এর অফিসে নামলাম ফেরার পথে। বার্তা কক্ষে আওয়ায়া লীগের তিনজন ব্যারিস্টারের সঙ্গে দেখা হয়। তারা সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও বর্তমান সংকটে তাদের মতলব সম্পর্কে আমাকে উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করা শুরু করলেন। আমার এখনও বোধ হয় সঠিক মনে আছে—তাদের একজনের নাম ছিল শাহাবুদ্দিন। তিনি বললেন, ‘যে সেনাবাহিনীকে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে নিজেদের রক্ত ঝারিয়ে, তাদের কী এখনও দেশ শাসনের অধিকার আছে?’ জবাবে বললাম, ‘না, আমি তা মনে করি না। অধিকাংশ অফিসার ও জওয়ানরা মনে করে সীমান্ত রক্ষার চেয়ে উত্তম কাজ তাদের কাছে আর কিছু হতে পারে না।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে শাসন ক্ষমতা জনগণের

৩. দি পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিণ্ডি, ১১ মার্চ, ১৯৭১

প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? আওয়ামী লীগের খসড়া শাসনতত্ত্ব কেন গ্রহণ করেছেন না?’ বললাম, ‘এটা প্রেসিডেন্ট ও রাজনীতিকদের গ্রহণের বিষয়। সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের এ ব্যাপারে বলার কিছুই নেই।’

দ্বিতীয় ব্যারিস্টারের গায়ে ছিল সাদা শার্ট চোখে পুরু লেপের কালো ফ্রেমের চশমা। তিনি তর্কে অবর্তীণ হলেন। বললেন, ‘আওয়ামী লীগের শাসনতত্ত্বকে একবার পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়ার জন্যে আমি আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি। যদি দেখেন এটা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর,— যে ভয় আপনাদের আছে,— তাহলে বাতিল করে দেবেন। আপনাদের হাতে এখনো বন্দুক রয়েছে। সঙ্গে তো আছেই জাতীয় সংহতির পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্যে যুক্তিজ্ঞাল।’ আমি যুক্তি উত্থাপন করে বললাম, ‘আমি মনে করি না একটি শাসনতত্ত্বকে গ্রহণ করা হবে কেবল পরে বাতিল করার জন্যে। শাসনতত্ত্ব একটি পবিত্র দলিল। একবার যখন গ্রহণ করা হবে তখন অবশ্যই সেটাকে রক্ষা করতে হবে।’ তিনি বিদ্রোহাত্মক ভাষায় বললেন, ‘সেই কবে থেকে সেনাবাহিনী শাসনতত্ত্বের রক্ষাকর্তা সেজে বসে আছে। এক দশকের মধ্যে দু’দুটো শাসনতত্ত্ব বাতিল করে এখন আপনি আমাদের সামনে শাসনতত্ত্বের পবিত্রতা নিয়ে বক্তৃতা ঝাড়ছেন।’

তৃতীয় ব্যারিস্টার তর্কে নামবেন নামবেন করছেন এবং ‘এই ধরনের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা’ সত্ত্বেও আমি দেরি হয়ে যাওয়ার অজুহাত তুলে বিদায় নেবার জন্যে সম্পাদকের অনুমতি চাইলাম। ভারাক্রান্ত মনে গাড়ি চালিয়ে ক্যান্টনমেন্টে এলাম। অফিসার্স মেসে উঁকি মারলাম। সেখানে কয়েকজন অফিসার বসে টেলিভিশন দেখছিলেন। প্রোগ্রামে প্রথানৃযামী আওয়ামী লীগের খাঁটি উদীও আন্দোলন প্রতিফলিত হচ্ছিল। উদীপিত তরুণ-তরুণীরা উচ্চকাষ্ঠে মুক্তি সঙ্গীত গাইছিল। তরুণ অফিসারারা আমার দিকে ফিরলো শহরের ‘সর্বশেষ সংবাদ’ শোনার জন্যে। আমি তাদেরকে ব্যারিস্টারদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। ক্যাপ্টেন চৌধুরী মন্তব্য করলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ব্যাপারটি নিয়ে ভীষণ রকমের টানা হচ্ছে করছেন। সোজা আদেশ দেয়া উচিত তার। এর জন্যে এক কোম্পানি সৈন্যই যথেষ্ট।’

ভুট্টো এবং তার মুখ্য সহচররা ২১ মার্চ পৌছলেন। বাংলাদেশে এই সফরকারীদের অভ্যর্থনা জানানো এবং তাদের দেখ-ভালের দায়িত্ব পালনকে আওয়ামী লীগ নিজের কর্তব্য ও অধিকার বলে মনে করলো। সুতরাং আওয়ামী লীগ জোরাজুরি শুরু করলো এই বলে যে, পিপিপি নেতৃত্বদের অভ্যর্থনা জানানো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব তার স্বেচ্ছাসেবকরাই গ্রহণ করবে। আওয়ামী লীগের ব্যবস্থাবলির কার্যকরিতা সম্পর্কে সেনাবাহিনীর সন্দেহ ছিল। অতএব, নিজস্ব বিকল্প ব্যবস্থা তারা তৈরি রেখেছিল। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ অতিথিদের দেখ ভালের ভাব দেয়া হলো। দ্রুত বিশৃঙ্খলা গ্রাস করলো এবং সেই বিকেলেই আওয়ামী লীগের কাছ থেকে সেনাবাহিনী দায়িত্ব নিয়ে নিল।

প্রেসিডেন্ট নিষ্ঠার সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আওয়ামী লীগের পদ্ধতির মুখ্য বিষয়গুলো ভুট্টোকে অবহিত করলেন। এবং জানালেন যে, বাস্তবায়নের জন্যে তার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া ভুট্টো নিজের ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করেছেন:

‘দুই কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে আমার সহকর্মীদের আমি জানালাম। তারা এ ব্যাপারে

৭২ নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল

তাঁদের আশংকা প্রকাশ করে পরামর্শ দিলেন যে, এই প্রস্তাব আমার গ্রহণ করা উচিত হবে না। কেননা, এর ভেতর দুই পাকিস্তানের বীজ রোপিত....আমরা আরো একমতে পৌছলাম যে, এটাকে (এই পদ্ধতি) পুরোপুরিভাবে জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হবে তাদের অনুমোদনের জন্য। দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক নেতা পুরো আইন সভার অস্তিত্বকে উপক্ষে করতে পারেন না, যার ওপর শাসনতাত্ত্বিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত।<sup>8</sup>

সুতরাং ভুট্টোর অনুমোদন আর এলো না। সেই মারাত্মক ত্রিভুজ অনড় রইল।

এইভাবে ২৩ মার্চের সূর্য উদিত হল। তারিখটি ঐতিহাসিক পাকিস্তান দিবসের স্মতিবার্ষিকীর দিন। এই দিনে, ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এই দিনটিকে ‘প্রতিরোধ দিবস’ হিসেব ঘোষণা করলো। তারা পাকিস্তানের পতাকা পোড়ালো, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি টুকরো টুকরো করে ছিলো এবং তার কৃশপুত্রিকা দাহ করলো। অন্যদিকে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালো এবং শেখ মুজিব নিজেই এর অংশী ছিলেন। সকালে তিনি তার বাড়িতে একটি ছাত্র প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান এবং তার বাড়ির ছাদে (ডি ফ্যাট্টো প্রেসিডেন্ট ভবন) বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের অনুমতি দেন। বাড়ির সামনে দিয়ে মার্চপাস্ট করে এগিয়ে যাওয়া ছাত্রদের সালাম গ্রহণ করেন।

সারা শহর ছেয়ে যায় গাঢ় মেরুন ও সোনালী রংয়ের পতাকায়। পাকিস্তানের পতাকা তখন মাত্র দুইটি স্থানে দেখা গেল। একটি গৰ্ভন্মেন্ট হাউসে ও অন্যটি সামরিক আইন সদর দফতরে। কিছু চতুর ছেলে গৰ্ভন্মেন্ট হাউসের পশ্চিম প্রবেশ দ্বারে বাংলাদেশের একটি ছোট্ট পতাকা সেঁটে দিয়েছিল। কিন্তু সংযুক্ত পাকিস্তানের প্রতীক হয়ে তখনো প্রধান ভবনের শীর্ষে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছিল। অবশ্য সেটাকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছিল।

বাঙালি যুবকরা ‘জয়বাংলা’ শ্রোগানে নগরীর রাজপথ প্রকল্পিত করে তুললো। প্রকৃতপক্ষে দিনটি তাদের স্বাধীনতা দিবস হয়ে ওঠে। কয়েকটি বিরক্তিকর বস্তু মাত্র সরাতে হবে এবং বিনা রক্তপাতে মুজিব তা করার চেষ্টা করছিলেন।

২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে এলো। আগের শাসনতাত্ত্বিক কমিটির প্রস্তাব পরিয়ট্যাগ করে শাসনতাত্ত্বিক কনভেনশনের প্রস্তাব দিল। এই কনভেশন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে পৃথক পৃথক দু'টি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। জাতীয় পরিষদ এই দু'টি শাসনতন্ত্র নিয়ে বৈঠকে বসবে। একীভূত করা হবে ‘পাকিস্তান কনফেডারেশন’, করার লক্ষ্যে। একই দিনে ভুট্টো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন দু'জনেই এই একমতে পৌছেন যে, সম্ভবত প্রথমবারের মত নয় যে, আওয়ামী লীগ তার বাজির চাল ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন থেকে পাকিস্তানের শাসনতাত্ত্বিক ভাস্তবের পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্যে তারা যে ব্যবস্থাই গ্রহণের চিন্তাবন্ধন করুন না কেন কিংবা যা-ই সিদ্ধান্ত নেন না কেন,—যোষণা করা হল যে, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি তাজউদ্দিন আহমেদ সন্ধ্যায় ঘোষণা করলেন, ‘তার দল চূড়ান্ত’ প্রস্তাব পেশ করেছে এবং এতে নতুন কিছু সংযোজন কিংবা সমরোতামূলক কিছু

8. জেড এ ভুট্টো দি হেট ট্রাইজেডি, পৃষ্ঠা-৪১

করার নেই।<sup>৫</sup>

ভুট্টোর সহচররা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টারা করাচির পথে 'ফেরা' শুরু করলেন। যেমন বৃক্ষিমান পাথীরা আসন্ন বড়ের আগেই আপন আপন নীড়ে ফিরে যায়।

সর্বশেষ প্রবণতা নির্ধারণে আওয়ামী লীগের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। কিন্তু পরে এই দলের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ব্যক্তি আমার কাছে অভিযোগ তুলে বলেন, 'আমরা এখনও আশা করছি যে, সমরোতার চেষ্টা চলছে। বৈঠক ভেঙ্গে গেছে বলে এখনও কেউ বলেননি। অথবা এমন সতর্কবাণীও কেউ উচ্চারণ করেননি যে, আমরা সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছি—যেখানে আছে শুধু মৃত্যু আর ধ্বংস?' আমি জিজেস করলাম, 'কনফেডারেশনের প্রস্তাবের পরেও আপনি কী এখনও মনে করেন আশা আছে?' জবাবে তিনি বলেন, 'এখনেই আমরা ভুল হিসেব করেছি। আমরা ভেবেছিলাম এবং সরকারের ভেতরকার সূত্র থেকে আমাদের নিষ্ঠ্যতা দেয়া হয় যে, সেনাবাহিনী নতি স্থাকার করেছে। সুতরাং আমরা চাপ দেয়া শুরু করলাম। কিন্তু পুরোপুরি ভুলে গেলাম যে, ভুট্টো ইতিমধ্যেই দৃশ্যপটে হাজির হয়ে গেছেন।'

পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা যখন পিআইএ-র ফ্লাইট ধরায় ব্যস্ত সে সময় জেনারেল ফরমান ও জেনারেল খাদিম দু'জনে দু'টি হেলিকপ্টারে ঢালেন ব্রিগেড কমান্ডারদের (ঢাকার বাইরে অবস্থানরত) সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেয়ার জন্য। (তখনে পর্যন্ত 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু প্রকাশ করা হয়নি।) তারা যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার দুররানি (যশোর) ও ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে (কুমিল্লা) পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। ফরমান ঢাকায় ফিরে এলেন। আর খাদিম কুমিল্লা থেকে গেলেন চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম ছিল প্রতারণামূলক স্থান। সেখানকার একমাত্র সিনিয়র অফিসার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা ছিল। অত্যন্ত কৌশলে জিওসি পরিস্থিতি সামলান। সবচেয়ে সিনিয়র অবাঙালি অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতিমীর কাছে গোপনে নির্দেশটি পাচার করেন এবং নির্দেশ দেন কুমিল্লা থেকে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি এসে পৌছানো পর্যন্ত আটল থাকতে। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে বোরাতে সক্ষম হলেন যে, যজদেব পুরে (ঢাকার উত্তরে) অবস্থানরত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের মধ্যে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এফ্রেন্টে তাদের শান্ত করার জন্যে 'ব্যক্ত পিতা'কে সেখানে একবার উঁকি মারার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে তার কথা বলতে হবে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার রাজি হলেন। তাকে ঢাকায় আনা হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মজুমদারের কমান্ডের সমাপ্তি ঘটলো।

একই মিশন নিয়ে অন্য দৃতা—স্বাভাবিকভবেই সিনিয়র স্টাফ অফিসাররা উড়ে গেলেন সিলেট, বংপুর ও রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে। বলা হলো, আঘাত হানার সময়টি পরে টেলিফোনে জানানো হবে। কেননা প্রেসিডেন্ট এখনও আদেশ দেননি। সরকারিভাবে তখনে আলোচনার জন্যে দ্বারা উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করে ঢাকার ৫৭ ব্রিগেড লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করলো। এ কাজে তারা বেসামরিক পোশাক ও গাড়ি ব্যবহার করলো।

৫. দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ২৫ মার্চ, ১৯৭১

২৫ মার্চ সক্রান্ত প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। ইসলামাবাদ থেকে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। যে ঘোষণা তিনি দেবেন, তা মেজর জেনারেল ফরমান আলী নিখিত এবং সে ভাষণের একটি খসড়া কপি তার হাতে তুলে দেয়া হলো। ভাষণের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো ছিল

মুজিবকে বিশ্বাসযোগ্যতাক হিসেবে কলঙ্কিত করা উচিত হবে না; বরং চরমপঞ্চামুক্তির হাতে বন্দি একজন দেশপ্রেমিক তিনি।

মুজিবকে কোন অপরাধের জন্যে গ্রেফতার করা হয়নি। তাকে রক্ষার জন্যে হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভাষণে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পরিধি সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য থাকা উচিত।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্টের ভাষণ প্রচারিত হল। সম্পূর্ণভাবে উপরোক্ত ভাষ্যকে উপেক্ষা করা হল। মুজিবের কর্মতৎপরতাকে দেশদ্রোহিতামূলক ঘোষণা করে (পাশাপাশি মুজিব কর্তৃক একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে) তিনি বললেন, ‘একে বিনা শাস্তিতে ছাড়া হবে না।’ তার এই ঘোষণা ১ মার্চ দেয়া মুজিবের বজ্র ঘোষণারই প্রতিধ্বনি করলো। তিনি ওই সময় বলেছিলেন, ‘এটাকে (জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ) বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবে না।’

প্রেসিডেন্টের ঢাকা ত্যাগের খবর গোপন রাখা হল। দশ দিন আগে তার আগমন সংবাদ যে ভাবে গোপন রাখা হয়েছিল, এবার তার চেয়েও বেশি কড়াকড়ি করা হলো গোপনীয়তা রক্ষায়। জনগণের চোখে ধূলো দেয়ার জন্যে একটি ছেট্ট নাটকের অবতারণা করা হলো। প্রেসিডেন্ট বিকেলে চা পানের জন্যে ফ্লাগ স্টাফ (ক্যান্টনমেন্ট) হাউসে ফিরে এলেন। সামনে পাইলট জিপ, পাশে রক্ষাদলের গাড়ির বহর, মাঝখানে প্রেসিডেন্টের গাড়ি—চারতারকা প্লেটসহ পতাকা লাগানো। কিন্তু গাড়িতে প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। ব্রিগেডিয়ার রফিক তার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এ প্রতারণাকে বড় রকমের সাফল্য বলে মনে করা হলো। কিন্তু মুজিবের গুপ্তচরার খেলাটা ধরে ফেললো। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ আর চৌধুরী ছিলেন ইয়াহিয়ার স্টাফদের একজন। তিনি দেখলেন প্রেসিডেন্টের মালামাল ডজ গাড়িতে করে বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুজিবুর রহমানকে জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে সাতটায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান পিএএফ গেট দিয়ে বিমান বন্দরে চুকলেন বিমানে ঢাকার জন্যে। উইং কমান্ডার খন্দকার তার অফিসে বসে এ দৃশ্যটি দেখলেন। সাথে সাথে মুজিবকে জানিয়ে দিলেন। পনের মিনিট পর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে একজন বিদেশী সাংবাদিক টেলিফোন করলেন আমাকে। জিজ্ঞেস করলেন, ‘মেজর, প্রেসিডেন্ট চলে গেছেন, খবরটি কি সত্য?’

ইতিমধ্যে রাত্রি পা পা করে এগিয়ে এলো। কিন্তু কেউই তখনো জানতো না যে, এ রাত্রির শেষটা একটি অনাময় সকাল হয়ে আর আসবে না।

## অপারেশন সার্চলাইট : এক

২৫ মার্চ মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন যখন রাজনৈতিক আলোচনার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে গভীর চিত্তামগ্ন ছিলেন, ঠিক সে সময় সকাল ১১ টায় তার সবুজ টেলিফোনটি বেজে উঠলো। অপর প্রান্তে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। তিনি বললেন, ‘খাদিম’ আজ রাতেই।’

নির্দেশটি খাদিমের মধ্যে কোনরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করলো না। তিনি হাতুড়ির আঘাত পড়বার অপেক্ষাতেই ছিলেন। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত তার ক্ষমতা গ্রহণের হিতীয় বার্ষিকীর সাথে মিশে গেল। আদেশ কার্যকর করার জন্য জেনারেল খাদিম বার্তাটি তার স্টোফদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। বার্তা যতই নীচের দিকে পৌছাতে থাকলো, উত্তেজনাও ততবেশি বৃদ্ধি পেল। আমি দেখতে পেলাম, কয়েকজন জুনিয়র অফিসার অতিরিক্ত কিছু রিকয়েলেসেস বাইফেল জড় করার জন্যে টানাটানি করছে। অতিরিক্ত গোলা বারুদ পাওয়ার জন্য অনুমতি গ্রহণ করছে। একটি বিকল মৰ্টার সরিয়ে ফেলা হল। কয়েকদিন আগে রংপুর থেকে আনা (২৯ ক্যাভালুরি) ট্যাঙ্কে রাতে ব্যবহারের জন্য ঢালকরা জং ধরা এম-২৪ কামানে তেল দিতে শুরু করেছে। ঢাকা শহরকে শব্দে প্রকম্পিত করার জন্যে এগুলোই যথেষ্ট।

১৪ শিডিশনের প্রধান স্টোফ অফিসাররা ঢাকার বাইরের গ্যারিসনগুলিকে আঘাত হানার চূড়ান্ত সময়টি টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিল। বার্তা প্রেরণের জন্য তারা একটি ব্যক্তিগত সাংকেতিক বার্তা তৈরি করেছিল। নির্দেশ হলো, সব গ্যারিসনকে এক সঙ্গেই অপারেশনে নামতে হবে। ২৬ মার্চ রাত ১টায় নিয়তি নির্দিষ্ট সময়টি নির্ধারিত হল। হিসেব করা হয়েছিল যে, ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট নিরাপদে করাচি পৌছে যাবেন।

অপারেশন সার্চলাইট<sup>১</sup> পরিকল্পনায় দু'টো সদর দফতর সৃষ্টির পরিকল্পনা আমার দৃষ্টিগোচর হল। মেজর জেনারেল ফরমানের ওপর ঢাকা নগরী ও এর উপকক্ষের দায়িত্ব দিয়ে তার অধীনে দেয়া হলো ত্রিগেডিয়ার আরবাবের অধিনায়কাত্তে ৫৭ ত্রিগেড। অন্যদিকে মেজর জেনারেল খাদিমকে দেখতে হবে সারা প্রদেশ। এছাড়া লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও তার ব্যক্তিগত স্টোফরা হিতীয় রাজধানী<sup>২</sup> সামরিক আইন সদর দফতরে রাত্রিযাপন করবেন ঢাকা নগরীর ভেতর ও বাইরে নেয়া ব্যবস্থাবলির অংগতি লক্ষ্য করার জন্য।

যদি খাদিম ও ফরমান হামলায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন সেক্ষেত্রে তাঁদের অপসারণ করে স্থান পূরণের জন্যে কয়েকদিন আগে জেনারেল ইয়াহিয়া মেজর জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ ও মিঠাটিকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক

- 
১. পুরো বিবরণ বইয়ের পরিশিষ্ট-৩ এ ছাপা হয়েছে
  ২. অধিবাস্তববাদ শৈলীর মিলনে লাল ইটের আধুনিক ভবন। এর নকশা করেন খ্যাতিমান মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল ইয়েল হ্যানন। আইউবি খাবের শাসনামলে-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। (অগ্রিমের ১৯৫৮-মার্চ ১৯৬৯) বাঙালিদেশ প্রচও অসংঘোষ নিরসনে, নৈবেদ্য হিসেবে, যে অসংঘোষ তীক্ষ্ণত পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলামাদের নতুন ফেডারেল রাজধানী নির্মাণের কারণে। হিতীয় রাজধানী দাঢ়িয়ে আছে ঢাকা বিমান বন্দরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে।

সময়েও তারা দু'জনেই অর্থাৎ জেনারেল খাদিম ও জেনারেল ফরমান জেনারেল ইয়াকুবের চিন্তাধারাকেই ধারণা করে চলছিলেন। হয়তো এখনও সেই চিন্তার ধারা বহন করে চলছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মনোভাব জ্ঞানার জন্যে জেনারেল হামিদ পৃথকভাবে খাদিম ও ফরমানের স্তৰীয় সঙ্গে কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত দুই জেনারেলই হামিদকে আশ্বাস দেন যে, তারা বিশ্বস্ততার সাথে আদেশ পালন করে যাবেন।

আমার মতো জুনিয়র অফিসারদের সংগ্রহ করে রাত দশটায় ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতরে (দ্বিতীয় রাজধানীতে) আনা হল। তারা লনে সোফা ও আরাম কেডারা টেনে এনে বসালো। রাত্তির শেষ যাম পর্যন্ত যাতে চলে, সেই পরিমাণ চা ও কফির ব্যবস্থা করার কাজে মনোনিবেশ করলো। ‘একমাত্র উপস্থিতি’ ছাড়া আমার বিশেষ কোন কাজ ছিল না। এই ‘আউট ডোর অপারেশন কক্ষের’ সামনে বেতার যন্ত্রবসানো একটি জিপ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। আকাশে তারার মেলা শহর গভীর ঘূমে নিমগ্ন। বসন্তের ঢাকার রাত যেমন মনোরম হয়, তেমনই ছিল রাতটি। একমাত্র রক্তক্ষয়ী হত্যায়জ্ঞ ছাড়া অন্য সবকিছুর জন্যই পরিবেশটি ছিল যোহনীয়।

সেনাবাহিনী ছাড়া আরেক শ্রেণীর লোক ওই রাতে তৎপর ছিল। তারা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের বেসরকারি বাহিনীর বাঙালি সৈন্য, পুলিশ, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লোকজন, ছাত্র এবং দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। তারা মুজিব, কর্নেল ওসমানী ও গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। প্রচণ্ডতম প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে তারা তৈরি হচ্ছিল। ঢাকায় তারা অসংখ্য ‘পথ প্রতিবন্ধক’ সৃষ্টি করলো, যাতে সৈন্যরা শহরের ভেতর প্রবেশ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়।

রাত ১১ টা ৩০ মিনিটে বেতার যন্ত্র সজ্জিত জিপটি প্রথমবারের মত তীক্ষ্ণ শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো। স্থানীয় কমান্ডার (ঢাকার) হামলার নির্ধারিত সময় এগিয়ে আনার জন্য অনুমতি চাইলো। কেননা ‘অন্যপক্ষ ক্ষতি করার মতো প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সবাই নিজের নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো। প্রেসিডেন্ট তখনো কলমো (শ্রীলঙ্কা) ও করাচির মাঝপথে রয়েছে। জেনারেল টিক্কা সিন্দ্বান্ত দিলেন। বললেন, ‘বিবিকে (আরবাব) বল, যতক্ষণ পারে ততক্ষণ যেন দৈর্ঘ্য ধরে চুপচাপ থাকে।’

বরাদ্দকৃত সময়ে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের ব্রিগেডকে নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করতে হবে

১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে ক্যাটনমেন্টে থাকবে। প্রয়োজন পড়লে ক্যাটনমেন্টকে রক্ষা করবে।

ভারতের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর থেকে বিমান বিধ্বংসী কাজের দায়িত্ব দিয়ে ৪৩ হালকা বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্টকে বিমান বন্দরে নিয়োগ করা হয়েছিলো, তারা বিমান বন্দর এলাকা দেখবে।

পিলখানা লাইনে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সাথে অবস্থানরত ২২ বালুচ রেজিমেন্ট আনুমানিক ৫ হাজার ইপিআর-এর সদস্যকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল

করে নেবে। ১ হাজার পুলিশকে নির্বন্ধ করবে ৩২ পাঞ্চাব।

১৮ পাঞ্চাব নওয়াবপুর এলাকা ও পুরনো শহরে যেখানে বহু হিন্দুর বাড়িকে অস্ত্রাগারে পরিণত করা হয়েছে বলে বলা হয়, সেখানে ছড়িয়ে পড়বে।

ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী এবং এর সংগঠন বিহারী জনপদ (মোহাম্মদপুর, মিরপুর) নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৮ পাঞ্চাব, ২২ বালুচ ও ৩২ পাঞ্চাবের সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশ্রিত দল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দিকে ধাবিত হবে। বিশেষ করে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের দিকে এগিয়ে যাবে। প্রাণ খবর মতে, এ দু'টি হল আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এক প্লাটুন স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ (কমান্ডো) মুজিবের বাড়িতে হামলা করবে এবং তাকে জীবন্ত পাকড়াও করবে।

প্রধানত শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এম-২৪ ট্যাংকের একটি ছেট্ট স্কোয়াড্রন আগেই রাস্তায় হাজির হবে। যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে তারা গোলাবর্ষণ করতে পারবে।

সৈন্যরা স্ব স্ব এলাকার শুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি পাহারা দেবে। প্রতিরোধ (যদি আসে) ধ্বংস করবে এবং তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে তাদের ঘ্রেফতার করবে।

লক্ষ্য এলাকায় সৈন্যদের রাত একটার আগে পৌছতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ রাস্তায় দেরি হয়ে যেতে পারে ভেবে ১১টা ৩০ মিনিটে সেনানিবাস থেকে যাত্রা শুরু করলো। যারা শহরের ভেতর আগে থেকেই ছিল, পাহারা দিচ্ছিল রেডিও এবং টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্টেট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি, তারা আঘাত হানার নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগেই অবস্থান নিয়ে নিল।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রথম সেনাদলটি ফার্মগেটে বাধার মুখে পড়লো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে এর দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। সদ্য কাটা বড় বড় গাছের গুড়ি রাস্তায় আড়াআড়িভাবে ফেলে প্রথম দলের গতি থামিয়ে দেয়া হল। পুরনো গাড়ির খোল এবং অকেজো স্টিম রোলার টেনে এনে পাশের ফাঁক আটকে দেয়া হয়। ব্যারিকেডের অপরপাশে শহরের দিকে আওয়ামী লীগের কয়েকশ' কর্মী দাঁড়িয়ে 'জয়বাংলা' শ্লোগানে উচ্চকণ্ঠ ছিল। জেনারেল টিক্কার সদর দফতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের তেজেদীগু বলিষ্ঠ কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম। মুহূর্তে রাইফেলের গুলির কিছু শব্দ 'জয়বাংলা' শ্লোগানের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল। একটু পরেই একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিক্ষেপণ বাতাসে তীক্ষ্ণ শব্দ তুললো। এরপর কিছুক্ষণ ধরে গগণবিদারী শ্লোগান ও গুলির শব্দের সঙ্গে হালকা মেশিনগানের কিচিরমিচির আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসতে থাকলো। পনের মিনিট পর গোলমালের শব্দ কমে এলো এবং শ্লোগান ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় থেমে গেল। স্পষ্টতই অন্ত বিজয়ী হল। সেনাদল শহরের ভেতর এগিয়ে গেল।

এভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সামরিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এখন আঘাত হানার

নির্ধারিত মুহূর্তে (এইচ-আওয়ার) পর্যন্ত স্থির থাকার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল। নরকের দরোজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হল, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিও'র সরকারি তরঙ্গের (ওয়েভ লেন্থ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষণ কঠিন ভোসে এলো। ওই কঠের বাণী মনে হল আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন।<sup>৩</sup> ভারতীয় পরবর্ত্তী মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস'-এ ওই ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। ঘোষণায় বলা হয় 'এই-ই হয়তো আপনাদের জন্যে আমার শেষ বাণী হতে পারে। আজকে থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি—যে যেখানেই থাকুন, এবং হাতে ধার যা আছে তা-ই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ততদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে।'<sup>৪\*</sup>

আমি রেডিও'র এই ঘোষণাটি শুনিনি। শুধু শুনলাম, রকেট ল্যাঙ্কারের গোলার প্রচণ্ড শব্দ। মুজিবের বাসভবন অভিমুখী রাস্তার প্রতিবন্ধক অপসারণ করছে কমান্ডোরা রকেট গোলা বর্ষণ করে। হামলাকারী প্লাটুনের সঙ্গে ছিলেন কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড এ খানও কোম্পানি কমান্ডোর মেজের বিস্তাল।

কমান্ডোরা মুজিবের বাড়ির কাছাকাছি হলে গেটে অবস্থানরত সশস্ত্র পাহারাদারদের গুলির মুখে পড়লো তারা। পাহারাদারদের দ্রুত অকেজো করে ফেলা হলো এবং মুহূর্তে পঞ্চাশজন শক্তিশালী সৈন্য দৌড়ে চার ফুট উঁচু বাড়ির চার দেয়াল লাফিয়ে উঠোনে নামলো। স্টেনগানের ব্রাস্ট ফায়ার করে তারা তাদের উপস্থিতি জানান দিল এবং চিক্কার করে শেখ মুজিবকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালো। কিন্তু কোন সাড়া এলো না। তারপর দুপদাপ শব্দ তুলে ছড়েছড়ি করে বারান্দায় উঠলো তারা। এরপর দোতলায়। অবশ্যে মুজিবের শোবার ঘর খুঁজে বের করলো। দরোজা বাইরে থেকে তালা মারা ছিল। একটি বুলেট বুলত্ত ইস্পাত খণ্ডকে বিদীর্ণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে নীচে পড়ে গেল এবং মুজিব তৎক্ষণাত রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। গ্রেফতারের জন্যে নিজেকে সোপার্দ করলেন। মনে হল, তিনি এর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। হামলাকারী দল বাড়ির সবাইকে গ্রেফতার করলো। সেনাবাহিনীর একটি জিপে করে তাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানীতে নিয়ে আসা হলো। কয়েক মিনিট পর ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর জাফরের কঠু বেতার যত্নে ভোসে উঠলো। আমি তার কাঁপা কাঁপা কঠু স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তিনি বলছেন, 'বড় পার্যটা ঝাঁচার ভেতর...অন্যগুলো নীড়ে নেই.....ওভার।'

৩. ডেভিড লোসাক পাকিস্তান কাইসিস, লতন, পৃষ্ঠা-১৯৮-১৯

৪. বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৬

\* স্বাধীনতার ঘোষণা মুজিবের ব্রকঠে ঘোষিত হয়নি। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, এই ভাষায় বার্তা সংযোগ ইউনিভার্সিটেট নিউজ অব ইতিয়া (বা বার্তা সংযোগের ওয়েবসাইটে ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ভারতীয় পরবর্ত্তী মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বাংলাদেশ ডকুমেন্টস প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত এই ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ দেখুন এই অনুবাদকের লেখা বাঞ্ছিন হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙ্গ গ্রহে।—অনুবাদক

ବାର୍ତ୍ତା ଶୈସ ହେଲୁଥାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଦା ଶାର୍ଟ ଗାୟେ 'ବଡ୍ ପାଖିଟାକେ ଆମି ଦେଖିତେ ପେଲାମ' ନିରାପଦ ହେଫାଜତେ ମେନାବାହିନୀର ଏକଟି ଜିପେ କରେ ତାକେ କ୍ୟାଟନମେଟ୍ ନିଯେ ଯାଓଯା ହଚେ । ଏକଜନ ଜେନାରେଲ ଟିକ୍ରାର କାହେ ଜାନତେ ଚାଇଲ ଯେ, ତାକେ ତାର ସାମନେ ଆନତେ ହବେ କିନା । ତିନି ଦୃଢ଼ କହେ ବଲଲେନ, 'ଆମି ତାର ଚେହାର ଦେଖିତେ ଚାଇ ନା ।'

শনাত্করণ শেষ হওয়েই মুজিবের বাড়ির চাকরদের ছেড়ে দেয়া হল। অন্যদিকে রাতের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হলো আদমজী স্কুলে। পরদিন তাকে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীকালে মুজিবের বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে যখন জটিলতা দেখা দিল (যেমন তার মৃত্তির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ), সে সময় আমার বন্ধু মেজর বিলালের কাছে জানতে চাইলাম কেন সে উত্তেজনার মুহূর্তে মুজিবকে শেষ করে দিল না। সে বললো, ‘মুজিবকে জীবন্ত গ্রেফতারের জন্য জেনারেল মিঠাঠি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন।’

যখন মুজিব আদমজী স্কুলে বিশ্বাম নিছিলেন সে সময় ঢাকা নগরী গৃহযুদ্ধের তাওব যন্ত্রণায় দক্ষ হচ্ছিল। চার ঘন্টা ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সেই হস্তয-বিদারক দৃশ্য দেখলাম। সেই রক্তাক্ত রাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—অগ্নিশিখা আকাশকে বিন্দু করছে। একসময় অগ্নিবর্ণের শোকার্ত ধ্যাম্বুওলী ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু পর মুহূর্তেই সেটাকে ছাপিয়ে উঠলো লকলকে অগ্নিশিখা। তারকাপুঞ্জকে স্পর্শ করতে চাইছে। মনুষ্যসৃষ্ট এই অগ্নিকুণ্ডের পাশে ঢাঁদের উজ্জ্বল আলো আর তারকাপুঞ্জের রক্তিমাভা ম্লান হয়ে গেল। বিশালদেহী ধ্যাম্বুওলী ও অগ্নিশিখা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুললো। অবশ্য শহরের অন্যান্য অংশ যেমন ‘দৈনিক পিপল’-এর চতুরও এই ভয়ংকর আতসবাজি খেলার শিকারে কোন অংশে কম নিপত্তি হলো না।

ପ୍ରାୟ ରାତ ଦୁଟୀର ଦିକେ ଜିପେର ଓପର ବସାନୋ ବେତାର ସ୍ତର୍ତ୍ତି ଆମାଦେର ମନୋଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ କରିଲୋ । ଆମାକେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଏହିଗେର ଆଦେଶ ଦେଯା ହଲୋ । ବେତାର ଯତ୍ରେ ଅପର ପ୍ରାତେ ଛିଲ ଏକଜନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ । ସେ ଜାନାଲୋ, ଇକବାଲ ହଲ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ହଲ ତାକେ ପ୍ରତିରୋଧର ମୁଖୋୟୁଧି ହତେ ହେଚେ । ସେ ମୂହୂର୍ତ୍ତେ ଏକଜନ ସିନିୟର ଅଫିସାର ଆମାର ହାତ ଥେକେ ଯସ୍ତି କେଡ଼େ ନିଲେନ ଏବଂ ମାଉଥ ପିସଟା ମୁଖେର ସାମନେ ଏମେ ଚିତ୍କାର କରେ ବଲାନେ, ଲକ୍ଷ୍ୟକେ ଧ୍ଵଂସ କରତେ ତୋମାର କରକ୍ଷଣ ଲାଗଗେ ପାରେ?

চার ঘন্টা।' নমস্কৰ কী কী অন্ত আছে তোমার কাছে? রকেট লনচার  
রিকয়েললেস রাইফেলস, মৰ্টার এবং ঠিক আছে, সবগুলোই ব্যবহার কর। পুরো এলাকা  
দ'ঘন্টার মধ্যে দখলের ব্যবস্থা কর।'

বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ভোর চারটায় দখলে এলো। বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচার হয়েছে যেখানে, সেটাকে দমন করতে প্রচুর সময় নেবে। সম্ভবত আদর্শ অজ্ঞে।

শহরের বাদবাকি অংশে সৈন্যরা তাদের কাজ ভালভাবেই সম্পাদন করলো।  
রাজারবাগের পুলিশ বাহিনী এবং পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসকে নিরস্ত্র করলো।  
ত্রাস সষ্ঠির জন্যে অন্যান্য এলাকায় গোপন স্থান থেকে গুলি ছেঁড়া এবং বিস্ফোরণ ঘটানো

হয়। যেসব বাড়ি বিদ্রোহীরা আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে এবং যে সব বাড়ি অপারেশন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা ছিল (রাজনৈতিক নেতাদের ঘোষণারের জন্য), সেগুলো ছাড়া আর কোন বাড়িতে তারা প্রবেশ করে না।

২৬ মার্চের সূর্য উদিত হবার আগেই সৈন্যরা তাদের মিশন সমাপ্তির রিপোর্ট প্রদান করলো। জেনারেল টিক্কা খান ভোর পাঁচটায় সোফা ছেড়ে উঠলেন এবং নিজের অফিসে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। ভাল করে চারদিকে দেখে নিয়ে বললেন, ওহ! একটা মানুষও নেই! আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার স্ফটোক্স শুনে নিশ্চিত হবার জন্যে বাইরে দৃষ্টি ফেললাম। একটি মাত্র দলহারা কুকুর দেখতে পেলাম। পেছনের দু'পায়ের মাঝে লেজ গুটিয়ে চোরের মত শহরের দিকে যাচ্ছে।

বেলা বাড়তেই ভুট্টাকে তার হোটেল কক্ষ থেকে এনে সেনাবাহিনীর প্রহরায় বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। ভুট্টা প্রেনে ওঠার আগে গত রাতে সেনাবাহিনীর কাজের প্রশংসা করে একটি সাধারণ মন্তব্য করলেন। সশস্ত্র প্রহরীদের প্রধান বিগেড়িয়ার আরবাবকে বললেন, ‘আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।’ করাচি পৌছে তিনি এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন।

যখন ভুট্টা এই আশাবাঞ্ছক মন্তব্য করেন তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার গণকবরগুলো দেখেছিলাম। পাঁচ থেকে পনের মিটার ব্যাসার্ডের তিনটি গর্জ দেখতে পেলাম। সেগুলো সদ্য তোলা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। কোন অফিসারই মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করতে চাইলো না। ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের চারপাশ দিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। দূর থেকে মনে হয়েছিল, হামলার সময়ে দুটি ভবনই মাটির সাথে মিশে গেছে। বাহ্যিক প্রতীয়মান হলো, ইকবাল হলে মাত্র দুটি এবং জগন্নাথ হলে চারটি রকেট আঘাত হেনেছে। কক্ষগুলো বেশিরভাগই পৃড়ে কয়লায় পরিণত হয়েছে কিন্তু দেয়াল অক্ষত আছে। কয়েক ডজন অর্ধেক রাইফেল ও কিছু ছড়ানো ছিটানো কাগজ তখনো ধিকি ধিকি জুলছিল। স্ফটার পরিমাণ ছিল নিদারণ। কিন্তু জেনারেল টিক্কার সদর দফতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে ডয়াবহ দৃশ্য দেখেছিলাম, সে রকম নিদারণ নয়। তার সাথে মিশ থায় না।

বিদেশী সংবাপ্তগুলো কয়েক হাজার মানুষ হত্যার (বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়) কানুনিক গল্প ফাঁদলো। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর অফিসাররা একশ'র কথা বললো। সরকারিভাবে চাল্লিশজন নিহত হবার খবর স্থিরূপ করা হল।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বেরিয়ে আমি ঢাকা নগরীর প্রধান প্রাজপথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। নজরে এলো বিসদৃশ মত দেহগুলি পড়ে আছে ফুটপাতের ওপর কিংবা মোড়ে রাস্তার কোণে। মৃতদেহের পাহাড় নজরে এলো না। এ ধরনের অভিযোগ পরবর্তীকালে করা হয়। যা হোক, এক অদ্ভুত এবং অশুভ ভাবাবেগে আমাকে গ্রাস করলো। আমি এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলাম না। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবাবেগকে ধরেও রাখতে পারলাম না। আমি বিভিন্ন এলাকার উদ্দেশ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

পুরনো শহরে দেখলাম, তখনো রাস্তায় কিছু কিছু ব্যারিকেড আছে। পথ প্রতিবন্ধকে

কোন লোক নেই। সবাই ভয়ে আপন আপন বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। একটি রাস্তার এক কোণে একটি আশ্রয়চূড় মানুষের ছায়া দেখলাম। দ্রুত পাশের গলির মধ্যে সরে গেল। শহর ঘুরে ফিরে দেখার পর আমি ধানমন্ডিতে মুজিবের বাসভবনে গেলাম। সেটা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত, জনহীন। জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকাতে মনে হল—তন্ম তন্ম করে বাড়িতে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্টে রাখা প্রমাণ সাইজের একটি প্রতিকৃতি ছাড়া তেমন স্মরণযোগ্য কিছুই আমার চোখে পড়লো না। প্রতিকৃতির ফ্রেমটি জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। কিন্তু ভাবমূর্তি রয়েছে অবিকল।

বাসভবনের বাইরের গেটের মূল্যবান ডেকরেশন নষ্ট হয়ে গেছে। মুজিবের শাসনের সময় আওয়ামী লিগাররা বাংলাদেশের মানচিত্র ও হয়দফার প্রতীক ছয় তারা বিশিষ্ট পিতলের প্লেট সেঁটে বসিয়ে দেয়। কিন্তু এখন গেটের কালো রডগুলো আছে মাত্র। রড বসানোর গর্তগুলোও দৃষ্টিগোচর হল। যে দ্রুততার সাথে গৌরবোজ্জ্বল দীপ্তির বিকিরণ ঘটেছিল তত দ্রুততার সাথে সেটা মিলিয়ে গেল।

দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম। এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্নতর দেখলাম। শহরের হন্দয়-বিদারক ঘটনা সামরিক বাহিনীর লোকজন এবং তাদের ওপর নির্ভরশীলদের স্নায়বিক অবস্থাকে স্থাভাবিক করে তুলেছে। তাদের অনুভূতি এই রকম—দীর্ঘদিন পর বড় শান্ত এবং অবশেষে বয়ে গেছে দিগন্তকে নির্মল করে। স্বত্ত্বির সাথে গা এলিয়ে দিয়ে অফিসার্স মেসে অফিসাররা বসে গল্প করছে। কমলা লেবুর খোসা ছাড়াতে ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন, ‘বাঙালিদের ভাল করে এবং ঠিকমত নিরীয় করা হয়েছে অত্তত একটি বংশধরের জন্য তো বটেই।’ মেজের মালিক তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, ‘হ্যা, ওরা শুধু শক্তির ভাষাকেই চেনে। ওদের ইতিহাসই এ কথা বলে।’

## অপারেশন সার্ট লাইট : দুই

ঢাকাকে এক রাতেই অসাড় করে দেয়া হলেও প্রদেশের বাকি অঞ্চলের পরিস্থিতি কিছুদিনের জন্য অপরিবর্তিত রয়ে গেল। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও পাবনার পরিস্থিতি আমাদেরকে বেশ কয়েকদিন ধরে উদ্বেগের মধ্যে রাখে।

চট্টগ্রামে বাঙালি ও পঞ্চম পাকিস্তানি সৈন্য ছিল যথাক্রমে প্রায় ৫ হাজার ও ৬ শত। বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে ছিল ইস্ট বেঙ্গল সেন্টারে নবগঠিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল-এর নতুন (২,৫০০) প্রশিক্ষণপ্রাণ্ডরা। ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর উইং ও সেক্টর হেড কোয়ার্টার-এর রাইফেলসরা এবং পুলিশ বাহিনী। আমাদের সৈন্যরা ছিল মূলত ২০ বালুচ-এর। এদের অগ্রগামী অংশ পঞ্চম পাকিস্তানে চলে যায়। চট্টগ্রামে অবাঙালি সিনিয়র অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমীকে আদেশ দেয়া হল, কুমিল্লা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য না পৌছানো পর্যন্ত তিনি যেন পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে ধরে রাখেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা সব রকমের সাফল্য নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। ফেনীর কাছাকাছি শুভপূর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে কুমিল্লা থেকে আগমনকারী সেনাদলের পথ কার্যকরভাবে বন্ধ করে দেয়। চট্টগ্রাম শহর ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের প্রধান প্রধান এলাকা তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে। ২০ বালুচের এলাকা ও নৌবাহিনীর ঘাঁটিই শুধু সরকারি কর্তৃত্বাধীনে ছিল। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল-এর দ্বিতীয় ব্যক্তি মেজর জিয়াউর রহমান' ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অনুপস্থিতিতে (যাকে কয়েকদিন আগে কোশলে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল) চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা ঘোষণা' প্রচারের জন্যে প্রাপ্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেন। চট্টগ্রামে যতক্ষণ অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ ঘটানো না গেল ততক্ষণ পরিস্থিতি উল্লেখাতে প্রবাহিত করানোর ব্যাপারে কিছু করা গেল না।

জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন চট্টগ্রামগামী কুমিল্লা সেনাদলের পথ রোধের সংবাদ শুনলেন দোজখ নামিয়ে দেয়ার নির্দিষ্ট দিনের মধ্যবর্তী পেরিয়ে পনের মিনিটের মাঝায়। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে আদেশ দিলেৰ, তিনি যেন শক্রপক্ষের হাতে পুলটা ছেড়ে দেন এবং নুল্লা (গিরিখাত) অতিক্রম করে প্রথম সুযোগেই চট্টগ্রামে যাওয়ার পথ করে নেন। পরদিন সকাল দশটায় তিনি পুল দখল করেন। অতঃপর সেনাদলটি সামনে এগোতে শুরু করে। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে কৃতি কিলোমিটার দ্রে কুমিরায় আবার আক্রমণের মুখে আটকা পড়ে। এতে অহবত্তী কোম্পানির এগারজন হতাহত হয়। নিহত হয় কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার। ব্রিগেড সদর দফতর (কুমিল্লা) ও ডিভিশনাল সদর দফতরের (ঢাকা)

১. ১৯৭৫ সালের আগস্ট তিনি এক সামরিক অভ্যর্থন ঘটিয়ে মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্ছান্ত করেন। পরিণামে শেখ ও তার পরিবার হত্যার শিকার হন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন।

সঙ্গে সেনাদলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যথাযথ সংবাদের অভাবে এই সেনাদলটির ভাগ্য সম্পর্কে ঢাকা শংকিত হয়ে পড়ে সম্ভবত এদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে চট্টগ্রামের ভাগ্যে কী দাঁড়াবে? শহরটি কি বিদ্রোহীদের হাতে থেকে যাবে? চট্টগ্রাম যদি শক্রুর নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে 'আপারেশন সার্চ লাইট'-এর পরিণতি কি দাঁড়াবে?

হারিয়ে যাওয়া সেনাদলটির সঙ্গান নিজেই নেবেন বলে জিওসি সিন্কান্ড নেন। পরদিন তিনি একটি হেলিকপ্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে চট্টগ্রামে যাবেন। সেখান থেকে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রোডের ওপর দিয়ে উড়ে যাবেন। যদি ইতিমধ্যে দলটি কোন রকম অগ্রগতি সাধন করে থাকে তাদেরকে হয়তো চট্টগ্রামের বাইরেই দেখতে পাবেন। তার হেলিকপ্টারটি ২০ বালুচ-এর এলাকায় নামার জন্যে চট্টগ্রাম পাহাড়ের ওপর এসে যেই মুহূর্তে ডানা ঝাপটাতে ঝুরু করেছে তখনি স্টোকে লক্ষ্য করে বিদ্রোহীরা হালকা অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। বিদ্রোহীরা উচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল। গুলি লেগেছিল হেলিকপ্টারে। কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। নিরাপদে ভূমিতে নামলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমীর কাছ থেকে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত অবহিত হওয়ার জন্য। কর্নেল বিজয়ীর কঠে ইস্ট বেঙ্গল সেন্টার নিয়ন্ত্রণে রাখার সাফল্যের কাহিনী বর্ণনা করে বললেন, ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ৫০০ বিদ্রোহীকে তিনি বন্দি করেছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের বাকি অঞ্চল তখনো বিদ্রোহীদের দখলে রয়ে গেছে।

জিওসি তার সঙ্গান অভিযানীয় রওনা হবার উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে ওঠার জন্যে কেবল পা বাড়িয়েছেন এই সময় দেখলেন কোলে বাচ্চা নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত এক নারী দাঁড়িয়ে আছে কপ্টারের কাছেই। সে একজন পঞ্চিম পাকিস্তানি অফিসারের স্ত্রী। তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করছিল। জিওসি তাকে সঙ্গে নিলেন।

হেলিকপ্টারটি ঢালাচ্ছিলেন একজন সুযোগ্য এবং দক্ষ পাইলট—নাম মেজের লিয়াকত বোখারী। তাকে সহায়তা করছিলেন মেজের পিটার। তার জিওসিকে কুমিল্লা রোডের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু মেঘ সৃষ্টি হওয়ায় কিছু দেখতে পেলেন না তিনি। যখন তারা কুমিরার প্রায় কাছাকাছি আসেন সে সময় জিওসি নিজের হাঁটুর ওপর ছেট একটা ম্যাপ মেলে ধরে বাইরে তাকালেন এবং পাইলটকে মেঘ ভেড়ে করে নীচে নামাতে বলেন। হেলিকপ্টারটি নীচে নামতেই জিওসি জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেন সেনাদলের ঘোঁজে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলি ভূমি থেকে লাফিয়ে উঠলো। পাইলট তৎক্ষণাত হেলিকপ্টারকে ওপরে তুলে নিলেন। তথাপি হেলিকপ্টারটির মেশিনে গুলি লাগে। একটি গুলি আঘাত হানলো লেজে। অপরটি জুলানি ট্যাংকির কয়েক ইঞ্চি ওপাশে কপ্টারের পেট বিন্দু করে। এ ঘটনায় মেজের বোখারী মোটেই বিচলিত না হয়ে জিওসিকে বললেন, 'স্যার আমি কী আরেকবার চেষ্টা করবো?' 'না সোজা ঢাকায় চলো,' জিওসি বললেন। মিশন ব্যর্থ হলো। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের ঘোঁজ মিললো না।

ইতিমধ্যে জেনারেল মিঠাএ একই লক্ষ্যে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি কমান্ডো বাহিনীকে (এক্স ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন)

আকাশপথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পাঠালেন। কমাত্তো সেনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের কিংবা বিদ্রোহীদের অবস্থানের খবরাখবর সম্পর্কে কিছুই জানতো না। নিজেদের বুদ্ধিমত্তার ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়েছিল। চট্টগ্রামে রওনা হবার সময় ক্যাষ্টেন হামিদ নামের এক বাঙালি অফিসার হাজির হন। কমাত্তো সেনাদলের অধিনায়ককে তিনি বলেন, ‘আমি মারী থেকে এসেছি। চট্টগ্রামে যাচ্ছি আমার মা-বাবাকে দেখতে। আমি ওই এলাকাটি চিনি। গাইড হয়ে কী আপনাদের সাথে আমি যেতে পারি?’ তার সহায়তা গ্রহণ করা হল।

কমাত্তোদের (২৭ মার্চ) যেদিন অনুসন্ধান ও সংযোগ অপারেশনের কার্যক্রমে নামার কথা—সেন্দিনই জিওসি তার কৌশলগত সদর দফতর চট্টগ্রামে সরিয়ে নেন। এবং ২০ বালুচ-এর একটি সেনাদলকে একই লক্ষ্যে ভিন্ন পথে প্রেরণ করেন। এই তিনটি সেনাদলের সংযুক্তির ওপর অপারেশনের সাফল্য নির্ভর করছিল। ২০ বালুচ সেনারা তাদের এলাকা ত্যাগের সাথে সাথে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কমাত্তোরা বাঙালি অফিসারটিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তারা বেশিদূর এগোয়নি,—এমন পর্যায়ে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তার দুর্দিক্কার পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে দিমুখী গুলিবর্ষণের মুখোমুখি হলো। কমাত্তোরা মোট মারা গেল তেরজন। এর মধ্যে কমাত্তিৎ অফিসারসহ ছিল দু'জন তরুণ অফিসার, একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার এবং ন'জন ছিল অন্যান্য স্তরের। এই প্রচেষ্টা শুধু ব্যর্থই প্রমাণিত হলো না—ব্যয়বহুলও বটে।

কুমিল্লার ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কিছু মর্টার চেয়ে পাঠালেন। ২৭ মার্চ কুমিল্লা থেকে সেগুলো পৌছে গেল। ২৮ মার্চ ভোরে তিনি হামলার সিদ্ধান্ত নিলেন। হামলা সফল হলো। প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেললেন এবং চট্টগ্রাম যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। অবশেষে হাজি ক্যাম্পে এসে তিনি তার উপস্থিতির খবর জানালেন। হাজি ক্যাম্প চট্টগ্রাম শহরের প্রান্তে অবস্থিত। হজুয়াতীরা জাহাজে ওঠার আগে এখানে অবস্থান করেন।

হাজি ক্যাম্পের পরেই ইস্পাহানি জুট মিলস। আমাদের সেনাদল পৌছবার আগেই বিদ্রোহীরা এখানে এক রক্তের তাওবলীলা সংঘটিত করে। তারা অসহায় অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশুদের ধরে এনে ক্লাবঘরে ঢোকায় এবং কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এই ভয়াবহ বেদনাদায়ক ঘটনার অবতারণা হয় যেখানটায়—কয়েকদিন পর আমি সেখানে যাই। দেখতে পাই ফোর ও দেয়ালে তখনো রক্তের দাগ রয়েছে। মেয়েদের কাপড়-চোপড় ও বাচ্চাদের খেলনা তখনো জমাট বাধা রক্তের ডোবায় চুপসে আছে। লাগোয়া ভবনে ঢুকে দেখলাম, শুকিয়ে যাওয়া রক্তে বিছানার চাদর ও জাজিম শক্ত হয়ে আছে।

যখন এই ঘটনাটি ঘটলো তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিনটি সেনাদল পরম্পরের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিল। সংযুক্ত সাধন সংস্করণ হলো ২৯ মার্চ। এই খুশীর সংবাদটি বেতার মারফত ঢাকাকে জানানো হলো। সেখানে অপারেশন কক্ষের উদ্বিগ্ন অফিসাররা স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু ইস্পাহানি জুট মিলের কসাইখানার শিকারের জন্য সেটা অত্যন্ত দেরিই হয়ে যায়।

চট্টগ্রামের একমাত্র সাফল্য হলো জাহাজ থেকে নয় হাজার টন গোলাবারুন্দর খালাসের

ঘটনাটি। জাহাজটিকে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা মধ্য মার্চ থেকে ঘেরাও করে রেখেছিল। এই কাজ সম্পাদনের জন্যে বিশেষজ্ঞার এম এইচ আনসারী ঢাকা থেকে উড়ে যান এবং প্রাণ যাবতীয় উপকরণ জড় করেন। এক প্লাটুন পদাতিক সৈন্য, কিছু মর্টার এবং দু'টো ট্যাঙ্ক নিয়ে একটি টাঙ্ক ফোর্স গঠন করেন। নৌ-বাহিনী একটি ডেস্ট্রিয়ার ও কয়েকটি গানবোট দিয়ে সমর্থন যোগায়। চমৎকার দক্ষতা দেখিয়ে তিনি সফল হন। পরে একটি অতিরিক্ত ব্যাটালিয়নকে আকাশপথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদিও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাণ যন্ত্র উপকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করা গেল তথাপি চট্টগ্রামের মূল লড়াই তখনও শেষ হতে বাকি। সাধারণ এলাকা দখলে ধাবিত হবার আগে রেডিও ট্রামিটার, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সেন্টার সদর দফতর ও জেলা আদালত এলাকার রিজার্ভ পুলিশ লাইনকে (পুলিশ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর কর্মচারী ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের কেন্দ্র ভূমি) উচ্ছেদ করতে হবে।

জেনারেল মিঠাঠা প্রথম ব্যক্তি—যাকে বেতার কেন্দ্র অভিযুক্ত এগিয়ে যেতে হবে। ভবনটি উড়িয়ে দেবার জন্য তিনি একটি কমান্ডো বাহিনী পাঠালেন। তার সৈন্যরা নদীপথ ধরে পাহাড়ের পার্শ্বদেশ দিয়ে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগোলো। নৌকার ভেতর থাকতেই তাদের ওপর শুলিবর্ষণ শুরু হয়। তাদের ঘোলজন মারা গেল। মিঠাঠার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো এবং অত্যধিক ব্যয়বহুল প্রমাণিত হলো।

এরপর মেজর জেনারেল খাদিম লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমীর অধিনায়কত্বে ২০ বালুচ-এর একটি সেনাদল পাঠালেন। আবারও তিনি পথে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং বেতার কেন্দ্রের ধারে কাছেও যেতে পারলেন না। অবশেষে দু'টো এফ-৮৬ স্যাবর জেট ঢাকা থেকে গিয়ে আঘাত হানে। আমি কয়েকদিন পর সেখানে যাই। দেখতে পেলাম, ভবনটিকে পিল বক্স দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। তৈরি করা হয় পরিখা। পরিকল্পিতভাবে একটি পরিখার দ্বারা আরেকটিকে যুক্ত করা হয়েছে। যা হোক, ভবনটি অক্ষত ছিল।

আরেকটি প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর সদর দফতর। এর এক হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী সুদৃঢ় পরিখা তৈরি করে সেখানে অবস্থান নেয়। বেশ উচু জায়গায় ছিল তাদের অবস্থান। বাঁধ বরাবর অত্যন্ত কুশলতার সাথে তারা রচনা করে তাদের আরক্ষণ। হালকা অস্ত্র দিয়ে শুলি চালনার সুবিধার্থ বাঁধে তৈরি করা হয় ফোকর ও সংকীর্ণ ফাটল। আমাদের সৈন্যরা প্রতিকূলতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাই বিদ্রোহীদের নির্বীর্য করে দেয়ার লক্ষ্যে বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনার জন্যে তৈরি হলো। আক্রমণকারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় এক ব্যাটালিয়নের কাছাকাছি। এছাড়া একটি ডেস্ট্রিয়ার, দু'টি গানবোট, দু'টি ট্যাঙ্ক ও ভারি মর্টার ব্যাটারির সমর্থন পেল আক্রমণকারী সেনাদলটি। তিনঘন্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের দমন করা গেল। ঘটনাটি ঘটলো ৩১ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর ষষ্ঠ দিন।

রিজার্ভ পুলিশ লাইন পরবর্তী লক্ষ্যস্থল হিসেবে নির্ধারিত হলো। খবর আসে, সেখানে ২০ হাজার রাইফেল জড় করা হয়েছে এবং নানা ধরনের বিদ্রোহী সেগুলো ব্যবহার করবে।

এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করা হলো। কিন্তু প্রতিপক্ষ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্রের লোকজনদের তুলনায় অনেক কম দৃঢ়তা সম্পন্ন ছিল। ফলে দ্রুত তারা কাণ্ডাই রোডের দিকে পিছু হট্টে শুরু করে।

প্রতিরোধের এই মূল কেন্দ্রগুলোকে নিরীয় করে দেয়ার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন ব্রিগেডিয়ার আনসারী। পরে তার এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় হিলাল-ই-জুরাত<sup>১</sup> খেতাবে ভূষিত করে। এছাড়া তাকে প্রমোশন দিয়ে মেজর জেনারেল করা হয় (আগেও তিনি তার সিনিয়রকে টপকে প্রমোশন পান)।

মার্টের শেষ দিকে চট্টগ্রামের মূল অপারেশন সমাপ্ত হলো। অবশ্য অবশেষটুকু নিশ্চিহ্ন করে ফেলার কার্যক্রম চলে এপ্রিল মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত। প্রদেশের যে দু'টি শহরে বিদ্রোহীরা প্রাধান্য বিস্তার করে, সে দু'টি কুষ্টিয়া ও পাবনা। দেখা যাক, সেখানে আমাদের সৈন্যরা কেমন করেছে।

যশোর থেকে কুষ্টিয়ার দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল সংযোগস্থল। সেখানে আমাদের সৈন্যদের কোন স্থায়ী ঘাঁটি ছিল না। নরক নামিয়ে দেয়ার দিনে ২৭ বালুচ (যশোর) তার এক কোম্পানি সৈন্য সেখানে পাঠালো—‘গুরু আমাদের উপস্থিতি জানান দেয়ার জন্য।’ সঠিক নির্দেশের অভাবে কোম্পানি হালকা অঙ্গে সজ্জিত হয়ে সেখানে হাজির হয়। যথাযথ ব্রিফিংয়ের অভাবে কোম্পানিটি সঙ্গে নেয় হালকা অঙ্গ, কয়েকটি রিকয়েলেস বাইফেলস্ ও সীমিত কিছু গোলাবারুদ। তারা ভেবেছিল, স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক দায়িত্ব পালনে তারা যাচ্ছে; সংবর্ধের কথা ভাবেনি।

কোম্পানি কমান্ডার তার সৈন্যদের কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও ভিএইচএফ কেন্দ্রে প্রহরায় বসায়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রেফতারের জন্যে একটি ছোট দলও পাঠায়। কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় না, সরে গেছে ঘরবাড়িতে থেকে। প্রথম দিন (২৬ মার্চ) কোম্পানি কমান্ডার পাঁচজন বিদ্রোহীকে হত্যা করে নিজের উপস্থিতির জানান দিল। এরপর সান্ধ্য আইন জারি করা হলো এবং বেসামরিক লোকজনের কাছ থেকে অন্ত সংগ্রহের পালা শুরু হলো। শান্তিতে দুদিন কেটে গেল।

২৮ মার্চ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ভীতি বিহুল মলিন চেহারায় কোম্পানি কমান্ডার মেজর শোয়েবের সামনে এসে হাজির হল। জানালো, কুষ্টিয়া থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে সীমান্ত শহর চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহীরা জড় হয়েছে। রাতেই শহর আক্রমণ করতে পারে। তারা পাক-বাহিনীর সহযোগীদের হত্যার হ্যাকি দিয়েছে। কোম্পানি কমান্ডার সৈন্যদের কাছে ঝঁশিয়ারি সংকেত পাঠিয়ে দিল। কিন্তু কোম্পানি তেমন গুরুত্ব দিল না। এমনকি পরিষ্কা খননের ব্যাপারেও গা করলো না।

মর্টারের প্রচল গোলবর্ষণের মধ্য দিয়ে রাত ৩টা ৪৫ মিনিটে (২৯ মার্চ) হামলা শুরু হলো। কান্সনিক নিরাপত্তার জগত থেকে আমাদের সৈন্যরা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে আচড়ে পড়লো। তারা দ্রুত অনুধাবন করলো যে, আক্রমণকারীরা অন্য কেউ নয়—প্রথম ইস্ট বেঙ্গল-এর সৈন্যরা। তাদেরকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের বাইরে পাঠানো হয় ‘ড্রেনিং-এর

২. বীরত্বের জন্য পাকিস্তানের বিতীয় শ্রেষ্ঠ খেতাব

জন্য'। চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বিএসএফ) সাথে তারা মিলিত হয় (যশোরে চারজন ও সিলেটের কাছাকাছি দু'জন বিএসএফ-এর সৈন্য ধরা পড়ে)।

আগেই আমাদের সৈন্যরা পুলিশের অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। ফলে এ জায়গাটাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিদ্রোহীরা হানীয় লাল ইটের তিন তলা জজ ভবনের ছাদে উঠে পড়ে। তারা এটাকে সুবিধাজনক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করলো। সেখান থেকে তারা পুলিশ ভবনের ভেতর বৃষ্টির মত গুলীবর্ষণ করে চললো। ভোরের দিকে আমাদের পাঁচজন প্রাণ হারালো। বেলা ৯টার দিকে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো এগারো। এরপর আধঘন্টার মধ্যে আরো ন'জন মারা পড়লো। মাত্র কয়েকজন জীবিত অবস্থায় পালিয়ে এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কোম্পানি সদর দফতরে এসে উপস্থিত হয়। গোলাবাবুদের অভাব এবং যথাযথ ছত্রায়ার অভাবে এই বিপর্যয় ঘটে।

কুষ্টিয়া শহরের অন্য দু'টি অবস্থান, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও ভিএইচএফ কেন্দ্র একই সাথে সমান তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হয়। ফলে কোন অবস্থানই একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারলো না। কোম্পানি সদর দফতরে এক জায়গায় মারা পড়ে ১১ জন। অন্য জায়গায় প্রাণ হারায় ১৪ জন। আক্রমণের শুরুতেই ৬০ জনের মধ্যে ২৫ জনকে হত্যা করা হয়। সাহায্যের জন্যে উন্যুক্তের মত বার্তা পাঠানো হয় যশোর। এমন কী বিমান আক্রমণেরও অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু কুষ্টিয়াতে কিছুই পৌছলো না। দিনের শেষে যশোর থেকে শেষ বার্তাটির জবাবে জানানো হয়, সৈন্যরা এদিকে নিয়োজিত। নতুন সমাবেশ পাঠানো সম্ভব নয়। শূন্যে চালকের দৃষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করবে। সে কারণে বিমান আক্রমণ বাতিল করা হয়েছে... খোদা হাফেজ।'

মেজর শোয়েব পুনঃসংগঠনের জন্যে তার সৈন্যদের একত্র করেন। দেখেন, ১৫০ জনের মধ্যে মাত্র ৬৫ জন বেঁচে আছে। তিনি জীবিতদের নিয়ে যশোর ফিরে যাওয়ার জন্যে কুষ্টিয়া ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটা তিন টনি ট্রাক, একটা ডিজ গাড়ি ও ৬টা জিপ লাইমবন্ড করলেন। সেনাবহর রাতেই শহর ত্যাগ করলো। কোম্পানি কমান্ডার সামনের দিকের একটা জিপে উঠলেন। বড়জোর ২৫ কিলোমিটার পথ এগিয়েছে তারা। এমন সময় মেজর শোয়েবকে বহনকারী জিপসমেত গাড়িটি একটি কালভার্টে উঠতে গিয়ে ধসে খাদের ভেতর পড়ে গেল। বিদ্রোহীরা কালভার্টটি মাঝামাঝি ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং বিভাসি সৃষ্টির জন্যে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। গাড়িবহর যেই মুহূর্তে থেমে গেল সেই মুহূর্তেই রাস্তার দু'পাশ থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হলো। আমাদের সৈন্যরা লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামলো এবং পাটা জবাব দিল। কিন্তু শক্রপক্ষ বৃষ্টির মত গুলীবর্ষণ করে চললো। ৬৫ জনের মধ্যে মাত্র ৯ জন বুকে হেঁটে গ্রামের ভেতর সরে গেল। তাদের সবাই পরে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে এবং নির্ময় হ্যাতার শিকারে পরিণত হয়।

পাবনার সাথে কুষ্টিয়ার বিপর্যয়ের কাহিনীর অনেক মিল রয়েছে। এখানে রাজশাহী থেকে ২৫ পাঞ্চাব-এর একটি কোম্পানি পাঠানো হলো 'শুধু আমাদের উপস্থিতির জানান দেয়ার জন্য।' ১৩০ জন সৈন্য পাঠানো হলো পাবনায় তারা সঙ্গে তিন দিনের খাদ্য-সম্ভার ও প্রাথমিক পর্যায়ের গোলাবরুদ নিয়ে আসে। পৌছেই কোম্পানিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ

করা হয় এবং অরক্ষিত কেন্দ্র যেমন বিদ্যুৎ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের প্রহরায় বসিয়ে দেয়া হয়। তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতেও হানা দিল কিন্তু কাউকেও পাওয়া গেল না। কোম্পানি কোন প্রতিরোধ ছাড়াই তার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করলো। প্রথম ৩৬ ঘণ্টা বেশ শান্তিতে কাটলো তাদের। ২৭ মার্চ সকা঳ ৬টা। খাদের ওপাশ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। বিদ্রোহী বাহিনী গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ (১০০০), পুলিশ (৩০ জন) ও আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের (৪০ জন) সমন্বয়ে। আমাদের শক্তি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। অতএব, আমাদের অবস্থানে আঘাত না হেনে বেশ দূর থেকে গুলি করে চললো। আমাদের সৈন্যরাও পাটা গুলি চালালো। কিন্তু রসদের স্বল্পতার দরুণ মাত্রাতিক্রিক গুলি চালানোর ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হলো। প্রাথমিক এই সংঘর্ষে একজন এনসিও ও সাধারণ শ্রেণীর দু'জন সৈন্য আহত হলো।

বিদ্রোহীদের একটি হালকা মেশিনগান ক্যাপ্টেন আসগরকে অনবরত হয়রান করে চলেছিলে। তিনি সেটাকে স্তুতি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মেশিনগানের অবস্থানের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে সেটার ওপর আঘাত হানলেন। গ্রেনেডটি অবস্থানের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। একই সময় আরেকটি হালকা মেশিনগানের গুলি ক্যাপ্টেন আসগরকে বিন্দু করে। আঘাতটা ছিল গুরুতর। গেটের থামের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টায় এগোন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আক্রমণ পরিহার করা হলো। আরেকটি প্রচেষ্টা চালান লেফটেন্যান্ট রশীদ। তিনিও নিহত হলেন যুদ্ধে।

ইতিমধ্যে সব অবস্থানগুলোর ক্ষতি "সাধন করা হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি। বিদ্রোহীরা এখানেও জড় হলো। এরপর সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হলো। হালকা অস্ত্র সঙ্গিত আত্মরক্ষাকারী দল তাদের মূর্খতাকে মর্মে মর্মে উপলক্ষ্য করলো। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। এর জন্যে খুব বেশিই মূল্য দিতে হলো তাদের। তারা দু'জন অফিসার, তিনজন জুনিয়র কমিশনার্ড অফিসার এবং অন্যান্য শ্রেণীর ৮০ জনকে হারালো। এছাড়া একজন অফিসার এবং আরো ৩২ জন আহত হলো। বার বার সাহায্যের অনুরোধ জানানো হলো। অনুরোধে আহতদের উদ্ধারের জন্যে একটি হেলিকপ্টারও আসে কিন্তু মাটিতে নামতে পারলো না। রাজশাহী থেকে আসা মেজর আসলাম বহু কষ্টে ১৮ জন সৈন্যসহ একটি রিকয়েললেস রাইফেল, একটি মেশিনগান ও কিছু গোলাবারুদ নিয়ে পাবনা শহরে পৌছতে সক্ষম হন। এবং জীবিতদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। আহতদের একটি ডজ গাড়িতে ওঠালেন। সম্ভাব্য হামলা এড়াতে গ্রাম্য পথ ধরে তাদেরকে রাজশাহীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিজে পায়ে হেঁটে রাজশাহী অভিমুখে রওনা হন। পথে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গে নিলেন কিছু শক্তিশালী সৈন্য। রাস্তায় তারা প্রচও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ফলে গ্রাম্য রাস্তা ধরতে হয় এবং এপথে তাদেরকে তিন দিন খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই ঘুরে বেড়াতে হয়। ১ এপ্রিল সকাল দশটায় তারা রাজশাহী পৌছে। তখন সৈন্য ছিল মাত্র আঠারো জন। মেজর আসলামসহ বাদবাকিদের আসবার পথেই হত্যা করা হয়।

চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও পাবনায় আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হই। হতাহতও হয় সবচেয়ে

বেশি। চট্টগ্রামকে নিয়ন্ত্রণে আনা হলো ৬ এপ্রিল, কুষ্টিয়া ১৬ এপ্রিল এবং পাবনা ১০ এপ্রিল। অন্যান্য এলাকায়,—যথানে আমরা শক্তিশালী ছিলাম। সেসব জায়গা দখলে চলে আসে তেমন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই।

বিদ্রোহীরা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদেরই তাদের হিসেবের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করেনি, বেসামরিক লোকজন ও তাদের পরিবার-পরিজনদের একই ধরনের নৃশংসতায় হত্যা করে। এখানে সব ঘটনা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমি যেসব কাহিনীর বিষ্ণারে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

২ ইস্ট বেঙ্গল-এ ছড়ানো-ছিটানোভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার; জে.সি.ও এবং কিছু এন.সি.ও. (শুধু কারিগরি ক্ষেত্রে) ছিল। ঢাকা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে জয়দেবপুরের একটি পুরাতন প্রাসাদে এর সদর দফতর। সাধারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানি ইউনিটের সাথে যাতে বিপদ এড়ানো সম্ভব হয় সে জন্যে ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে ক্যাটনমেট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ইস্ট বেঙ্গল-এর তিনটি কোম্পানিকে 'ট্রেনিং-এর জন্য' গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে পাঠানো হলো। চতুর্থ কোম্পানিকে জয়দেবপুরের পুরাতন প্রাসাদে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে রেখে দেয়া হয়। এই সেই স্থান—যথানে ১৯৭০ সালে অভিনন্দন গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম।

অন্যান্য বাঙালি ইউনিটের সাথে তথ্য বিনিয়মের মাধ্যমে ব্যাটালিয়নটি ২৮ মার্চ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা তাদের আনুহগতের প্রথম প্রকাশ ঘটালো পশ্চিম পাকিস্তানি সহকর্মী ও তাদের পরিবার-পরিজনদের হত্যার মধ্যদিয়ে। এই ব্যাটালিয়নে কুড়ি বছরের ওপর কাজ করছে এই রকম একজন—নাম সুবেদার আইয়ুব,—কোন রকমে ওই পরিকল্পিত হত্যা থেকে বেঁচে ২৮ মার্চ দুপুরের দিকে ঢাকা ক্যাটনমেটে এসে হাজির হয়। সেই-ই ওই হত্যাকাণ্ডের প্রথম খবর দেয়। সে যখন সদর দফতরে এসে পৌছে তখন আমি তাকে দেখেছিলাম। ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল সে। তার শুকনো ঠোঁটের কোনে খুখু জমে সাদা হয়ে গেছে। সবাই তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল। সে এতই ভয়াৰ্ত ছিল যে, হাতে চায়ের কাপও ধরে রাখতে পারছিল না। কিংবা কোন রকম উপদেশও তার কানে প্রবেশ করছিল না। সে সাহায্যে চাইলো—তাৎক্ষণিক সাহায্য।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য পাঠানো হলো কয়েকজন তরুণ অফিসার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেনাদলের সাথে যোগ দেয়। ব্যাটালিয়ন সদর দফতরে পৌছতেই তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করলো। আর্বজনার স্তুপের ওপর পাঁচটি শিশু পড়ে আছে। সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং বেয়নেট দিয়ে পেট চিরে ফেলা হয়েছে। এই শিশুগুলোর মায়েরা আরেকটি স্তুপের ওপর পড়ে ছিল। তাদেরকে জবাই করা হয়েছে। দেহ বিকৃত করা হয়েছে। এদের ভেতর থেকে সুবেদার আইয়ুব তার পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করে। শোকে সে উন্নাদ হয়ে গেল, আক্ষরিক অর্থেই উন্নাদ।

প্রাসাদ অভ্যন্তরের প্রাঙ্গণে বেতার সরঞ্জাম সজ্জিত একটি জিপ দাঁড়িয়েছিল। টায়ার বসে গেছে। সিট রক্তে ডুবে আছে। বেতার যন্ত্রটির ওপর কয়েক ফোঁটা রক্তের ছিট লেগে

আছে। ভবনের ভেতরে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তারা দেখে, গোসলখানার ভেতর রক্তে ভেজা কাপড় পড়ে আছে। এই পোশাকটি গুজরানওয়ালার ক্যাপ্টেন রিয়াজের। পরে এটা চিহ্নিত হয়। অন্যান্য স্তরের সৈন্যদের কোয়ার্টারে গিয়ে তারা দেখতে পায়, একটি তরুণী মাতার মৃতদেহ পড়ে আছে। একটি শিশু নিজীৰ স্তন থেকে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে। আরেকটি ঘরে গিয়ে দেখে, ধৰ্মসন্তুপের ভেতর থেকে চার বছরের একটি ভয়ার্ট শিশু সৈন্যদের দেখে হাউমাউ করে উঠলো, ‘আমাকে মেরো না। আমার বাবা ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত দয়া করে আমাকে মেরো না।’ তার পিতা আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

অন্যান্য কেন্দ্র থেকে একই ধরনের কাহিনী শোনা গেল। কিছু কিছু কাহিনীতে এত বেশি অতিনাটকীয়তা ছিল যে, তা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ এগুলো সব সত্য ঘটনা।

কয়েকমাস পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর টিফ অব স্টাফ জেনারেল আবুদুর হামিদ আমাকে বলেন, ‘এই দুর্ভোগের জন্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুবই দায়ী। কেননা, ‘মার্টের গোড়ার দিকে এখানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য আনার ব্যাপারে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। সময়মত তিনি যদি সেনা শক্তি সংগঠনের সুযোগ দিতেন তাহলে প্রতিটি প্রধান শহরে এই দানবীয় হত্যাকাণ্ড রোধে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য থাকতো।’

স্মরণযোগ্য, রাজনৈতিক সমর্থোত্তা যখন নাজুক পর্যায়ে সেই সময় জেনারেল ইয়াকুব সৈন্য বিচলনে বিরোধিতা করেন। চরম পরিণতি হচ্ছে হামলা, এ ব্যাপারে জেনারেল হামিদ ইয়াকুবের কাছে যদি খোলাখুলি হতেন তাহলে আমার বিশ্বাস, জেনারেল ইয়াকুবের প্রতিক্রিয়া ভিন্নতর হতো।

এখন যেহেতু জেনারেল ইয়াকুব আর দৃশ্যপটে নেই এবং সেনা হামলা শুরু হয়েছে এর যাবতীয় হিংস্র প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে, সেহেতু সৈন্য প্রেরণে আর কোন নিমেধোজ্ঞ থাকতে পারে না। এইভাবে অপারেশন ‘ছেট ফ্লাই ইন’-ও শুরু হয়ে গেল ২৬ মার্টের (আগে নয়) প্রারম্ভ থেকে। এখানে পৌছানো যাত্র আগত সেনাদলকে দ্রুত সেইসব এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হল,—যেখানটা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল।

প্রধান প্রধান শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সাথে সাথেই প্রদেশের অন্যান্য শহরে শক্তিশালী সেনাদল পাঠানো হয়। ১ এপ্রিল ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের পথে যাত্রা করা একটি সেনাদলের কথা বলতে চাই। আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। প্রধান সেনাদলটি মেশিনগান সজ্জিত ট্রাকে করে যাচ্ছিল। অন্য দুটি কোম্পানি রাস্তা ছেড়ে ‘পাঁচশ’ মিটার দূরে দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঁটিল। কোম্পানি দুটি সম্ভাব্য সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবেলা, অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ও নিষ্ঠেজকরণের রণসাজে ছিল সজ্জিত। তাদের ক্রোধাগ্নি থেকে কিছুই রেহাই পাবে না। পদাতিক সেনাদলের পেছনে ফিল্ডগানধারী গোলন্দাজদের একটি অংশও ছিল। তারা বেশ সময় নিয়ে থেকে থেকে সামনের দিকে লক্ষ্য করে কিছু গোলাবর্ষণ করলো। ফিল্ডগানের প্রচণ্ড শব্দ এলাকার বিদ্রোহীদের জন্যে আতঙ্ক সৃষ্টিতে যথেষ্ট ছিল।

পদাতিক দল সামান্যতম অজুহাতে কিংবা সন্দেহে গুলি ছুঁড়ে চললো। গাছের পাতা নড়ার শব্দে কিংবা কোন কোন বাড়ির ভেতর থেকে আসা শব্দে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের বারস্ট ফায়ার অথবা অত্ত রাইফেলের একটি গুলি ছোড়া হলো। টাঙ্গাইল রোডের ওপর করাটিয়ার

কাছাকাছি ছোট্ট একটি জনপদ ছিল। একটি অখ্যাত জনপদ। সেখানকার ঘটনা আমার মনে আছে। অনুসন্ধানী সৈন্যরা জনপদটির মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাবার সময় সেখানকার কুড়ে ঘরগুলো ও সংলগ্ন বাঁশ ঝাড়গুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা কিছু দূর এগিয়েছে মাত্র—এই সময় আগুনের তাপে প্রচও শব্দ করে একটি বাঁশ ফাটে স্বাই এই শব্দকে লুকিয়ে থাকা ‘দুর্স্থতকারী’র রাইফেলের বলে মনে করলো। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সেনাদলটি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো জনপদটিকে লক্ষ্য করে। যাবতীয় অন্ত্র প্রয়োগ করা হলো গাছ পালার মধ্যে। বিপদের উৎসকে নিশ্চিহ্ন করার পর সতর্ক অনুসন্ধানের আদেশ দেয়া হল। অনুসন্ধানীরা জীবন্ত কিংবা মৃত কোন মানুষের চিহ্ন দেখতে পেলো না। বাঁশ ফাটার শব্দ অগ্রযাত্রাকে পনের মিনিট দেরি করিয়ে দিল।

কর্টিয়া একটি শান্ত শহর। নাম না জানা নানা বুনো গাছের ঝোপঝাড়ে ঘেরা। একসারি দোকান ঘরের একটি বাজার নিয়ে এই শহরটি গর্ব করতে পারে। লোকজন আগেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেল তারা? খুঁজে বের করা সমস্যার ব্যাপার। সেনাদল সেখানে থামলো। শহরটি ভাল করে খুঁজে দেখলো। তারপর বাজারটি জুলিয়ে দিল। কয়েকটি কেরোসিনের ড্রামে আগুন লাগানো হল। দ্রুত বাজারটি এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। আগুনের ধ্যকুণ্ডলী লকলকিয়ে সবুজ গাছ-গাছালি ছাড়িয়ে ওপরে উঠলো। সৈন্যরা তাদের কাজের ফলাফল দেখার জন্যে দেরি করলো না। সামনে এগোতে শুরু করলো। আমরা যখন শহরের অপর প্রান্তে পৌছলাম তখন খুঁটির সঙ্গে দড়িতে বাঁধা একটি কালো ভেড়া আমার চোখে পড়লো। দেখলাম, ভেড়াটি তার দন্ধীভূত বাসস্থান থেকে পালাব-তার আপাগ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কেননা, যুক্তির জন্যে টানাটানিতে তার গলায় বাঁধা দড়ির ফাঁস আরো শক্ত করে এঁটে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই শ্বাসরোধে ওটার মৃত্যু ঘটবে।

কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে ইংরেজি ‘ভি’ অক্ষর সাইজে দুটো পরিখা দেখতে পেলাম আমরা। পরিখা দুটো নতুন খোঁড়া এবং দ্রুততার সাথে পরিত্যক্ত হয়েছে। সম্ভবত বিদ্রোহীরা আমাদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিছিল। কিন্তু আমাদের কামান বন্দুকের প্রচও শব্দ শুনে তারা স্থান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনা যাই হোক, এলাকাটা পরিষ্কার না করে সামনে এগোনো গেল না। তন্ম তন্ম করে খোঁজার জন্যে যখন সৈন্যরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। আমি তখন একটি মাটির ঘরের দিকে এগোলাম। কীভাবে লোকজন জীবনযাপন করে, তা দেখার ইচ্ছায়। ঘরের ভেতর মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা কিছুটা ধূসূর বর্ণ ধারণ করে আছে। সামনের দেয়ালে দুটো শিশুর ছবি বাঁধানো। সম্ভবত দুইভাই তারা। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র বলতে ছিল একটিমাত্র খাট এবং খেজুরের পাতার তৈরি একটি মাদুর। মাদুরের ওপর পড়ে থাকা একটি থালায় কিছু ভাত পড়ে আছে। তাতে শিশুর আঙুলের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটি শিশু খেতে বসেছিল। তারা এখন কোথায়? পালিয়ে গেল কেন?

উচ্চস্থরের কথাবার্তায় আমার ইতস্তত ভাবনার সুতো হঠাৎ করে ছিঁড়ে গেল। বাক-বিনিময় হচ্ছিল। এক সৈন্য ও এক বৃন্দ বেসামরিক বাঙালির মধ্যে। বৃন্দকে সৈন্যরা কলাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে এনেছে। বৃন্দটি ‘দুর্স্থতকারী’দের

সম্পর্কে কোন খবর দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলো। অন্যদিকে সহযোগিতা না করার অপরাধে সৈন্যরা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। কী হচ্ছে দেখার জন্যে আমি এগিয়ে গেলাম। বাঙালিটি একটি জীবন্ত কংকালের শামিল। কোমরে একখণ্ড ময়লা সূতী কাপড় জড়েন। মুখে দাঢ়ি। তার চোখে আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট। আমি তার অধিউলঙ্ঘ শরীরের দিকে তাকালাম। দৃষ্টি ধীরে ধীরে পায়ের গোছায় নামিয়ে আনলাম। চোখ স্থির হলো ধুলো ভর্তি পায়ের ফোলা ফোলা শিরার ওপর গিয়ে। আমার এই অনুসন্ধিসু দৃষ্টিতে সে আমার দিকে মুখ ফেরালো এবং বললো, ‘আমি একজন গরিব মানুষ। আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করবো। কিছুক্ষণ আগেও তারা দুঃখিতো এখানে ছিল। যদি তাদের কারো সম্পর্কে কোন কিছু বলি তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়ে গেছে। এখন আপনারা আমাকে, একই ভয়াবহ পরিণতির মুখে দাঢ়ি করিয়েছেন। আমি তাদের সম্পর্কে কিছু যদি না বলি।’ সাধারণ বাঙালির উভয় সঙ্কটমূলক অবস্থার এই হচ্ছে সার সংক্ষেপ।

সেনাদল অত্যন্ত সতর্ক, ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চললো। অবশেষে সন্ধ্যায় তারা টাঙ্গাইল শহরে পৌছলো। তারা সার্কিট হাউস থেকে বাংলাদেশের পতাকা অপসারণ করে জাতীয় পতাকা ওঠালো। উপস্থিতির জানান দেয়ার জন্যে আটটি গোলা বর্ষণ করা হলো এবং রাতের মত অবস্থান নিল। আমি ঢাকায় ফিরে এলাম।

কয়েকটি বিদ্যেপরায়ণ বিশ্ব সংবাদ প্রতিষ্ঠান আগ্রহসহকারে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের যে সংবাদ ছেপেছিল তা “অপারেশন সার্চ লাইট”-এর প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘটিত হয়নি। পরবর্তী দীর্ঘ গৃহ্যন্দকালে তা সংঘটিত হয়। কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সিলেট এবং অন্য জায়গা থেকে উচ্ছেদকরণ মিশনে পদাতিক সেনাদল পাঠানো হয়। সাধারণত তারা পীচচালা পথ দিয়ে যেত। ফলে গ্রামের ভেতর বিদ্রোহীদের পালিয়ে যাবার সুযোগ থাকতো অথবা সীমান্তের দিকে সরে যেতো। অবশেষে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকদের কোলে গিয়ে পড়তো। সেনাদল ও তাদের সমরসন্তারের থাপ্যতার ওপরই অপারেশনের গতি নির্ভর করতো।

২৬ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যে অতিরিক্ত জনবল এবং সমরসন্তার এসে গেল। এই সময়ের মধ্যে দু'টি ডিভিশনাল সদর দফতর (ডিভিশন-৯ ও ডিভিশন-১৬), পাঁচটি ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার, একটি কমান্ডো ও বারাটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন পৌছে গেল। তারা তাদের ভারি অস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে আসে। কেননা, তারা আসে বিদ্রোহ দমন করতে—প্রকৃত যুদ্ধ করতে নয়। এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে এবং মে মাসের ২ তারিখে আরো তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ও দু'টি মর্টারি ব্যাটারি এসে গেল। ১০ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আধাসামরিক বাহিনী পাঠানো হলো। সঙ্গে আসে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড বাহিনী (ইপিসিএএফ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান রেঞ্জারস (ড্রাইউপিআর) এর প্রতিটির দুটি করে ইউনিট। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কাউটও আসে। তাদেরকে প্রধানত স্বপক্ষত্যাগী রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর লোকজনদের জায়গায় বসানো হলো।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যত সৈন্য আনা হয় সবাইকে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ সম্পন্ন করার কাছে নিয়োজিত করা হয়। মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ বক্ষ ঘোষিত

হয়নি কখনো। ধরে নেয়া হয়, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা যাবে।<sup>৩</sup>

বর্ণনাকালে জীবনহানির যে সংখ্যা আমি উল্লেখ করেছি সেটা ছাড়া 'অপারেশন সার্ট লাইট'-এ ঠিক কতসংখ্যক হতাহত হয়েছিল; সে তথ্য আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি। কিন্তু আমার হিসেবের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ জড়ে করে বলতে পারি, সংমর্থে জীবনহানির সংখ্যা বড়জোর চার অংকের কাছাকাছি পৌছে। যদি বিদেশী সংবাদপত্র বিশ্বকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের জন্য দায়িত্ব বর্তায় তাদেরই ওপর, যারা ২৬ মার্চ (সন্ধায়) ঢাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বহিকার করে। এতে ভারতীয় প্রচার কিংবা একপেশে মনোভাবসম্পন্ন ট্রাইস্টদের মনগড়া কাল্পনিক গল্লের ওপর ভিত্তি করে তারা খবর পরিবেশন করে। যদি বিদেশী সাংবাদিকদের ২৫ মার্চের পরেও পূর্ব পাকিস্তানে থাকার অনুমতি দেয়া হতো তাহলে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পক্ষপাতদৃষ্ট ব্যক্তিও বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে দেখে যা লিখতো—যদিও ঘটনা দারুণ বেদনাদায়ক ছিল,—তথাপি লেখায় এ সম্পর্কে যে সব ত্যক্তর বর্ণনা এসেছে ততটা আসতে পারতো না।

- 
৩. প্রধান প্রধান শহর দখলে আসে পাকশী (১০ এপ্রিল), পাবনা (১০ এপ্রিল), সিলেট (১০ এপ্রিল), ইশ্বরদী (১১ এপ্রিল), নরসিংদী (১২ এপ্রিল), চন্দ্রঘোনা (১৩ এপ্রিল), বাঙশাহী (১৫ এপ্রিল), ঠাকুরগাঁও (১৫ এপ্রিল), কুষ্টিয়া (১৬ এপ্রিল), লাকসাম (১৬ এপ্রিল), চুয়াডাম (১৭ এপ্রিল), ব্রাক্ষণবাড়িয়া (১৭ এপ্রিল), দর্শনা (১৯ এপ্রিল), হিল (২১ এপ্রিল), সাতকীরা (২১ এপ্রিল), গোয়ালন্দ (২১ এপ্রিল), দেহাজারী (২২ এপ্রিল), বগড়া (২৩ এপ্রিল), রংপুর (২৬ এপ্রিল), নোয়াখালি (২৬ এপ্রিল), শাতাহার (২৭ এপ্রিল), সিরাজগঞ্জ (২৭ এপ্রিল) মৌলভীবাজার (২৮ এপ্রিল), করুবাজার (১০ মে), হাতিয়া (১১ মে)।

## সুযোগ হাতছাড়া হলো

২৬ মার্চ ঢাকা থেকে বিদেশী সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের বহিকারের পর থেকে পাকিস্তান বহির্বিশ্বে এক বিরূপ সংবাদ প্রবাহের মুখেমুখি হলো। সামরিক আমলাত্ত্ব অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এত বেশি জড়িয়ে পড়ে যে, এ মুখ্য বিষয়টির প্রতি তেমন মনোযোগ দিতে পারেনি। ‘নিরন্ত্র নিরাপদাধ বেসামরিক মানুষ’ হত্যার দোষাবোপকে বিপরীতমুখী করার একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বপক্ষত্যাগী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ ও পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনী সংঘটিত ঘটনা প্রকাশ করার এবং প্রকাশ করার জন্যে আমি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ তারিখে প্রস্তাব রাখি। প্রতি উভের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপবান বর্ষিত হয়। উন্টো আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তুমি কী একটি সেরা সেনাবাহিনীর ভাববৃত্তি বিশ্বকে এই বলে জানান দিয়ে ধ্বংস করতে চাও যে, এর ভেতরকার শৃংখলা ভেঙ্গে পড়েছে?’

আমর প্রস্তাবের পক্ষে তেমন কোন সমর্থন যোগাড় করতে পারলাম না। সুতরাং এর বাস্তবায়ন ততদিন হলো না, যতদিন না অবস্থা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করালো। ব্যাপকহারে বাঙ্গল সৈন্যদের স্বপক্ষে ত্যাগের কারণে যে বড় ধরনের গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে তুলে ধরে আমাদের বক্তব্যকে প্রচারের জন্য মে মাসের ১ তারিখে একটি সংবাদপত্রের একজন প্রতিনিধিকে খুঁজে বের করা হলো।<sup>১</sup>

যুক্তির যুদ্ধে আমিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলাম না, যে হেরে গিয়েছিল। মেজর জেনারেল ফরমান আলী এপ্রিলের গোড়ার দিকে প্রস্তাব দিলেন যে, স্বপক্ষত্যাগীরা আমাদের আওতার মধ্যে যাতে ফিরে আসে সে কারণে প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা উচিত। অন্যথায় ভারতীয় আশ্রয়ে তাদেরকে এক্যবন্ধ হওয়ার বিকল্প পথ করে দেয়া হবে। একজন জেনারেল,—যিনি ছিলেন তার সিনিয়র, খোঁচা মেরে বললেন, ‘তোমার রাজনৈতিক অভিগমন সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল; কিন্তু রাজনীতির সময় পার হয়ে গেছে।’ পাঁচ মাস পর (সেপ্টেম্বর) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। ততদিন ভারত বিদ্রোহীদের নিয়ে ‘মুক্তিবাহিনী—লিবারেশন আর্মি’ গঠন করে ফেললো। পরবর্তীকালে খোলাখুলি যুদ্ধের সময় এরা ভারতীয় বাহিনীর কাজ সহজ করে দেয়।

রাওয়ালপিণ্ডি হাইকমান্ড অবশ্য একটিমাত্র পরামর্শ গ্রহণ করে। সেনাধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রাদেশিক গভর্নর হিসেব জেনারেল টিক্কার ওপর চাপের ভার লাঘবের জন্যে ঢাকায় আরেকজন জেনারেল পাঠায়। তারা লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজিকে পছন্দ করে। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিলিটারি ক্রস-এ শোভিত হন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে লাভ করেন হিলাল-ই-জুরাত খেতাব। ‘ব্যক্তি’ বিশেষণে তিনি অভিহিত ছিলেন এবং বাংলার ব্যাপ্তদের বশে আনার জন্যে তাকে যোগ্যতর বাছাই বলে মনে করা হল। তার ব্যর্থতা, যা ডিসেম্বরের বিপর্যয়ে বড় করে দেখাতে হবে, তা সে সময় সাধারণত জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখা ছিল। যদি তিনি বিজয়ী হতেন, আমি নিশ্চিত, জাতি তার দুর্বলতাকে

১. ১ মে ১৯৭১-এ সানডে টাইমস, লন্ডনে আঞ্চনি মাসকারেনহাসের বক্তব্য একাশিত হয়।

উপেক্ষাই করতো। কিন্তু দুর্বলতা ও ব্যর্থতা তার ছিলই।

১১ এপ্রিলে ফ্লাগ স্টাফ হাউসের ফুলবাগানে তার সাথে আমি দেখা করি। একই দিন সকালে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্বাবধি গ্রহণ করেন। নতুন নিয়োগ তার পদোন্নতি ঘটায়। তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হলেন। যাবতীয় রিবন ও যুদ্ধে প্রাণ খেতাবের মেডেলে সজিত হয়ে তিনি পদোন্নতির আমেজ উপভোগ করছিলেন। নতুন চাকরির বিষয়ে তাকে পুরোপুরি আস্থাবান মনে হলো। জিওসি জেনারেল খাদিম রাজা পরে আমাকে বলেন, যে সময়ে তিনি কমান্ডের দায়িত্ব হস্তান্তর করছিলেন সে সময় জেনারেল নিয়াজি তাকে প্রশ্ন করেন, ‘কখন তুমি তোমার রক্ষিতাদের আমার হাতে তুলে দিচ্ছো?’

অধিনায়কত্ব গ্রহণের পর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরে তিনি অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে সেনাবাহিনীর ভেতরকার ‘শাস্তিবাদী’দের শৈথিল্যের সমালোচনা করেন এবং বাঙালিদের প্রতি, বিশেষ করে হিন্দু ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তিনি তার যাবতীয় ক্ষেত্রের উদগীরণ ঘটান। তার মতে, এই দৃটি শ্রেণীই বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয়া করেছে।

অপারেশনের ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যায়ী জিওসি'র কাছ থেকে ব্রিফিং নিলেন। সর্বশেষ সীমান্ত শহরে (কক্সবাজার) আমাদের সৈন্য পৌছানো অর্ধাং ১০মে পর্যন্ত তিনি এই ব্রিফিং অনুসরণ করে চলেন। ইয়াহিয়ার শাসনামলের সেরা জেনারেলদের মধ্যে অন্যতম মেজর জেনারেল রহিম খানকে জেনারেল খাদিম রাজার জায়গায় আনা হলো। জেনারেল নিয়াজি এখন একেবারে নতুন তিনজন ডিভিশনাল কমান্ডার পেলেন। এরা হলেন মেজর জেনারেল রহিম (চতুর্দশ ডিভিশন), মেজর জেনারেল শওকত রিজা (নবম ডিভিশন) এবং মেজর জেনারেল নজর হুসেন শাহ (মোড়শ ডিভিশন)। তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে একেকটি অঞ্চলের ভার একেকজন জেনারেলের হাতে দেন। নবম ডিভিশন পুরো পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত পেল; উত্তরবঙ্গ এলো ঘোড়শ ডিভিশনের অধীনে এবং প্রাদেশের বাদ বাকি অঞ্চল চতুর্দশ ডিভিশনের দায়িত্বে গেল।

এই সৈন্যদের নিয়ে বাঙালি প্রতিরোধের মেরুদণ্ড ভাঙতে জেনারেল নিয়াজির বেশি সময় লাগলো না। এপ্রিলের শেষাষাঢ়ি তিনি প্রধান প্রধান শহরের দখল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছোট-খাট অপারেশন পরিচালনায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু তুলনামূলভাবে শান্ত এবং নিরঞ্জনভাবে নিয়ন্ত্রিত এ সময়কে বাঙালিদের মন জয় করার জন্য তেমন কোন গঠনমূলক প্রচারাভিযানের ব্যবহার করা হলো না। তাদের ক্ষত আরো দগ্ধদণ্ডে করে তোলা হলো সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি হামলা চালিয়ে। ‘উচ্ছেদকরণ অপারেশন’ নামে তাকে অভিহিত করা হয়।

এ অপারেশন আংশিকভাবে সফল হয়। কেননা, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা সন্দেহজনক লোকদের চেহারা যেমন চিনতো না তেমনি অলিগ্নিলির নম্বরও (বাংলাতে লেখা) পড়তে পারতো না। শ্বানীয় লোকের সহযোগিতার ওপর তাদের নির্ভর করতে হলো। বাঙালিরা তখনো ব্যাপকভাবে আশা পোষণ করছিল যে, মুজিব ফিরে আসছেন। ফলে তারা নিষ্ক্রিয় উদাসীন মনোভাব ধরে রাখতো। এ সময় একমাত্র দক্ষিণপাহাড়ীয়া এগিয়ে এলেন। যেমন,

কাউপিল মুসলিম লীগের খাজা খয়ের উদ্দীন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের খান এ সবুর খান, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আয়ম ও নেজামে ইসলাম পার্টির মৌলভী ফরিদ আহমদ।

এদের সবাইকে আওয়াজী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রারজিত করে। বাঙালিদের ওপর এদের প্রভাবও ছিল অত্যন্ত সামান্য। সাধারণ মানুষের অনুভূতি ছিল, এরা সবাই অচল মুদ্রা। সেনাবাহিনী আরেকবার এদের চালু মুদ্রায় পরিণত করেছে। সেনাবাহিনী নিজস্ব প্রয়োজনেই তাদের উপস্থিতির গুরুত্ব দিল এবং তাঁদের পরামর্শ অনুসরণ করে চললো। আমি একটি বৈঠকে প্রস্তাব দিলাম যে, এসব 'অচল পয়সা'দের বক্তব্য প্রচারের পরিবর্তে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করা শ্রেয়তর—যারা নিজস্ব ক্ষেত্রে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যেমন শিক্ষক, আইনজীবী, শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবী। প্রস্তাব অনুমোদিত হলো এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমর্থনসূচক বিবৃতি সংগ্রহের আদেশ দেয়া হলো আমাকে। স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হলাম। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎস মূল যারা—সেবের বুদ্ধিজীবীরা আমার সাথে বাক সংযমী হলেন। বিচারপতি মুর্শেদের সঙ্গে আমার যে বৈঠক হয় সেটা আমার অভিজ্ঞতার পক্ষে একটা উদাহরণ বিশেষ। তিনি পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। বিশ্বয় উৎপাদনকারী তার পাঠকক্ষে (গুলশান কলোনি) আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বাছাই করা কিছু পুস্তক ও দুর্লভ কিছু পাখুলিপি দেখিয়ে আমার প্রতি তিনি আতিথ্য প্রদর্শন করলেন। প্রতীচ্যের তিন মহান কবি ও লেখক রূমী, সাদী এবং ইকবাল থেকে সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি উদ্ভৃতি দিতে থাকলেন। এই জ্ঞানগর্ত আলোচনার পরিবেশে আমি তার সহযোগিতা কামনা করলাম। দীর্ঘ প্যাচালো কথার শেষে তিনি বললেন, 'ভেবে দেখার জন্য আমাকে তিন মাস সময় দিতে হবে।' 'ভাববার জন্যে তিন মাস' বিশ্বয়ের ধাক্কায় আমার কঠিন উচ্চগামে উঠলো। 'হ্যা, কমপক্ষে তিন মাস। কেননা, দেখতে চাই আপনারা আপনাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কীনা। আচ্ছা, ফারল্যান্ড এখন কোথায়?' পরবর্তী বৈঠকে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা যখন বললাম তখন একজন 'দেশপ্রেমিক' গোয়েন্দা অফিসার বললো, 'আমরা মুর্শেদকে রাতে তুলে নিয়ে আসতে পারি এবং তোমার পছন্দমত বিবৃতি তাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে পারি।' আমি বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে, এই স্বতন্ত্রতা তাকে বিরত করায়।

বিচারপতি মুর্শেদ একাই একমাত্র বুদ্ধিজীবী ছিলেন না,—যিনি সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। তার মত অনেকেই মুজিবের প্রত্যাবর্তন ও তাদের স্বদেশ ভূমির মুক্তির আশা লালন করে চলেছিলেন। রেডিও এবং টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে এই অভিজ্ঞতাই হামলা সংঘটিত হবার পর পরই 'স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান' এ ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নতুন নতুন সামরিক আইন আদেশ প্রচারের জন্য আমাকে বেতার কেন্দ্র 'পুনঃসক্রিয়করণ'-এর কাজে নিয়োগ করা হয়। শুরুতে আমি ভাবলাম, সামরিক আইন আদেশ ঘোষণার বিরতির মাঝে তাদেরকে যত্র সঙ্গীত বাজানোর সুযোগ দেয়া নিরাপদ। সুযোগ পেয়ে তারা অন্ত্যেষ্টিকালীন শোক সঙ্গীত বাজাতে শুরু করে। সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সৃষ্টি ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্যে বিলাপমূলক সঙ্গীত বাজিয়ে চললো। বদলে দেশের

দু' অংশের মধ্যকার ইসলামী ভাতৃ বক্তন পুনঃজাগরণে নাত ও হামদ (আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রশংসায় স্তোত্র) বাজানোর নির্দেশ দিলাম। তারা অত্যত চতুরতার সাথে এ আধ্যাত্মিক সঙ্গীতটি ট্রান্সমিউ করলো

'আয়ে মওলা-এ-আলী, আয়ে শের-এ খোদা,  
মেরে কিঞ্চি পার লাগা দে না।'

(হে প্রভু! হে আলী! আমার নৌকা নিরাপদে তীরে নিয়ে যাও।)  
ঘটনাক্রমে নৌকা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক।

একইভাবে হিন্দু ও বৃটিশ আধিপত্য থেকে স্বাধীনতা লাভের বিষয়টি উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়োজনে পাকিস্তান আন্দোলনের বীরদের নিয়ে স্বল্পদৈর্য নাটক তৈরির জন্যে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলাম। তারা মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের মত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে বেছে নেয় এবং স্বাধীনতার পবিত্রতম বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রচারের জন্যে একটি শাক্তিশালী নাটক প্রচার করে। নাটকের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যোদ্ধাদের (মুক্তিবাহিনী) প্রতি আহ্বান জাননো হয় যে, যে কোন মহান ত্যাগের জন্যে তারা যেন কৃষ্ণিত না হয়।

স্বাধীনতার এই বীজ উৎপাটনের বদলে কর্তৃপক্ষ 'তাসের জুয়ার কোর্ট নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য' তাসের রাজত্ব অব্যাহত রাখা বিজ্ঞেচিত মনে করলো। 'দেশপ্রেমিক' পাকিস্তানিদের খবরের ওপর ভিত্তি করে তারা প্রায়শই 'স্কান ও উচ্ছেদকরণ অপারেশন' চালাতে লাগলো। খবর সরবরাহকারীদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানের সংহতির ব্যাপারে সত্যিকার অর্থেই আঘাত করে ছিল এবং সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিত। কিছু অবশ্য আওয়ামী লীগপক্ষীদের সাথে নিজেদের পুরনো ক্ষত মীমাংসার জন্যে সেনাবাহিনীর সাথে নিজেদের যোগাযোগকে ব্যবহার করতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদিন একজন দক্ষিণপস্থী রাজনীতিক একটি তরুণকে সঙ্গে নিয়ে সামরিক আইন সদর দফতরে আসে। বারান্দাতে হঠাৎ করেই তার সাথে আমার দেখা। আস্থাভরে ফিসফিসিয়ে সে বললো, 'বিদ্রোহীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর তার কাছে আছে।' আমি তাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে সে বললো, 'বালকটি তার ভাইয়ের ছেলে। সে বুড়ীগঙ্গা নদীর অপর পার কেরানীগঞ্জের বিদ্রোহীদের বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে এসেছে।' বালকটি আরো বললো, 'বিদ্রোহীরা শুধু স্থানীয় লোকজনদের হয়রানিই করছে না—রাতে ঢাকা শহর আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়েছে।'

তৎক্ষণাত 'উচ্ছেদকরণ অপারেশন'-এর আদেশ দেয়া হয়। আক্রমণকারী সৈন্যদের কামাত্তারকে ব্রিফ করা হলো। তোর হ্বার আগেই লক্ষ্যকে 'নমনীয়' করার উদ্দেশ্যে গোলাবর্ষণের জন্যে ফিল্ডগান; মট্টার ও রিকয়েললেস রাইফেলস প্রস্তুত করা হলো। স্থানটি সকাল ছুবার আগেই দখল করবার জন্যে সৈন্যরা সাঁড়শি অভিযান চালাবে।

আমি অপারেশন কর্মে বসে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রগতি লক্ষ্য করছিলাম। সেখান থেকে গোলাবর্ষণের শব্দ পরিষ্কার শ্রতিগোচর হচ্ছিল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও যুক্ত হলো। অনেকে এই ভেবে তীত হলো যে, আক্রমণকারী ব্যাটালিয়ন পরিবেশিত খবর অনুযায়ী স্থানীয় ৫ হাজার বিদ্রোহীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হবে না। সূর্যোদয়ের পরপরই অপারেশনের

সমাপ্তি ঘটে। নিশ্চিত হওয়া গেল যে, নিজেদের পক্ষে কোন হতাহত ছাড়াই আমাদের সেন্যারা লক্ষ্যকে শক্রমুক্ত করেছে।

যে অফিসার হামলা পরিচালনা করে, সন্ধ্যায় তার সাথে দেখা করলাম। সে যা বললো, তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে বললো, ‘ওখানে কোন বিদ্রোহী ছিল না। ছিল না অস্ত্রও। শুধু আমের গরিব লোকেরা—অধিকাংশ নারী এবং বৃন্দ। গোলার আগুনের মাঝে পুড়ে দক্ষ হয়েছে। কিন্তু দৃঢ়খজনক এই যে, গোয়েন্দা মারফত সঠিক সংবাদ সংগ্রহ না করেই এই হামলা পরিচালিত হয়েছে। আমার বিবেকের ওপর এ ভার আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বয়ে বেড়াবো।’

যখন এই ‘সন্ধান উচ্ছেদ অপারেশন’ এগিয়ে চলছিল সে সময় রেডিও পাকিস্তান, সংবাদপত্র ও টেলিভিশন ‘স্বাভাবিক’ অবস্থা নিয়ে একযো়ে সুরে বাঁশি বাজাতে শুরু করে যে, প্রাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরে আসছে। এটা এমন সময় ঘটলো যখন কোন বাড়ির লোকজন রেডিও পাকিস্তান প্রচারিত ‘স্বাভাবিক অবস্থা’র কথা শুনছে তখনই অনুসন্ধান দলের সামনে যা পড়েছে তাই-ই তারা উচ্ছেদ করে চলেছে। ফলে সরকার নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য প্রাচার মাধ্যমের মতই রেডিও পাকিস্তান বাঙালি শ্রেতার কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তারা অল ইউনিয়া রেডিও (এআইআর) কিংবা অন্য কোন বিদেশী বেতার কেন্দ্রের প্রতি ঝুকে পড়ে। এ আই আর ও এর বিদেশী সহানুভূতিশীলরা বাঙালির শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে কাঞ্চনিক খবর ঢোকাতে থাকে। ভারতীয়-বেতার বাঙালির ঘৃণা উসকে দেয়ার কোন সুযোগই হাতছাড়া করেনি। জনগণকে তাদের ঘরবাড়ি ত্যাগে প্ররোচিত করে এই বলে ‘যদি তারা তাদের জীবন ও স্মান রক্ষা করতে চায়।’ ফলে জুলাই এবং আগস্টের শেষের দিকে বিপুল মানুষের দেশত্যাগ ঘটলো। অন্যদিকে বিদ্রোহ পুরোমাত্রায় রূপ নিলো।

অনিশ্চিত অবস্থা সত্ত্বেও যারা ঘরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা সেনাবাহিনীর কোন না কোন অফিসার কিংবা ইউনিফরম পরিহিত কোন না কোন ব্যক্তির সাথে বক্তৃত সম্পর্ক গড়ে তোলাটাকে বিজ্ঞোচিত মনে করলো। একটি খাকি পোশাক এবং একটি পাঞ্জাবি কিংবা পশতু সংলাপকে বলি হওয়া থেকে কিংবা হয়রানি হওয়া থেকে বাঁচার একটি ঢাল বলে ধরে নেয়া হয়। আমাদের অনেকেই দয়াপরবশ হয়ে একেকটি বাঙালি পরিবারের ‘পৃষ্ঠপোষক’ হয়ে গেল। একটি সুন্দরী মেয়ে উপহার দিয়ে একটি পরিবার একই সঙ্গে কয়েকজন অফিসারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

একজন ধনশালী বাঙালি সম্পাদক তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান। চলতি বছরের আগের বছরই তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিতে উকি মারার ব্যাপারে কথনো তিনি আমার জন্যে তার বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে ঢিলে করেননি। তিনি এই অজুহাত দেখিয়ে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন যে, আমার বেড়িয়ে আসাটা তার পরিবারের সকলের জন্যে নৈতিক সাহস সঞ্চয়ের জন্যে সহায়ক হবে। কেননা, সম্প্রতি এক রাতে প্রতিবেশীর ঘরে হামলার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে মা, বিবাহিত বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনি তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বৈঠক্যানায় সুন্দরী স্ত্রীকে একা রেখে বেরিয়ে

গেলেন, এক অতিথিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে তুনো আনতে। নীরবতা দ্রুত দারূণ ভাবি হয়ে চেপে বসলো। মার্জিত রঞ্চি সম্পন্না মেজবানের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে মুখ খুলাম, ‘যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দৃঢ়থিত। কিন্তু

তিনি আমার কথা কেড়ে নিলেন। বললেন, “অসংখ্য ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, অসংখ্য মানুষ হত্যা করে, অসংখ্য নারী ধর্ষণ করে আপনি ‘এখন’ দৃঢ়থিত।” আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। তিনি ফেটে পড়লেন, “এর জন্যে আপনাদের লজিজত হওয়া উচিত.... আমি খাকি পোশাকের প্রতিটি সুতোকে ঘৃণ করি। প্রতিটি প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যের চেহারায় বর্বরতার দাগ স্পষ্ট.... আমি জানি না, আমার স্বামী আপনাকে এখানে কেন এনেছেন। নিশ্চয়ই আপনি সেই জানোয়ারদেরই একজন,—যারা গত রাতে আমার বোনের বাসায় গিয়েছিল।’ কথা শেষ হতেই আমি নীরবে উঠে দাঁড়ালাম এবং বেরিয়ে এলাম।

এই ঘৃণার মূলোৎপাটনের জন্যে কিছুই করা হলো না। রোগীর মনস্তাত্ত্বিক আরোগ্যকরণের জন্যে খাঁটি অর্থে কোন মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা কারো ভেতর অনুভূত হলো না যে প্রচেষ্টাই নেয়া হলো তা সীমাবদ্ধ রাইল আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের মধ্যেই—যেমন, রেল লাইনের মেরামত, ফেরি চলাচল, মালামাল পরিবহণ এবং অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচলের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি।

মনস্তাত্ত্বিক ও ভাবাবেগের জোড়া লাগাবার মত প্রধান বিষয়টিকে এক পাশে সরিয়ে রাখা হলো। কিন্তু যে ক্ষুদ্র মানবরা সমস্যা সমাধানে চেষ্টিত ছিল তাদের জন্য সমস্যা ছিল বিশালাকারের। সমস্যার মাত্রা সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির ঘাটতি ছিল। তারা ছিল সেই রকমই একটি ইন্দুর—যে হস্তীর পিঠে চড়ে বসেছে। ধারণা করছে, যে এলাকা সে দখল করেছে তার প্রভু সে। কিন্তু কদাচিং দাবি করতে পারে যে, পুরো হস্তীটিকে সে করায়ত করতে পেরেছে।

হস্তীটিকে বশে রাখার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দু' ডজন আমলা ও ৫০০ পুলিশ পাঠানো হল। দু'টো দলই—পুলিশ এবং কর্তাব্যক্তিরা স্বাভাবিক অবস্থার কর্ম প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত। কিন্তু বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জোড়া লাগিয়ে নতুন জীবন সঞ্চারে অক্ষম। এই অলৌকিক কর্মসাধনে আমলারা কখনোই ত্রাণকর্তা হতে পারে না। এ কাজ অনিবার্যভাবে একজন রাষ্ট্রনায়কের। মার্শাল ল'য়ের অনুর্বর ভূমিতে তাদের কদাচিং জন্ম হয়।

## বিদ্রোহ

, ভারতীয় হস্তক্ষেপ,—যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ডিসেম্বরে খোলাখুলি আক্রমণের মধ্য দিয়ে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সেটা গোপন ছিল না (অন্তত আমাদের কাছে)। সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর পরই প্রথ্যাত সব ভারতীয় নেতৃত্ব ও লেখক বিদ্রোহীদের জন্যে তাদের সমর্থন যোগাগ করলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৭ মার্চ সকালের দিকে লোকসভা সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, ‘যারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সময়মত সিদ্ধান্ত ‘পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে’ নেয়া হবে কি-না; কেননা করণীয় বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, সে সব সম্মিলিত সদস্যদের আশ্বস্ত করতে চাই এই বলে, সময় হলে সিদ্ধান্ত না নেয়ার কোন কারণ নেই।’<sup>১</sup> চারদিন পর ভারতীয় পার্লামেন্ট একটি প্রস্তাব পাস করে বলে, ‘এই পরিষদ তাদের আশ্বস্ত করছে (বিদ্রোহীদের) যে, তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগ ভারতীয় জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করবে।’<sup>২</sup> একই দিনে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত একটি সিম্পোজিয়ামে ইন্ডিয়ান ইস্টেটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ-এর ডাইরেক্টর মি. কে সুব্রামণিয়াম এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বলেন, ‘যে বিষয়টি ভারতের উপলক্ষ্য করতে হবে তা হলো পাকিস্তানের ভাস্তন আমাদের স্বার্থেই আসবে। এ জাতীয় সুযোগ কখনও আসবে না (বিত্তীয়বারা)।’<sup>৩</sup> একই ভাষণে তিনি ‘শতাদীর সুযোগ’ বলে অভিহিত করেন এবং ভারতের এক নম্বর শক্তি পাকিস্তানকে ধ্রংসের ভারতীয় দৃঢ়ত্বার কথা প্রকাশ করেন।

ভারত তার এই মৌখিক সমর্থনকে পৃষ্ঠপোষকতা করলো কার্যকর বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে। তার সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। এগ্রিলের গোড়ার দিকে যশোর ও সিলেটের পাকিস্তানি সীমান্ত রেখার কয়েক কিলোমিটার অভ্যন্তরে তাদের ছ'জনকে পাকড়াও করা হলো। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ইস্পেন্টের জেনারেল তার সৈন্যদের ‘বিদ্রোহীদের সর্বপ্রথম সরকারি ‘মেজবান’ হিসেবে অভিহিত করলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনে ভারতীয় নিয়মিত সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার বেসামরিক পোশাকে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বসে অপারেশন চালায়। পরে এদের মধ্যে দু'জন আলাদা আলাদাভাবে আমার সামনে (যখন যুদ্ধবন্দী হিসেবে আমি ভারতে ছিলাম) গর্বের সঙ্গে বলে যে, সমগ্র মার্চ মাস এবং এর পরবর্তী সময়েও তারা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল।

তাদের জড়িয়ে পড়ার পরিধিটা যদি এ পর্যায়ের হয়, তাহলে ভারতীয়রা সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন? এবং যখন মেহায়েতেই আমাদের অবস্থা অর্ক্ষিত, সে সময় মার্চের শেষতক কিংবা এগ্রিলের গোড়া পর্যন্ত সমস্যাটিকে দৃঢ় মুষ্টিতে কেন ধরে

- 
১. বাংলাদেশ ডকুমেন্টস : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৬৯
  ২. প্রাতেজ, পৃষ্ঠা-৬৭২
  ৩. দি হিন্দুস্তান টাইমস, নয়াদিল্লী, ১ এগ্রিল, ১৯৭১

রাখবে না? ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ভারতীয় সরকারি ইতিহাসবেত্তা<sup>৪</sup> মেজর জেনারেল ডি কে পালিত বলেছেন, ‘ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান দায়িত্ব নিতে অস্থীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কেননা, সশস্ত্রবাহিনী তখনও পুনঃসজ্জিতকরণ ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোছিল।’ জেনারেল পালিত বলেন, ৫০,০০০ মিলিয়ন রূপির পঞ্চবর্ষীকী প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কেবল বাস্তবায়িত হবার পথে এবং ভারতীয় সমরসজ্জাকে আরো জোরালো করতে তখনও অনেক ব্যবস্থা গ্রহণে বাকি। তিনি বলেন

‘সেনাবাহিনীতে জনশক্তি সংগ্রহের কাজ পুরোমাত্রায় অর্জিত হয়নি। অনেকগুলো ইউনিটে জনশক্তির ঘাটতি রয়েছে। কয়েকটি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট গঠন ও পুনঃসজ্জিত করন সম্পূর্ণ হয়নি। চলমান অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও লজিস্টিক ইউনিটেও ঘাটতি আছে। বিমান বাহিনীতে মিগ-২১ জঙ্গী বিমান নির্মাণ কর্মসূচি পুরোমাত্রায় উপনীত হতে পারেনি। খুচরো যন্ত্রাংশের অভাবে কয়েকটি ক্ষেয়াত্ত্বনের কার্যক্ষমতা নিম্নতর পর্যায়ে চলে আসে। নৌ-বাহিনীতেও পুনঃসজ্জিতকরণ প্রকল্প সম্পূর্ণ হতে তখনও বাকি। সর্বাত্মক যুদ্ধ লড়ার প্রস্তুতির জন্য সেনাবাহিনীকে আরো কয়েকমাসের ক্রাশ প্রোগ্রামের অধীনে আনা দরকার। এর থেকেও মারাত্মক হলো, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার চাহিদা মেটাতে গিয়ে সেনাবাহিনীতে সময়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। দু’টি ডিভিশনকে (ভারি অস্ত্র বাদে) পশ্চিমবাংলায় নিয়োগ করা হয় এবং নাগাল্যান্ডে এক ডিভিশন, মিজো পাহাড়ি এলাকায় এক ডিভিশন। এ অবস্থায় বিমান বাহিনীও অসুবিধায় পড়বে। কারণ, বাংলাদেশে হামলা চালানোর মতো করে উন্নয়ন হয়নি বিমান ঘাঁটিগুলোর। কুমিল্লা সেট্টের অপারেশন চালানোর জন্যে শিলচরের কুড়িগ্রামের বিমান ঘাঁটিটি ব্যবহার করতে হবে কিন্তু হামলা চালাবার জন্যে পর্যাপ্ত সুবিধাজনক নয়।’<sup>৫</sup>

পরবর্তীকালে ‘দ্য লিবারেশন ওয়ার’ পুনর্কের সহ-লেখক হিসেব কে সুব্রামণিয়াম পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্যে সর্বনিম্ন নয় মাস সময়সীমা নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, ....একটি সাফল্যজনক কার্যক্রম শুরুর পূর্বে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গীকার প্রাপ্তি ইত্যাদিসহ সব রকমের প্রস্তুতির জন্যে আমাদের নয় মাস সময়ের প্রয়োজন ছিল।’<sup>৬</sup>

সামরিক প্রস্তুতি ছাড়াও অনুকূল বিশ্বজনমত সৃষ্টি এবং চীনা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে কুটনৈতিকভাবে নিরপেক্ষকরণের জন্যেও ভারতের সময়ের প্রয়োজন ছিল। তিনি একই সাথে সকল ফ্রন্টেই কাজ শুরু করে দেন। তার সব সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানরা নিজ নিজ বাহিনী পুনর্গঠন ও পুনঃসজ্জিতকরণের কাজ বেগবান করলেন। অন্যদিকে তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পূর্বেকার ভারত-সোভিয়েত ‘শান্তি, মৈর্য্যাত ও সহযোগিতামূলক’ চুক্তির প্রস্তাবটি পুনরঝীবিত করে এবং ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বজনমতকে নিজের অনুকূল প্রভাবে আনার জন্যে ভারত শরণার্থীদের উপস্থিতিকে বড় করে দেখিয়ে কাজে লাগালো। পূর্ব পাকিস্তানের অনিষ্টিত পরিস্থিতির জন্যে এই শরণার্থীরা ভারতে পালিয়ে যায়।

৪. ডি কে পালিত দি লাইটনিং ক্যাম্পেইন, পৃষ্ঠা-৪২

৫. প্রাতঙ্গ, পৃষ্ঠা-৪০-৪২

৬. মোহাম্মদ আইউব ও কে সুব্রামণিয়াম দি লিবারেশন ওয়ার, নয়াদিল্লী, পৃষ্ঠা-১৭৭

এদিকে বিদ্রোহ প্রশমনের কোন সুযোগই ভারত পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দিল না। সে একটি বিদ্রোহী বাহিনী গঠন করলো—যা সাধারণত ‘মুক্তিবাহিনী’ নামে অভিহিত হলো স্বপক্ষত্যাগী পূর্ব পাকিস্তানের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর সদস্যদের এই বাহিনীর মেরুদণ্ড করা হলো। অতিরিক্ত হিসেব ছাত্র, আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক ও সক্ষম দেহের শরণার্থীদের এদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) এমএজি ওসমানী এ বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হলেন।

বিদ্রোহী বাহিনীকে রাজনৈতিক ছছায়া দেয়ার জন্যে ভারত আওয়ামী লীগ নেতাদের উপস্থিতিকে ব্যবহার করলো। এই নেতারা ২৫ মার্চের হামলার পর মুহূর্তে পালিয়ে কলকাতায় চলে যান। এদের মধ্যে নামি যারা ছিলেন তারা হলেন তাজউদ্দীন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী এবং মোস্তাক আহমেদ খন্দকার। তারা মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে এবং ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ‘বাংলাদেশকে মুক্ত’ করার লক্ষ্যে প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে একত্র হন।

ভারতীয় যুদ্ধবাজরা মুক্তিবাহিনীর জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যধারা নির্দিষ্ট করে

‘তাদের নিজেদের স্বদেশ ভূমিতে নিয়োগ করতে হবে এই উদ্দেশ্যে—গুরুতেই যেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী আচল হয়ে যায় এবং বাংলায় নিজেদের রক্ষার কাজে যাতে আটকে থাকে। পরবর্তী সময়ে গেরিলা অপারেশনের ক্রমবিস্তারের মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরের নেতৃত্বে মনোবল ক্ষয় ও প্রাণ শক্তি নিঃশেষ করতে হবে। সর্বশেষ, পাকিস্তান যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে সেক্ষেত্রে এই ক্যাডারদের পূর্বাঞ্চলীয় ফিল্ড ফোর্সের সহায়ক হিসেবে পাওয়া যাবে।’<sup>১</sup>

পর্যায়ক্রমে এই ম্যাডেট পালনের জন্যে মুক্তিবাহিনী তৈরি হয়ে গেল। প্রথম পর্যায়ে নাশকতামূলক কাজের জন্যে চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল—অতর্কিত আক্রমণ, গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং রাইফেল চালনা। পরে প্রশিক্ষণের সময়সীমা বাড়িয়ে করা হয় আট সপ্তাহ। কাজের পরাধিক বিস্তৃতি ঘটে এবং সমস্ত ধরনের হালকা অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩০ হাজার লোককে অন্ত্রে সজ্জিত করা হয় এবং ভারতীয় নিয়মিত বাহিনীর পাশে থেকে প্রচলিত যুদ্ধে অংশ নেয়ার ব্যাপারে সংগঠিত করা হলো। বাকি ৭০ হাজারকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহমূলক অপারেশনকে তিন পর্যায়ে সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে: পর্যায় এক (জুন-জুলাই): প্রাথমিক পর্যায়ে তারা সীমাত্ত এলাকায় অপারেশন চালায় সেখানে কাছাকাছি থেকে ভারতীয় সেনারা তাদেরকে নেতৃত্বে এবং বস্ত্রগত দিক দিয়ে সমর্থন জোগাতে পারে। এই পর্যায়ে বিদ্রোহীরা অত্যন্ত দ্রুত নিজেদের আশ্রয়ে পালিয়ে যেতো। এই সময়টিতে তাদের সম্পাদিত প্রধান কাগগুলো হলো—ছোটখাট কালভার্ট ও মাইন পেতে পরিত্যক্ত রেলওয়ে লাইন উড়িয়ে দেয়া, গ্রেনেড ছুঁড়ে মারা কিংবা গুরুত্বহীন কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করা।

পর্যায় দুই (আগস্ট-সেক্টেম্বর) এ পর্যায়ে তারা তাদের প্রশিক্ষণে এবং অপারেশনের

১. প্রাণ চোপরা ইতিয়াস সেকেন্ড লিবারেশন, দিল্লী, পঠা-১৫৫

পদ্ধতিতে উৎকর্ষের পরিচয় রাখতে শুরু করে। তাদেরকে মনে হলো অনেক বেশি আস্থাবান, অভিপ্রায়গত দিক দিয়ে অনেক প্রেরণাদীগু এবং অধিকতর যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত। এখন তাদের উৎকর্ষ ওৎপেতে থেকে সামরিক কনভয়ের ওপর হামলা পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করলো। তারা থানা আক্রমণ শুরু করে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা উড়িয়ে এবং নৌযান ডুবিয়ে দিতে থাকে। নামকরা রাজনৈতিক নেতাদের হত্যায় নামে। তাদের অপারেশন ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

পর্যায় তিনি (অট্টোবর-নভেম্বর) তারা এই পর্যায়ে সীমান্তে এবং অভ্যন্তরে চমৎকার কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। ভারতীয় সৈন্য ও গোলন্দাজদের সহায়তায় তারা সীমান্ত চৌকিগুলির ওপর প্রচও চাপ সৃষ্টি করে চললো এবং গুরুত্বপূর্ণ গঞ্জ ও নগরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই দ্যুর্যোগ আক্রমণ আমাদের সম্পদ ও মনোবলের ওপর প্রবলভাবে চেপে বসে। এই পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্তের কয়েকটি নদীপথে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন নির্মাণ করে অস্থায়ী গড় করে ফেলে। যুদ্ধের সময় তারা এইগুলোকে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করে।

তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পেল মে মাসে ক্যাম্পের সংখ্যা ছিল ৩০ টি, আগস্টে হলো ৪০টি এবং সেপ্টেম্বরে বৃদ্ধি পেয়ে হলো ৮৪টি। একেকটি প্রশিক্ষণ চক্রে ৫৬ থেকে ২ হাজার বিদ্রোহীকে প্রশিক্ষণদানের ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল প্রতিটি ক্যাম্প। যুদ্ধের আগে তাদের মোট সংখ্যা এক লাখে উন্নীত হয়।

প্রথমদিকে বিদ্রোহীদের জন্য অস্ত্র ও অন্যান্য সমর উপকরণ সংগ্রহে ভারত কিছু সমস্যায় পড়ে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পর একটি বৃহৎ শক্তির কাছ থেকে সম্পদ প্রাপ্তির সুযোগ ঘটলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের আশ্বাস প্রাপ্তির পরই গেরিলাদের জন্য ভারতীয় অস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি পেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে আশ্বাস দেয়, বিদ্রোহী বাহিনীকে দেয়া অন্ত্রে ঘাটতি সে পূরণ করে দেবে।<sup>৮</sup> এক বৃটিশ মাহিলা সাংবাদিক ঢাকায় আমাকে বলেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার বাতিল করে দেয়া পুরনো সোভিয়েত অস্ত্র তিনি বিদ্রোহীদের হাতে দেখেছেন। পূর্ব ইউরোপে এগুলো গুদামজাত করে রাখা হয়েছিল। এছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার বিদেশে বিভিন্ন বাংলাদেশী মিশনের সংগ্রহ করা তহবিল দিয়ে এবং ভারতীয় অর্থ সাহায্যে কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র কেনে।

পাকিস্তান এই চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করে? তাকে বিদ্রোহীদের প্রচও উপদ্রব মোকাবিলা করতে হবে ১ হাজার ২৬০ জন অফিসার ও বিভিন্ন স্তরের ৪১ হাজার ৬০০ জনের সময়ে গঠিত একটি বাহিনী দিয়ে। এই জনশক্তিকে ৫৫ হাজার ১২৬ বর্গমাইল এলাকা দেখাশোনা করতে হবে। গেরিলা যুদ্ধের কিংবদন্তীর নায়ক টি ই লরেপ্স এলাকাভিত্তিক জনশক্তি বাঁটোয়ারা অনুপ্রাপ্ত নির্ধারণ করেছেন প্রতি চার বর্গমাইলে কুড়ি জন করে।<sup>৯</sup> তিনি এ সংখ্যা নির্ধারণ করেন মরমযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের মত প্রচুর বৃক্ষরাজি দৃষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করে না। এমন কী মরমযুদ্ধের নিয়মানুযায়ী পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে পাকিস্তানের প্রয়োজন ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৬৪০ জন সৈন্য। বর্তমানে

৮. মিউজ রিভিউ অন পাকিস্তান, দি ইনসিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসেস, নয়দিস্ট্রী, নভেম্বর, ১৯৭১

৯. টি ই লরেপ্স সেভেন পিলারস অব উইজডম, লন্ডন, পৃষ্ঠা-১৯২

৩'শ সৈন্য থেকে প্রায় সাতগুণ অধিক। ডেভিড লোসাক নামের একজন বিদেশী সংবাদপত্র প্রাতিনির্ধি হিসেব করে বলেন, এর জন্যে ২ লাখ ৫০ হাজারের একটি সেনাদল দরকার।<sup>১০</sup> শুধু পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হবার আগ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের ব্যাপক তৎপরতা কার্যকরভাবে ঠেকিয়ে গাথতে পেরেছিল।

পাকিস্তান স্প্রিংকাতর সীমান্ত চৌকিগুলিতে এবং প্রধান প্রধান জেলা ও মহকুমা সদর দফতরে নিজের উপস্থিতিকে ধরে রাখে। ৩৭০টি সীমান্ত চৌকির মধ্যে ৯০টি এবং বেশিরভাগ প্রধান শহরগুলো পাকিস্তানের দখলে ছিল। শহরকে ঘাঁটি করে আশেপাশের এলাকায় অপারেশন চালানো হত প্রধানত বিদ্রোহী তৎপরতার খবর পেয়ে। এ সব ক্ষেত্রে খ্বাবতই যা ঘটতো, তাহলো শান্তি প্রদানের জন্যে প্রেরিত সৈন্যদের হামলা চালানোর আগেই বিদ্রোহীরা সরে পড়তো। বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার পরবর্তী পর্যায় হল, এই সময় উচ্ছেদকরণ সেনাদলকে তারা প্রতিরোধ করতো। এবং তখনই তারা তাদের গোপন আন্তর্নির্মাণ পরিয়াগ করতো যখন দেখতো, নতুন সেনার সম্মাবেশ ঘটেছে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভীতি সঞ্চার হয়েছে নিজেদের মধ্যে।

বিদ্রোহমূলক তৎপরতা যখন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, তখন এখিল থেকে জুন পর্যন্ত, আমাদের সৈন্যরা খুবই সক্রিয় ছিল। উপদ্রব বাড়তেই কমান্ডাররা উদাসীন হয়ে পড়ে এবং একমাত্র তখনই ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে যেতো যখন আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। সর্বশেষ পর্যায়ে (অস্ট্রেব-নভেম্বর) তারা তাদের ঘাঁটির সঙ্গে সেঁটে থাকাই অধিকরণ শ্রেয় মনে করতো এবং অধিনায়কত্বকে কোনৰূপ ঝুঁকির মুখোমুখি করতে চাইতো না। এর পেছনে অনেক কারণ হয়তো বিদ্যমান। কিন্তু মুখ্য কারণ হচ্ছে বিরামহীন অনিয়মিত দীর্ঘ যুদ্ধ।

বিদ্রোহ দমনমূলক অপারেশনের ভাগ্য বাঙালিদের আচরণের সঙ্গে ওঠানামা করতে থাকে। তারা সাধারণত বিজয়ীদের পক্ষই নিত। যদি আমাদের উপস্থিতি ঘটতো তারা স্পষ্টতই আমাদের সঙ্গে এসে যেতো কিন্তু সরে এলেই যাবতীয় উষ্ণতা নিয়ে তাদের নতুন প্রভুকে (মুক্তিবাহিনী) অভ্যর্থনা জানাতো। কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তি দু'টো পতাকা রাখতো—একটি পাকিস্তানি অপরাটি বাংলাদেশের। এবং যখন যেটা লাগে, ছাদে তুলতো। কিন্তু মূল ব্যাপারটি এক বা আরেক পতাকা ওড়ানোর মত সহজ ছিল না। ভয়ানক দুর্ভোগ নেমে আসতো যদি কেউ ভুল পদক্ষেপ নিতো। এখানে এই ধরনের একটি নমুনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি আগস্ট মাসের। নোয়াখালী জেলায় ঘটে। নিম্নস্তরের একজন সামরিক কর্মকর্তার অধীনে সাতজন লোক দিয়ে বিদ্রোহী তৎপরতাক্ষিট একটি এলাকায় পাঠানো হয়। তরুণ অফিসারকে 'কৌশলী ও নমনীয়' হবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। ফলে বিদ্রোহীরা তার পাঁচজনকে হত্যা করে। এরপর একজন ক্যাপ্টেনের অধিনায়কত্বে একটি শক্তিশালী সেনাদল পাঠানো হয়। বিদ্রোহীরা পরিখা খুঁড়ে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। সুতরাং তারা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যাপ্টেন পূর্বে প্রেরিত সেনাদলের কয়েকটি মৃতদেহ দেখেন। এবং মনচক্ষে দেখলেন যে, যদি তিনি নমনীয় হন তাহলে একই ধরনের ভাগ্য তাকে বরণ করতে হবে। তিনি বিদ্রোহীদের জন্যে কয়েকবার উচ্চস্থরে ছুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। কিন্তু

১০. ডেভিড সোসাক পাকিস্তান কাইসিস, লন্ডন, পৃষ্ঠা-১৩০

কোন ফলোদয় হয় না। তখন তিনি সমগ্র এলাকা ঘিরে তারপর তার কাছে যত রকমের অস্ত্র ছিল সবগুলো দিয়েই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলেন। উচ্চকষ্ট চিংকার ধ্বনি ও ভারি ঝোঁঝা শুন্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর এক বৃন্দ হাতে একটি সাদা পতাকা নিয়ে এগিয়ে এল এবং সন্দির জন্যে আবেদন জানালো। অফিসার তার প্রস্তাব গ্রহণ করলো। কিন্তু ততক্ষণে অনেকে জীবনহানি ঘটে গেছে।

বিদ্রোহীরা একইরকম বরং অধিকতর কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'সহযোগী'দের জন্যে।

বিদ্রোহীদের সাধারণ নিরাপরাধ লোক থেকে আলাদা করাই ছিল আসল সমস্য। তারা সাধারণত পানির মধ্যে মাছের মতই মিশে থাকতো। জেনারেল টিক্কা খানকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, সীমাত্ত রেখা থেকে তিনি মাইল এলাকা জনশূন্য করার। এতে সৈন্যরা ওই এলাকার সন্দেহজনক সব কিছুর ওপর গুলি চালাতে পারবে। জেনারেল টিক্কা খান পরামর্শ প্রত্যাখান করলেন তিনি ভাবলেন, এই প্রক্রিয়া পুনর্বাসন সমস্যাকে গভীরতর করবে। কেননা, ৪ সেপ্টেম্বরে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিনি পীড়িত ছিলেন।

সুতরাং বিদ্রোহী ও তাদের মেজবানদের মধ্যে মেলামেশা চলতেই থাকলো। একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কেননা, সবাই দেখতে একই রকমের। একজন বিদ্রোহী বগলে লুকিয়ে রাখা স্টেনগান জরুরি মুহূর্তে মাঠে ফেলে দিতে পারতো এবং নিরীহ কৃষকের মতো মাঠের কাজে নেমে যেতে পারতো। অন্যদিকে কোন সামরিক যান বহরের আগমনের পথে একজন নিরীহ দর্শন জেলে কাজের ফাঁকে মাইন পুঁতে রেখে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতো। বিষয়টির ব্যাখ্যা দানের জন্যে এখানে একটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

রাজশাহীতে খবর এলো যে, রোহনপুর এলাকায় বিদ্রোহীরা প্রবেশ করেছে এবং স্থানীয় জনগণকে খাদ্য, অর্থ এবং আশ্রয়দামের জন্য চাপ দিচ্ছে। একদল সৈন্য ওই এলাকায় অনুসন্ধান চালালো। কিন্তু মাঠে কর্মরত তিনজন কৃষক ছাড়া আর কাউকেও পেল না। ফেরার মুখে তারা শুরুমণ্ডিত এক লোককে পেল। বিদ্রোহীদের সন্ধানদানের জন্যে তারা তার দিকে বেয়নেট ধরে তয় দেখালো। তার ইঙ্গিত মতো সৈন্যরা মাঠে কর্মরত সেই তিনি কৃষককে পাকড়াও করলো এবং তাদের কাছ থেকে কিছু ছেনেড়, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য এবং কিছু প্রচারপত্র উদ্ধার করলো। সেগুলো মাঠেই লুকানো ছিল। তিনজনই ছিল মৃত্তি বাহিনীর একনিষ্ঠ সদস্য।

সেনাবাহিনীর চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে তারা আরো কিছু কৌশলের আশ্রয় নিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জুলাই মাসে দু'জন সৈনিক বেনাপোল ও রঘুনাথের (যশোর সেট্টর) মাবামাখি রচ্চিন টহলকালে দীনাহীন চেহারার এক লোকের দেখা পায়। সে তরকারি ভর্তি একটি থলে নিয়ে যাচ্ছিল। টহলকালে সৈন্য দু'জনের জন্যে বিদ্রোহীরা কোন বিয়ই সৃষ্টি করেনি। তাই হঠাৎই বিনা কারণে লোকটিকে লক্ষ্য করে তারা উচ্চকষ্টে বলে, 'থলির মধ্যে কি নিয়ে যাচ্ছ বাবা?' এতে বৃন্দটি ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। থলির মুখ খোলা হলে তারা দেখতে পায়

ভেতরে টাইম বোমার ফিউজে (নাশকতামূলক কাজের জন্যে) ঠাসা। ওপরে সামান্য তরকারি ছড়িয়ে রেখে আড়াল করা হয়েছে। একই রকমের ঘটনা আরেকটি। লেফ্টেন্যান্ট ফারারাক বৃক্ষপুত্রের চর এলাকায় অনুসন্ধান কাজ চালাচ্ছিলেন। সন্দেহবশত মৌসুমী ফল ভর্তি একটি নৌকায় অনুসন্ধান চালান। নৌকার ফলের নীচটা গ্রেনেড এবং মাইনে ছিল ঠাসা।

নজরদারি এড়ানোর জন্যে বিদ্রোহীরা নানা পথ ব্যবহার করতো। সাধারণত তারা গ্রামাঞ্চলের ভেতর দিয়ে অপারেশন চালাতো। অন্যদিকে আমরা প্রধান প্রধান সড়ক ব্যবহার করতাম। বিদ্রোহীরা এটা জানতো এবং এর ব্যবহারটি পুরোপুরিই করে। রংপুরের এক বিদ্রোহী সীমাত্ত্বের ওপারে অবস্থানরত তার এক সহযোগিকে একটি চিঠি লেখে। চিঠিটা আমাদের হাতে পড়ে যায়। তাতে সে বলে, ‘পাকিস্তানি সেনারা আমাদের কখনোই খুঁজে পাবে না। তারা প্রধান প্রধান চলাচলের মুখ, জনপ্রিয় ফেরি ও প্রধান প্রধান ঘাট পাহাড়া দেয়। আর আমরা ঘুপচি লেন, প্রধান রাস্তার পার্শ্ববর্তী পথ এবং অপ্রচলিত পথ দিয়েই চলাফেরা করি। এছাড়া নৌকার বহির্ভূতেই তারা অনুসন্ধান চালায়। অথচ ভেতরে কি বন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে তাবেও না। আমাদের আশ্রয় স্থান হচ্ছে স্থানীয় মসজিদের ইমামের (স্থানীয় ধর্মীয় নেতা) বাড়ি কিংবা শান্তি কমিটির নামকরা (সদস্যের) বাড়ি যাদের আনুগত্যের প্রশ়্নে সেনাবাহিনী কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না। আমাদের এগোবার পথ অত্যন্ত কৌশলী কিন্তু আদর্শ আমাদের সুউচ্চ। বিজয়ী আমরা হবোই।

সময়ের অতিক্রমির সাথে বিদ্রোহীরা তাদের নাশকতামূলক কাজে উৎকর্ষ্য অর্জন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথমদিকে তারা বুবি ট্রাপ ও সেফটি বাল্ব ব্যবহার করতো। যখন এই বিপদ মোকাবেলার জন্য আমরা প্রধান সামরিক যানের সামনে খালি গাড়ি কিংবা রেলওয়ে বাগি জুড়ে দিতে শুরু করলাম তখন তারা দূর নিয়ন্ত্রিক বিদ্যুৎ বিস্ফোরক বসালো। এ দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছামত গমনশীল লক্ষ্য বিস্ফোরণ ঘটাতে পারতো। তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র (ডায়নামো) খুঁজে বের করা শুরু হতেই তারা ড্রাই ব্যাটারি সেল ব্যবহার আরম্ভ করে। এসব ব্যাটারি খুব সহজেই একটি টর্চ বাতির ভেতরে করে কিংবা বাঁশের খোলের মধ্যে পুরো পাচার করা সম্ভব ছিল।

নদীর মোহনায় অপারেশন চালানোতে একই ঘটনা ঘটে। প্রথমদিকে তারা স্তুল ধরনের বিস্ফোরক জাহাজ, কোস্টার কিংবা বার্জের গায়ে বেঁধে দিত। কিন্তু আগস্টের দিকে তারা লিমপেট মাইনের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবহার শুরু করে। মাইনের অগ্রমুখের চুম্বক সহজেই লক্ষ্যবন্ধুর সাথে সেঁটে দেয়া যেতো। এটাও তাদের জন্য যখন বিপদজনক হয়ে ওঠে তখন তারা ডুবুরি নিয়োগ করে। তারা আমাদের নজর এড়িয়ে সাঁতরে জাহাজের গায়ে মাইন লাগিয়ে ফিরে আসতো। এই কাজের জন্যে ভারতীয় নৌবাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়ে ওশ ফ্রগম্যান বানিয়েছিল।<sup>12</sup> এক সময় ডুবুরি পানির নিচে বায়ু নেবার জন্য নল খাগড়া ব্যবহারের ব্যবস্থা করে তারা। পরবর্তীকালে এই প্রক্রিয়ার সাথে তারা লিমপেট মাইন যুক্ত করে। এগুলো বাঁশ কিংবা কলাগাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে ভাসিয়ে দিলে আপনা-আপনি তা লৌহ-পাতের দিকে ধাবিত হত।

১১. ডি, আর মানকেকার পাকিস্তান কাট টু সাইজ, দিল্লী, ১৯৭২, পৃষ্ঠা-১৩৩

নাশকতামূলক তৎপরতার তালিকাটা হচ্ছে ২৩১টি পুল, ১২২টি রেল লাইন এবং ৯০টি বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থাপনার ক্ষতিসাধন কিংবা ধ্বংস। লক্ষ্য সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে উদ্বীপ্তিও পুষ্ট না হলে এতটা করতে পারতো না। তাদের তেজশ্চিতার একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। নাশকতামূলক প্রচেষ্টা নেয়ার অভিযোগে ১৯৭১ সালের জুন মাসে রোহনপুর এলাকায় (বাজাশাহী জেলা) একটি বালককে ঘ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তাকে কোম্পানি সদর দফতরে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু কোন তথ্যই সে প্রকাশ করতে স্বীকৃত হল না। মুখ খোলানোর জন্যে যখন সব পদ্ধতিই বার্থ হল তখন ‘মেজর আর’ তার স্টেনগান বালকাটির বুকের ওপর চেপে ধরে বললো, ‘এই-ই তোমার জন্যে শেষ সুযোগ। যদি মুখ না খোলো, তাহলে বুলেট তোমার বুক চিরে বেরিয়ে যাবে।’ সে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে মাথা নুইয়ে মাটি ছুঁম করলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘আমি এখন মরতে প্রস্তুত। আমার রক্ত নিশ্চয়ই আমার পবিত্র ভূমির মুক্তিকে ভূরান্বিত করবে।’

যে বিদ্রোহীরা কৌশলগত দিক দিয়ে ঔৎকর্ষ্য অর্জন করেছে এবং লক্ষ্য সম্পর্কে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্বীপ্ত ও পুষ্ট, তাদেরকে উচ্ছেদ করা সেনাবাহিনীর জন্যে খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। তবু তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে। শুরুর দিকে প্রধান সড়ক দিয়েই সেনাদল পাঠানো হতো কিন্তু কয়েকটা বিক্ষারণের পর সৈন্যরা গ্রামাঞ্চলের ভেতর গিয়ে অপারেশন চালাতে থাকে। এতে তাদের উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়ায় তারা অতর্কিত হামলা ও গুপ্ত গুলি বর্ষণের মুখে পড়তো।

বর্ষাকালে সৈন্যরা দেশী নৌকায় চড়ে বিদ্রোহীদের ধাওয়া করতো। ‘খেয়াঘাটের মাঝিসুলভ’ প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও ভূমির গঠন প্রণালীর জন্যে তাদেরকে আয়ত্তে আনা গেল না। কোন কোন সময় নিজেদের নৌকা ডুবে যায় কিংবা বেদখল হয়ে যায় বিদ্রোহীদের পাস্টা আঘাতে। এরপর আমরা কাদামাটির মধ্যে দিয়ে হেঁটে রণধনি তুললাম শুধুমাত্র পোকা-মাকড় এবং জঁোক-দংশিত হরার জন্য। সমতল ভূমি থেকে আগত লোকদের জন্য জঁোক হয়রানিমূলক জলজ প্রাণীই ছিল। শহীদ নামের এক লেফটেন্যান্টকে দেখেছিলাম। তার পায়ের কয়েক জায়গায় ছিল জঁোকের দংশন। যুদ্ধের পরেও তাকে এই ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয়েছে।

অপারেশন চলার সময় কিছু সৈন্য লুট, হত্যা ও ধর্ষণের মত লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হয়। ধর্ষণের নয়টি মামলা সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ হয় এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তিবিধান করা হয় কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়েই যায়। এ ধরনের ঘটনা ঠিক কতগুলো ঘটেছিল, তা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যদি একটি ধর্ষণের মতো অপকর্ম করে, তবে তা সমগ্র সেনাবাহিনীর ভাল কাজ ধ্বংস করতে যথেষ্ট।

এই ধরনের বৃশ্চিন্ময় কাহিনী স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে বাঙালি জনগণ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। আগেই তারা আমাদের পছন্দ করতো না। এখন তারা দারুণভাবে ঘৃণা করতে লাগলো। এই ধারাকে রোধ করতে কিংবা ঘৃণা হ্রাসের জন্যে কোনই প্রচেষ্টা নেয়া হলো না। অতএব, বাঙালিদের ব্যাপক সহযোগিতার কোন প্রশংসন আসতে পারে না। সেই সব ব্যক্তিরাই আমাদের হাতে হাত মিলালো,—যারা ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে তাদের

সব কিছুরই বুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল।

এই দেশ প্রেমিকদের দু'টি গ্রন্থে সংগঠিত করা হয়। বয়স্ক ও নামীরা 'শান্তি কমিটি' গঠন করলো। আর যারা তরুণ ও কর্মক্ষম দেহের অধিকারী—তাদেরকে 'রাজাকার বাহিনী'তে (স্বেচ্ছাসেবক) রিক্রুট করা হল। শান্তি কমিটি ঢাকাসহ গ্রামাঞ্চলেও গঠিত হল। তারা সেনাবাহিনী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র হিসেবে কাজে নামলো। অন্যদিকে এরা বিদ্রোহীদের আক্রমণে পড়লো। এদের ২৫০ জনকে হত্যা, জখম কিংবা অপহরণ করা হয়।

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ধারণাকে তুলে ধরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজাকারের সংখ্যা বাড়নো হল। এক লাখের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এই জনশক্তি প্রায় ৫০ হাজারে উন্নীত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল জেনারেল নিয়াজির কাছে অভিযোগ করেন যে, জামায়াতে ইসলামের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। এরপর জেনারেল আমাকে তার অফিসে ডেকে নেন এবং বলেন, 'আজ থেকে তুমি রাজাকারদের 'আল-বদর' ও 'আল-শামস' নামে অভিহিত করবে। এ থেকে এই ধারণা দেয়া যাবে যে, তারা কোন একক পার্টির লোক নয়।' আমি আদেশ মান্য করলাম।

'আল-বদর' ও 'আল-শামস' গ্রন্থের লোকজন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ছিল। তারা সেনাবাহিনীকে সাহায্যের ব্যাপারে ছিল আন্তরিক। তারা কাজ করে প্রচুর। দুর্ভেগও সীমাহীন। এদের প্রায় পাঁচ হাজারকে হয় নিজে অথবা এদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের মুক্তিবাহিনীর হাতে লাঞ্ছনা পোহাতে হয়েছে সহযোগিতার অপরাধে। তাদের কারো কারো মধ্যে ত্যাগের যে চেতনা পরিলক্ষিত হয়, তা বিশেষ শ্রেষ্ঠতম সৈন্যদের সাথে তুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ, নবাবগঞ্জ থানার বিদ্রোহীদের একটি গোপন আস্তানা উচ্ছেদকরণ অভিযানে একটি সেনা দলের পথ প্রদর্শক হয়ে যায় গালিমপুর থেকে আসা এক রাজাকার। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সে দেখতে পায়, তার তিন পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে। কন্যা অপহৃত। তার এই ক্ষতি সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানের প্রতি তার আনুগত্যকেই প্রতিপন্থ করে মাত্র। আরেকজন রাজাকার গোমস্তাপুরের (রাজশাহী) রাস্তার একটি পুলে প্রহরারত অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে। বিদ্রোহীরা তাকে দিয়ে 'জয়বাংলা' বলানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু বেয়নেটের আঘাতে মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত সে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শোগান দেয়।

ট্রেইনিং ও অন্তর্শস্ত্রের দিক দিয়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে রাজাকারদের কোন তুলনাই চলতো না। রাজাকারদের ছিল দুই থেকে চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ অন্যদিকে আট সপ্তাহের এক প্রচণ্ড প্রশিক্ষণ চক্রের মধ্যে দিয়ে এসেছে মুক্তিবাহিনী। পূর্বোক্তদের সেকেলে ৩০৩ রাইফেলে সজ্জিত করা হয় আর শেষোক্তরা স্বয়ংক্রিয়সহ আধুনিক অস্ত্রে ছিল সজ্জিত। যতক্ষণ রাজাকাররা সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিযুক্ত থাকতো ততক্ষণ শক্তি হিসেবে তারা বিবেচিত হত। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে তাদের ওপর নির্ভর করা যেতো না।

বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণের চাপ নিয়মিত বাহিনীকে সহ্য করতে হত। বীরত্বের সাথে

তারা যাবতীয় প্রতিকুলতাকে মেনে নেয়। শুধুমাত্র হতাহতের সংখ্যা দিয়ে তাদের দুর্দশা মাপা যাবে না। মানসিক দিক দিয়েও গভীরতর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সৈন্যদের নেতৃত্ব মনোবল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিহস্ত করে যে বিষয়টি, তা হলো, আহতদের সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে সরিয়ে নেয়া যেতো না কিংবা মৃতদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো যেতো না। আহতরা সীমান্ত চৌকিতে হেলিকপ্টারে তুলে নেবার আশায় দিনের পর দিন ধরে পড়ে থাকতো। কেননা, সীমান্ত চৌকির সাথে সংযোগ রক্ষাকারী সড়ক সাধারণত মাইন কটকিত ছিল এবং গুলিবর্ষণের মুখোমুখি হতে হতো। হেলিকপ্টারও মিলতো না যতক্ষণ না রেজিমেন্টাল মেডিকেল অফিসার (আর এম ও) সুপারিশ করতেন যে, যথম আকাশ পথে পরিবহণের মত গুরুতর। অন্যদিকে আর এম ও আহত ব্যক্তির কাছে সহসা আসতে পারতেন না। কেননা, পশ্চাত্ভাগে কয়েক কিলোমিটার দূরে ব্যাটালিয়ন সদর দফতরে তিনি অবস্থান করতেন। যদি সড়ক পথে ওঁৎ পাতা আক্রমণ কিংবা মাইন বিস্ফোরণের আশংকায় আহতকে সরিয়ে না নেয়া যেতো তাহলে ডাক্তারও আউট পোস্ট-এ যাবেন কী ভাবে।

কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি কোন রকমে ঢাকার কম্বাইন মিলিটারি হাসপাতালে পৌছাতে সক্ষম হয়। একজন তার দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়েছিল। কয়েকজনের অঙ্গচেদ ঘটে। আগুনে পুড়ে কয়েকজনের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যায়। কয়েকজন টিরদিনের মত অক্ষ কিংবা বধির হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশই সেরে উঠেছিল, কিন্তু সারা জীবনের জন্যে পঙ্খুকে বরণ করে নিতে হয়। অনেকেই সামান্য আহত অবস্থায় কিংবা পায়ে ঘা, দৃষ্টিত ছাঁক ও জঁকে দংশনজনিত ক্ষত নিয়ে মাঠে ময়দানে কর্তব্য পালন করে গেছে। কয়েক মাস ধরে তারা জানতো না বিশ্রাম, স্বষ্টি কিংবা বিনোদন কাকে বলে।

মৃতদের বেলায় প্রথম দিকে আকাশ পথে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু জুলাই-আগস্ট মাসে সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ‘অথু আত্মক সৃষ্টি’র ভয়ে মরদেহ পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফকে জনমনে বিরুপ সৃষ্টিকারী এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। শোনা গেছে, তিনি এই বিষয়ে নির্বোধের মত মন্তব্য করেন, ‘মৃত্রা পশ্চিমে এবং পূর্বে সমভাবেই অগ্রয়োজনীয়।’

আত্মীয়-স্বজনরা চাইতো যে, মৃতদের পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের বাড়িঘরে নিয়ে যাওয়া হোক। ৩১ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসারের কাছে লিখিত এক অফিসারের বোনের লেখা চিঠির কথা আমার মনে পড়ে। ওই চিঠির এক জায়গায় সে লেখে, ‘আপনি যখন করাচি ছেড়ে যান তখন আমি আমার সুদর্শন ভাইকে আপনার হাতে তুলে দেই। একই চেহারায় তাকে যদি ফিরিয়ে না আনতে পারেন তাহলে তার মরদেহ আনতে যেন ভুলবেন না।’ সে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় তার ভাইকে আর দেখতে পায়নি।

## রাজনীতি—দেশে এবং বিদেশে

২৫ মার্চ হামলার আদেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক ছুটিতে গেলেন। স্পষ্টতই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং তার সৈন্যরা ঘাম, রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে যে সময় তৈরি করে, তার কোন সুযোগই নেন না।

ইয়াহিয়ার এই নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে কিছু ব্যক্তি আগাম কিছু ব্যাখ্যা দেন। এর মধ্যে কিছু আবার অনুমানসন্ধি। প্রফেসর জি ডার্লিং চৌধুরী বলেন, ‘এই কয়েক মাসে ইয়াহিয়াকে ভাবলেশহীন দেখাতো এবং মনে হতো, আমার সাথে তিনি কথা বলতে অক্ষম।’ তিনি এই ধারণা দিচ্ছেন যে, মার্জিত মনের মানুষ ইয়াহিয়া খান তার সৈন্যদের বৰ্বরতায় মর্মান্তিকভাবে আঘাত পেয়েছেন এবং কীভাবে নিজেকে ক্ষমা করবেন, তা জানতেন না। অন্যদিকে ইয়াহিয়ার স্টাফের একজন জেনারেল আমাকে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আসার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এবং একই উদ্দেশ্যে করাচিতেও আসেন। কিন্তু ‘সেই কুকুরীটার সাথে জড়িয়ে পড়েন....(স্পষ্টতই সেই মেয়েলোকেদের একজন,—যাদের সঙ্গে তিনি প্রায়শই অবসরযাপন করতেন)। ইয়াহিয়া কোটারির একজন কট্টরপক্ষী। অবশ্য আরেকটি কারণ দেখিয়েছেন। ঢাকা পরিদর্শনে এসে তিনি উচ্চকাঞ্চে বলেন, ‘জুয়াড়ি’দের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে না—যতক্ষণ না তাদেরকে ঠিকমত শায়েস্তা করা হচ্ছে।’ ইয়াহিয়া নিজেই একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, ‘সর্বদাই আমি মনস্ত করি যে, আমি ঢাকায় যাবো কিন্তু আমার কর্মচারীরা আমাকে বলে আমার ঢাকায় গিয়ে কোন কাজে দেবে না।’

পূর্ব পাকিস্তানে না এসেও ইয়াহিয়া দ্রুত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। আট মাসব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ চলাকালে তিনি দু'টো সিদ্ধান্ত নেন। একটি গভর্নর টিক্কা খানের অপসারণ এবং অপরটি বিদ্রোহীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। বিভিন্ন বন্ধুমত্ত্বের অনবরত পরামর্শে তিনি তার এই অগাধিকারমূলক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

মনে করা হয়, প্রাথমিক স্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রদেশের গভর্নর পদটি গ্রহণের জন্য মি. নুরুল আমিনের কাছে প্রস্তাৱ পাঠান। তিনি একজন বৰ্ষীয়ান বাঙ্গলি এম এন এ এবং প্রদেশের একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর পছন্দ করা হয় ডাক্তার মালিককে। তিনিও পূর্ব পাকিস্তানের একজন বৰ্ষীয়ান ব্যক্তিত্ব। বয়স ৭৪। শিক্ষাগত দিক দিয়ে তিনি একজন দস্ত চিকিৎসক। কর্মক্ষেত্রে একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ। তিনি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন।

প্রস্তাৱ দেয়া হলো, সেনা কমান্ডার অথবা আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জেনারেল টিক্কা খানকে ঢাকায় রাখা হোক। জেনারেল ফরমান প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন

১. জি ডার্লিং চৌধুরী দি লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, পৃষ্ঠা-১৯১

যে, দু'টি বিভাগকে এক করে জেনারেল টিক্কা খানের অধীনে দেয়া হোক এবং জেনারেল নিয়াজিকে ফিরিয়ে নেয়া হোক। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের অধাধিকার রয়েছে।

নিজের অপসারণের ব্যাপারে জেনারেল টিক্কা খান মোটেই খুশী ছিলেন না ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর তার সম্মানে দেয়া এক বিদায়ী নৈশভোজে তিনি আমাদের সবার সামনে বলেন ‘পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমাকে ৪ মার্চ দ্রুত রাওয়ালপিণ্ডিতে ডেকে আনা হয়। আমাকে হঠাত করেই এখন ডা. মালিকের হাতে দায়িত্বভার তুলে দিতে বলা হলো। আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না। কেননা, প্রেসিডেন্ট একাই সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমার ব্যাপারে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, মধ্য দ্রোতের ভেতর আপনাদের রেখে যেতে হচ্ছে বলে আমি দৃঢ়থিত। আমার ওপর যে কাজের ভার ন্যস্ত করা হয়, সেটা শেষ করে যাওয়াটাই ছিল আমার কাছে অধিকরণ পছন্দনীয়। যা হোক, সাহস হারাবেন না কখনো; আপনারা এখন একজন অভিজ্ঞ কমান্ডার (নিয়াজি) পেয়েছেন। তিনি আপনাদের প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশনা দেবেন। কিন্তু একটা কথা সর্বদাই মনে রাখবেন, তাহলো, কদাপিও মুঠি আলগা করবেন না। শক্তভাবে ঢাকনা চেপে রাখেন। নইলে আপনারা জীবন দুর্দশার মধ্যে নিপত্তি হবেন.....।’

পরদিন তাকে বিদায় জানাবার জন্যে বিমান বন্দরে উপস্থিত হলাম। কয়েকজন বেসামরিক কর্মকর্তাও হাজির ছিলেন সেখানে। ছ'মাস আগে এই বিমান বন্দরে আশা এবং আস্থায় দীপ্যমান প্রাণবন্ত জেনারেলকে বিমান থেকে নামতে দেখেছিলাম; সেদিন তাকে আর খুঁজে পেলাম না। এখন তার মানসিক অবস্থা গভীর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন।

৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় নতুন গভর্নর শপথ গ্রহণ করলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, নামকরা বেসামরিক কর্মকর্তা, বিদেশী দূতাবাসগুলির সদস্যরা এবং কয়েকজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ যেমন সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী ও মোনেম খান। অনুষ্ঠান চলাকালে আমি সামনের দিকে ঝুকে পড়া দেহের, অস্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এবং ঝুলে পড়া চোয়ালের গভর্নরকে দেখেছিলাম। দেখছিলাম সেই ব্যক্তিকে,—যিনি টিক্কা খানের মতো লোহমানব-এর জুতার ভেতর পা ঢোকাতে যাচ্ছেন।

ডাক্তার মালিকের ক্ষমতা গ্রহণে বাহ্যিক শহরের উত্তেজনা হাস করে। বাঙালিরা তাকে বিশেষ পছন্দ করতো না। কিন্তু পঞ্চিম পাকিস্তান যে কোন জেনারেলের চেয়ে গ্রাহ্য ছিল। নতুন গভর্নর শাস্ত করনের প্রতীক হিসেবে মাজার জেয়ারতে বেরোন। জিয়ারত করেন এইচ এস সোহরাওয়াদী, ফজলুল হক ও খাজা নাজিমুদ্দিনের মাজার। শহরের বৃহত্তম মসজিদ বায়তুল মোকাররমে শুক্রবারে নামাজও পড়লেন।

অবাঙালিরা বিশেষ করে বিহারিয়া টিক্কা খানের বিদায়ে নিজেদেরকে বিপন্ন মনে করলো। তারা ভাবলো, ঢাকায় একজন দুর্বল গভর্নরের দরবন বিদ্রোহীরা তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে এবং সহায়-সম্পত্তির অপরিমেয় ক্ষতি করবে। ৪ সেপ্টেম্বর একজন বিহারি সাংবাদিক তার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে আমাকে টেলিফোন করেন। আমি তাকে বেসামরিক সরকারের সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেই। সে করুণ কষ্টে বললো, ‘আমাদের জন্য কোন বেসামরিক সরকার নেই। আমাদের গভর্নর পঞ্চিম পাকিস্তানে

চলে গেছেন।'

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, সাধারণ ক্ষমা,—তা ঘোষিত হলো ৪ সেপ্টেম্বর। সাধারণ ক্ষমায় সমস্ত দুষ্কৃতীদের ক্ষমা করা হয় এবং সব কারাবন্দিদের মুক্তির ঘোষণা সংযোজিত হয়। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে চার্জশৈট দেয়া হয়েছিল তারা এর আওতায় এলো না। সিদ্ধান্তটি যদিও সদিচ্ছা-প্রণোদিত ছিল; অকার্যকর প্রমাণিত হলো। কেননা, এটা অত্যন্ত দেরিতে নেয়া হয়। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা সংগঠিত হয়ে যায়। ভারত প্রশিক্ষণ দেয় এবং মতাদর্শগত দিক দিয়ে পুষ্ট করে। এপ্রিলের গোড়ার দিক পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের ৯০ জন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। তারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তার গ্যারান্টির ভিত্তিতে আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে চান। অবশ্যে তারা ভারতে চলে যান 'মুক্তিযুদ্ধ'র লড়াইকে সহায়তা দেয়ার জন্য। গেরিলা যুদ্ধের সাফল্য এবং মুজিবের মুক্তির গুজব বিদ্রোহীদের কাছে সাধারণ ক্ষমার প্রস্তাব অহঙ্কারণ করে তোলে।

সাধারণ ক্ষমতার অবদান হলো দু'শ কারাবন্দির মুক্তি। এর মধ্যে জয়দেবপুর বন্দি শিবির থেকে আমার উপস্থিতিতেই একশ' মোলজনকে মুক্তি দেয়া হয়। অন্যদিকে আরো আটজনকে মুক্তি দেয়া হয় ঢাকা থেকে। অন্যরা ছাড়া পেল মফস্বল শহরগুলো থেকে। আন্তঃসার্ভিস স্ক্রীনিং কমিটি (আইএসএসসি) যাচাই-বাচাই করে 'শ্বেত' (ক্ষতিকারক নয়) ঘোষণা করে। আরো ৮৭ জন বন্দি,— যাদেরকে 'ধূসর' (সন্দেহজনক) শ্রেণীর তালিক য লিপিবদ্ধ করা হয়— তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো।

আমার জানা মতে, মুক্তিবাহিনীর আসল কোন সদস্য সাধারণ ক্ষমার টোপে আকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসেনি। মূলত তারা এই সুযোগকে বিক্ষেপক বন্ধ, যেমন, মাইন এবং গ্রেনেড পাচার বৃন্দিতে ব্যবহার করে। সীমান্ত বরাবর প্রতিষ্ঠিত অভ্যর্থনা ক্যাম্পগুলোতে ছিটে ফোটাভাবে কিছু শরণার্থীর আগমন ঘটে। অন্যদিকে সাধারণ ক্ষমার এই সুযোগ নিয়ে নাশকতামূলক কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা জোয়ারের পান্নির মত অননুমোদিত পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। তারা খালি হাতে আসতো এবং পূর্ব পাকিস্তানের কোন নির্দিষ্ট স্থানে তাদের জন্য রাখা অন্তর্ভুক্ত এবং বিক্ষেপক সংগ্রহ করতো।

বাঙালি এই ভেবে আশাবাদী হয়ে ওঠে যে, সাধারণ ক্ষমার আওতা মুজিবুর রহমানের প্রতিও বিস্তৃত হবে। এই সময় ব্যাপক গুজব ছাড়িয়ে পড়ে, বিশ্বের কয়েকটি প্রভাবশালী রাজধানী থেকে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে মুজিবের মামলা প্রত্যাহার করে মুক্তি দেবার জন্যে। ইয়াহিয়ার আস্থাভাজন এক জেনারেল রাওয়ালপিণ্ডি থেকে আসেন এবং গুজব সম্পর্কে বিশ্বাসজনক মন্তব্য করেন। বলেন, 'মুজিবকে শারীরিকভাবে শেষ করার চেয়ে রাজনৈতিকভাবে শেষ করা শ্রেয়। কেননা, জীবন্ত মুজিব থেকে মৃত মুজিব অনেক বেশি বিপজ্জনক।' তিনি আরো জানান, মুজিব একটি আনুগত্যের অঙ্গীকারপত্রে সই করতে এবং যুক্ত পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেন, 'তুমি কি মনে কর না, এটা তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের পালকে হাওয়া বিহীন করবে?' আমি বললাম, 'প্রথমত মুজিবের ভাগ্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, একবার যদি মুজিব ছাড়া পান এবং কোন না কোন অচিলায় তিনি যে ভিন্ন চেহারা দেখাবেন না, তার নিশ্চয়তা কোথায়?' জেনারেল আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বলেন, 'ওহ, আমি একটি অনুমানসন্দৰ্ভ নিয়াজি-৮

পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম মাত্র।'

কিন্তু এটা মোটেই অনুমান-নির্ভর পরিস্থিতি ছিল না। একটি বঙ্গ রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন ধারণা করা হয়, ইয়াহিয়া একটি সমৃদ্ধশালী প্রতিবেশী দেশকে আশ্বাস দেন যে, মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। কিন্তু তার মুক্তির দিনক্ষণের বিষয়টি অবশ্যই তার (ইয়াহিয়া) ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

১৯৭১ সালের অক্টোবরে একজন জার্মান সাংবাদিক ঢাকায় আসেন। এর আগে তিনি লারকানায় গিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আমাকে বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। এবং ভুট্টো তাকে এই ধারণা দিয়েছেন, 'যদি তিনি ক্ষমতায় আসেন তাহলে তিনি মুজিবকে মুক্তি দেবেন।' কেননা, এই বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ নন।

সাবস্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে নতুন ব্যবস্থাধীনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদের ৭৮টি আওয়ামী নীগের খালি আসন পূরণের জন্যে উপনির্বাচনের আদেশ দেয়া হয়। মেজর জেনারেল ফরমান আলীকে এই দায়িত্বে নিয়োগ করা হলো। হামলার (ক্রাকডাউন) পর থেকে সংকটময় পরিস্থিতিতে যেসব দক্ষিণপাঞ্চী রাজনীতিবিদ সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেন তাদেরকে তিনি পুরুষ্কৃত করতে চাইছিলেন। আসন ছিল অল্প কিন্তু আকাঙ্ক্ষী ছিল প্রচুর। তিনি তাই দক্ষিণপাঞ্চী সকলকে একসঙ্গে মিলে প্রার্থীদের একটি একক তালিকা প্রণয়ন করতে বলেন। তাদের নিজস্ব নিলাম ডাক ছিল এই রকম পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ৪৬; জামায়াতে ইসলামী ৪৪; কাউন্সিল মুসলিম লীগ ২৬; কনভেশন মুসলিম লীগ ২১ এবং নেজামে ইসলাম পার্টি ১৭। ফরমান তখন সকলকে সন্তুষ্ট করার জন্যে একটি ফরমূলা বের করার প্রচেষ্টা নেন অবশ্য প্রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি মনে স্থান দিয়েই। প্রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষা ছিল : মি. নূরুল আমিনকে যথেষ্ট পরিমাণ আসন দিতে হবে যাতে তিনি কেন্দ্রে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে পারেন।

যখন ফরমান তালিকা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে ফেললেন তখন জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে একটি নতুন আদেশ পান। তিনি বলেন, 'কাইয়ুম লীগকে ২১টি এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টিকে ১৮টি আসন দিতে হবে।' 'তাহলে দক্ষিণপাঞ্চাদের আমি কীভাবে স্থান দেবো?' 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে পিপিপিকে ১৩টি দাও।' পরবর্তীকালে আমি জানতে পাই, প্রেসিডেন্ট তিনজন রাজনীতিবিদকে নিয়ে খেলছিলেন এবং তিনজনকেই প্রধানমন্ত্রিত্বের টোপ দেখাচ্ছিলেন। এরা তিনজন হলেন নূরুল আমিন, কাইয়ুম এবং ভুট্টো। আমি জানি না, রাওয়ালপিণ্ডিতে এই খেলা কেমন জয়েছিল। তবে ঢাকার ব্যাপারে, উপনির্বাচন ছিল একটি প্রতারণা মাত্র। কার্যত জেনারেল ফরমানই আসানগুলো ভাগ করে দেন।

একজন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল ঢাকায় আসেন উপনির্বাচনে তার পার্টির সম্ভাবনা ধাচাইয়ের জন্যে। ১ অক্টোবর বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে একজন সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। উপনির্বাচন সম্পর্কে তিনি আমার মতামত জানতে চাইলে বলি, 'আমি বলতে চাই যে, দেশের ভেতরে গিয়ে নিজের চেখে

মাধারণ মানুষের দুর্দশাহস্ত অবস্থা দেখে আসুন। উপনির্বাচনের ব্যাপারে মানুষ মোটেই আগ্রহী নয়, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নিয়েই তারা উদ্বিগ্ন।’ এ কথা একটি দীর্ঘ নির্ভরের সূত্রপাত ঘটালো। তিনি বললেন, ‘তুমি যা বললো, সমস্যাটি যদি এতই জটিল হয় তাহলে তোমার মতে কে সেই ব্যক্তি,—যিনি এই পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারেন?’ নিশ্চয় এটা জেনারেল, এয়ার মার্শাল এবং ফিল্ড মার্শালদের নাগালের বাইরে। এই মুহূর্তে দেশের জন্য একজন জাতীয় পর্যায়ের নেতার আবশ্যক,’ আমি বললাম। তিনি বললেন, ‘আমার মনে হয়, মুজিবেই হচ্ছে এর জবাব। তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া উচিত কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।’ কিন্তু তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক। সব কিছুর জন্যে তিনিই দায়ী,’ আমি আপত্তি তুলে বললাম। যদি তোমার সেনাবাহিনী হত্যকারীদের ক্ষমা (সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে) করতে পারে তাহলে মুজিবের মুক্তিকেও মেনে নিতে পারবে—যিনি নিজ হাতে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেননি। আমি তোমাকে বলছি, পশ্চিম পাকিস্তান তার কারামুক্তিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।’ পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিজ দলের জন্যে কোন প্রতিনিধিত্ব নাড়ের সম্ভাবনা না দেখে তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে গেলেন।

যখন অন্যান্য রাজনীতিকরা পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচনে ভাগ পাবার জন্যে লড়াই করছেন সে সময় ভুট্টো ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে ‘জনপ্রতিনিধিদের’ হাতে সরাসরি ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। বর্তমান মারাত্মক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই দাবিকে স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হলো। কিন্তু যারা সামরিক জাতার নৈতিক দেউলিয়াত্ত্বের কথা জানতেন তারা সরকারের একটি দ্রুত পরিবর্তন কামনা করছিলেন, যাতে এই ভ্যানক পরিস্থিতিতে একটা ভালো কিছু করা যেতে পারে। কেননা, ইয়াহিয়া এবং তার সহকর্মীদের বোধের যথেষ্ট প্রকাশ ঘটে গেছে।

আমরা সম্ভাবনার আশা দেখতে পেলাম যখন জানতে পারলাম যে, প্রেসিডেন্ট জেড এ ভুট্টোর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা জানতাম, পরারম্পরাগতী থাকাকালে ভুট্টোই ছিলেন চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্ব গড়ে তোলার মুখ্য স্থপতি এবং আশা করলাম, যেভাবে হোক তিনি বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। আট সদস্যের প্রতিনিধিদলে পিএএফ প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান ও চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসানের অন্তর্ভুক্তি এটাই স্পষ্ট করলো যে, চীনের কাছে সামরিক সাহায্য চাওয়া হবে।

প্রতিনিধিদল নভেম্বরের গোড়ার দিকে পিকিং সফরে গেল এবং চীন নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলো। সফরকালে ভুট্টো ঘোষণা করলেন, ‘আলোচনার ফলাফল হবে আগ্রাসন রোধী।’<sup>১</sup>

এ ঘোষণা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে কোন আগ্রাসনের ঘটনায় চীনের সাহায্য প্রাপ্তির প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পূর্বেকার ঘোষণাকে নিশ্চিত করলো। এছাড়া খবরের কাগজে প্রকাশিত চীন ও পাকিস্তান নেতৃত্বের দেয়া বিবৃতি যে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাসপ্রবণ করে তোলে যে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে চীন সাহায্য আসছে। আমার আশাবাদকে নিশ্চিত করার

১. দি পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিণ্ডি, ৭ নভেম্বর, ১৯৭১

লক্ষ্য ভুট্টোর প্রতিনিধিদলের এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি বলেন, 'হ্যা, চীনারা আমাদের মহান বন্ধু। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মন জয় করতে তারা আমাদের পরামর্শ দিয়েছে।'

ওয়াশিংটনকে জিজেস করা হলো, জানতে চাওয়া হলো, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫০ সালে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বাধ্যতামূলক শর্তসমূহ পালনে শুদ্ধাবান হবে কি না। কিন্তু কোন নিশ্চিত সাহায্যের আশ্বাসের বদলে সেখানেও আমরা একই রকমের পরামর্শ লাভ করি। 'নিম্নন ও চীন নেতাদের কাছে লেখা চিঠিপত্র ইয়াহিয়া আমাকে দেখান। তারা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আশা করছিলেন যে, বাংলাদের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌছানো সম্ভব হবে।'<sup>৩</sup>

পাকিস্তানের তুলনায় ভারত অনেক ভাল কৃটনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। সে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের হমকিকে প্রশমিত করার জন্যে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে চললো। চুক্তিতে ৫ ও ৯ নম্বর ধারা সংযোজিত করার আহ্বান জানালো। এই দুটি ধারায় স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ যদি 'কোন পক্ষের আগ্রাসনের শিকার কিংবা হমকির সম্মুখীন হয়'<sup>৪</sup> সেক্ষেত্রে একে অপরের সাথে পরামর্শের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করলো। ভারতীয় লেখকরা পরবর্তীকালে নিশ্চিত করেন যে, 'এই চুক্তির মধ্যে সামরিক বন্ধন ছিল।'

ফলত নয়াদিল্লী ও মঙ্গোর মধ্যে যাতায়াতের মাত্রা বেড়ে যায়। সোভিয়েত ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফেরুবিনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কৃটনৈতিক মিশন এবং চিফ অব এয়ার স্টাফের নেতৃত্বে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি সামরিক প্রতিনিধি দল পর পর ভারত সফরে আসে। চূড়ান্ত সফরটি করেন সোভিয়েত প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল প্রেচকো নিজেই। আরো খবর পাওয়া গেল যে, নতুন দিল্লীতে একটি ভারত-সোভিয়েত লিয়াজোঁ অফিস খোলা হয়েছে এবং সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ও পাইলটরা এই অফিসের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়েছেন।

নিজ পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে অথবা পাকিস্তান যাতে কোন পক্ষ থেকে সাহায্য না পায়, তা প্রশমিত করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী ২৪ অক্টোবর থেকে গুরুত্ববহু দেশ যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি ও ইংল্যান্ড সফরে বের হন।

বিশ্ব উদ্বেগের সঙ্গে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ সৃষ্টির ঝোঁক লক্ষ্য করতে থাকে কিন্তু মনে হলো বিপর্যাকে পরিহার করার ব্যাপারে অসমর্থ কিংবা কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ায় অনিচ্ছুক। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার ২৬তম বৈঠকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত পাকিস্তানি অভিযোগটি বিবেচনা করে এবং পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের উভয় দিকে পর্যবেক্ষক বসানোর প্রস্তাব দেয়। পাকিস্তান সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। কিন্তু ভারত অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করে। ভারত মূলত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার সম্ভাবনাময় যে কোন উদ্যোগকে নাকচ করে দেয়। সে তার 'শতাব্দীর সুযোগ'কে হাত ছাড়া করতে চাইলো না।

৩. জি. ডিলিউ. চৌধুরী দি লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, পৃষ্ঠা-১৯২

৪. হিন্দুস্তান টাইমস-এ ডি কে পালিতের নিবন্ধ, নতুনদিল্লী, ২০ অক্টোবর, ১৯৭১

## বিপর্যয়ের মুখোয়ুষি

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি যে শুধু অভ্যন্তরীণ কিংবা বিদেশী রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল, তা নয়। কোন রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই এর অবনতি ঘটতে থাকে যেন তা পূর্ব নির্ধারিত ধারাতে এগোচ্ছিল। ডা. মালিকের বেসামরিক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা কিংবা বিদেশে পাকিস্তানের সন্নির্বক্ত আবেদন—নিবেদনে পরিস্থিতির কোন তারতম্য ঘটলো না।

ঢাকার জীবন সাংস্থাতিক রকমের কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমন একটি দিন বাদ যায় না, যে দিন লুট, অগ্নি সংযোগ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কিংবা বোমাবাজির মত ঘটনা ঘটেনি। নমুনা স্বরূপ তেমন কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ২৩ অক্টোবর প্রকাশ্য দিবুলোকে প্রাক্তন গভর্নর আবদুল মোনেম খানকে তার বাড়িতে গুলি করে মারা হলো। কয়েকদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়া হয়। মাতিবিল বাণিজ্যিক এলাকায় বিস্ফোরক ভর্তি ছিনতাই করা একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এতে পাঁচজন মারা যায় এবং আহত হয় তের ব্যক্তি। পরদিন বিশাল স্টেট ব্যাংক ভবনে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এরপর গভর্নর হাউজের লাগোয়া ঢাকা ইম্প্রিভেন্ট ট্রাস্ট ভবনে স্থাপিত টেলিভিশন কেন্দ্রে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।

মানুষজন এসব ঘটনায় অভ্যন্তর হয়ে গেলো। কেননা এগুলো রোজকার ব্যাপার ছিল। এরপর বিদেশের মনোযোগ আকর্ষণে অসাধারণ কিছু অর্জনের জন্য বিদ্রোহীদের কিছু করতে হবে। তারা এটা অর্জন করলো হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের টয়লেট বিভাগ উড়িয়ে দিয়ে। এই বিস্ফোরণ ভবনের প্রধান অংশকে মাটির সাথে শুইয়ে দেয়। এ ক্ষতি মেরামত করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

১১ অক্টোবর বিদ্রোহীরা তাদের অপারেশনে নতুন বস্ত্র সংযোজন ঘটায়। এদিন তারা প্রথমবারের মতো ঢাকায় মর্টার ব্যবহার করলো। পিআইএ-এর রসুইখানার কাছাকাছি বিস্ফোরণের সেই শব্দ আমি নিজ কানে শুনি। ঘটনাটি ঘটে রাত ১টা ৪০ মিনিটে। বিমানবন্দরকে তাক করে অক্তের মত লক্ষ্যের প্রতি দু'টো গোলা নিষিণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু গোলা লক্ষ্যের কাছাকাছি পড়ে। বলাৰ অপেক্ষা রাখে না যে, এই ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে বিপর্যস্ত করে দিল। কেননা এই রকম ভীতি সংক্রমিত হয় যে, পরবর্তী সময়ে নিষিণ্ডিত গোলাটি লক্ষ্য বিচৃত না-ও হতে পারে।

মনে হলো, ঢাকার আশপাশ এলাকাও বিদ্রোহীতে ভয়ে গেছে। মূলত বাইরের এলাকা ছিল তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কারণ আমরা সাধারণত আমাদের অনুসন্ধান অপারেশন কেন্দ্রীভূত রেখেছিলাম শহর অভ্যন্তরে।

সিদ্ধিরগঞ্জের ঘটনাটি এই ধাঁচের। বিদ্রোহীরা সেখানকার প্রধান পাওয়ার হাউজের ক্ষতিসাধন করে এবং বহিযোগ্যোগ ক্যাবল কেটে দেয়। এই ক্ষতি মেরামতে কোন বাঙালি শ্রমিক ইচ্ছুক ছিল না। সুতরাং পচিম পাকিস্তান পানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দু'জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, একজন লাইন সুপারিনেন্টেন্ডেন্ট, একজন সহকারী ফোরম্যান ও একজন

ল্যাইনম্যানের একটি দলকে পাঠানো হয়। যখন তারা কর্মস্ক্ষেত্রে কাজ করছিল, সে সময় দিনের বেলায় ৩০ অষ্টোবর তাদের ওপর বিদ্রোহীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাঁচজনের সকলকেই হত্যা করা হয়। বিজয় স্মারক হিসেবে বিদ্রোহীরা বদর-ই-ইসলাম নামের একজন সহকারি ফৌরম্যানের লাশ সঙ্গে নিয়ে যায়। অন্য চারটি লাশ পরে খুঁজে বের করা হয়। ৩১ অষ্টোবর বিকেল পাঁচটায় পশ্চিম পাকিস্তানে লাশগুলো পাঠিয়ে দেয়া হয়।

চাকা এবং এর আশপাশ এলাকা থেকে অভ্যন্তরভাগে যাওয়ার সময় একজনের এই রকম মনে হতো যে, সে শক্তি এলাকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। সশন্ত ব্যক্তিগত রক্ষী ছাড়া চলাচল করা অসম্ভব ছিল। আবার এটা বিদ্রোহীদের জন্য প্রৱোচক হয়ে দাঁড়ায়। তারা গোপন অবস্থান থেকে সেনা দলের ওপর হামলা চালাতো অথবা তাদের চলাচলের রাস্তায় মাইন পুঁতে-রাখতো। যদি কেউ নিরাপদে তার গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারতো, তাহলে পিছনে ফেলে আসা সফরকে সে একটি দারুন সাফল্য বলে মনে করতো।

দ্রোহযুক্ত পরিস্থিতির দরুন মফস্বল এলাকার স্থানীয় কমান্ডারদের কোন বিরাম বা বিশ্রাম ছিল না। অন্তর্সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হতো। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারি সম্পত্তির রক্ষা, শিল্প-কারখানা চালু রাখা এবং সন্দেহজনক এলাকা উচ্ছেদকরণ তাদের দায়িত্বের মধ্যে অত্যর্ভুক্ত হয়ে গেল। সাধারণত এক প্লাটুন কিংবা এক কোম্পানি পর্যায়ে নিয়োজিত ছিল সেখানে। কিন্তু তাদের দায়িত্বাধীন এলাকা এত বিশাল ছিল যে, তারা আবার নিজেদেরকে ছেট ছেট দলে ভাগ করে। দল যত ক্ষুদ্র হতো বিদ্রোহীদের হাতে নিশ্চিহ্ন হবার বিপদ তত বাড়তো। তাদের শক্তি বর্ধনের জন্য কিছু রাজাকার, ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স-এর ইপিসিএএফ লোকজন, পশ্চিম পাকিস্তান রেজার্স কিংবা পুলিশকে তাদের সংগে দেয়া হয়। এই খাপছাড়া জনশক্তি একটি একক মিলিত যোদ্ধাবাহিনী হয়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু সংখ্যা সর্বদা নেতৃত্বক শক্তিতে পরিণত হত। অতএব, যখন কোন চৌকিতে লোকের সংখ্যা দশ না হয়ে ত্রিশ হতো তখন সেটাকে অধিকতর নিরাপদ এবং প্রতিরোধক্ষম বলে বিবেচনা করা হতো। কার্যত চৌকিগুলি পুরোপুরি নিরাপদ কিংবা সুরক্ষিত ছিল না। এর মধ্যে কিছু—বিশেষ করে যেগুলোতে আধা-সামরিক বাহিনী থাকতো, সেগুলো বিদ্রোহীদের জন্যে প্রলুক্তকর হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রায়শই তারা হামলা চালিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতো। এই হামলা সাধারণভাবে আত্মক্ষত করে তোলে সবাইকে। ফলে এদের ভেতর যারা ভীরু বা আনুগত্যাধীন, তারা বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখোযুক্তি না হয়ে চৌকি পরিত্যাগ করে সরে পড়তো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২৯ নভেম্বর নওয়াবগঞ্জ থানার ৩৯ জন রাজাকারের মধ্যে ৩২ জনই তাদের চৌকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। পরদিন বাকি সাতজনের ওপর বিদ্রোহীরা চেপে বসে এবং থানাটি শক্তিপঞ্চের হাতে চলে যায়। অন্যদিকে লোহাগঞ্জ-লেখক লোহজং কে ভুলক্ষমে লোহাগঞ্জ লিখেছেন অনুবাদক থানার ইন্টার সার্ভিসেস ক্লীনিং কমিটি (আইএসএসসি) পরীক্ষিত এবং পাশ করা সাতান্নজন বাঙালিকে নিয়োগ করা হয়। তাদেরকে সাধারণ ক্ষমার অধীনে মুক্তি দেয়া হয়। তাদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ এবং রেজার্স থেকে ৩০ জন রাইফেলধারীকে নিয়োগ করা হয়। ২৮ অষ্টোবর সাতান্নজন বাঙালির সবাই পালিয়ে যায়। পরের রাতে তারা আরো শক্তি বৃদ্ধি করে ফিরে আসে এবং ত্রিশজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে হত্যা করে। সাথে থানাটিও বিদ্রোহীদের

নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আরো কয়েকটি থানা একই ধরনের ভাগ্যবরণ করে থানাগুলোর অধিকাংশই ছিল নোয়াখালী, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলার।

সীমাত্তের কাছাকাছি গেলে যে কেউ অহরহ ভারতীয় কামানের শব্দ শুনতে পেতে কামানগুলো লাগাতারভাবে সীমাত্ত চৌকিগুলো এবং তার আশপাশ এলাকায় গোলাবর্ষণ করতো। এই চর্চা মূলত শুরু হয় জুন মাসের শেষাশেষ। সেস্টেম্বর এবং অক্টোবরে তীব্রতর হয় বিদ্রোহী তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে। প্রতিদিন আমাদের এলাকার ভেতর ৫শ' থেকে ২ হাজারের মতো গোলা নিষ্কেপ করা হতো। গোলাবর্ষণের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত, এটা ভারতীয় শক্রতামূলক নীতির 'নিয়ন্ত্রিত বিস্তার'-এর বাহ্য নমুনা। সে সীমাত্ত উন্নত রাখতে চাইছিল। দ্বিতীয়ত, সীমাত্ত এলাকায় অপারেশনরত বিদ্রোহীদের জন্য এটা টনিক হিসেব কাজ করে। তৃতীয়, এই কার্যধারা একটি কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে সহায় হয়। বিদ্রোহী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের জন্য কিছু অরক্ষিত সুবিধাজনক স্থান, কিছু উচু জায়গা ও ছিট মহল দখলে সাহায্য করে। তাদেরকে বিতাড়নের চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা অনিবার্যভাবে গোলার নাগালের মধ্যে পড়ি অথবা ওঁপাতা আক্রমণের শিকার হই এবং বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি বরণ করতে হয়। তারা ধীরে ধীরে কয়েকটি উচু জায়গা এবং বক্র স্থানগুলো টুকরে টুকরে দখল করে নেয়।

তথাপি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার ১২ অক্টোবরের রেডিও ভাষণে জাতির প্রতি এই অঙ্গীকার করলেন, 'আপনাদের বীর সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের পবিত্র মাটির প্রতি ইঞ্চি রক্ষায় এবং সংরক্ষণে পুরোপুরি প্রস্তুত।'<sup>১</sup> ইতিমধ্যে সীমাত্ত এলাকায় প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল জায়গা ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

জেনারেল নিয়াজি প্রেসিডেন্টের ঘোষণার সাথে অতিরঞ্জিত বিজয়ের দাবি জুড়ে দেয়া কর্তব্য বলে মনে করলেন। তিনি কয়েকবারই ঘোষণা করেন, যদি যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে লড়াই তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রসীমার মধ্যে নিয়ে যাবেন। তার চিংকৃত উন্টট কান্নিক আক্রমণ একবার ধাবিত হয় কলকাতার দিকে, আরেকবার আসামে। তার জনসংযোগ অফিসার হিসেবে তাকে আমি অনুরোধ জানাই দুর্ভাগ আশার কথা না তুলতে। এতে তিনি বলেন, 'তুমি কি জান না, ধাপ্তা আর চাতুরি হচ্ছে যুদ্ধের দেবদৃত?'

আদতে শক্রকে ধাপ্তা দেয়ার ব্যাপার ছিল না। তিনি কেবল নিজেই নিজেকে ধাপ্তা দিচ্ছিলেন। তার সঙ্গে আমার একান্ত সাক্ষাৎকারটির কথা মনে আছে। সেটা হয় তারই অফিসে, ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর। তিনি বলেন, 'তোমার বক্সুরা (বিদেশী সংবাদদাতারা) কী বলে?' তারা বলে যুদ্ধ ঘরের কোণে এসে গেছে।' 'ওফ। আমি এজন্য প্রস্তুত। আমার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন ৭০,০০০ সশস্ত্র লোক আছে আমার। ভূমিতে আমি দারুণ শক্তিশালী।' 'কিন্তু বিমান ও নৌ-সমর্থন আপনার অতি অল্প।' 'আমি বিমান ও নৌ-বাহিনী ছাড়াই যুদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছি।' 'তবু আমি মনে করি না যে, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং একই সাথে বহিরাক্রমণ ঘোকাবেলার জন্যে আপনার যথেষ্ট শক্তি আছে। আমার ভয় হয়।' 'কী নিয়ে ভয় হয় তোমার?' 'সমগ্র সীমাত্ত জুড়ে আমরা নিয়োজিত। শক্র দু'দিকে,—ভেতরে এবং বাইরে। আমাদের অবস্থা স্যান্ডউইচের ভেতর

১. দি পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিণ্ডি, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

শূন্যস্থান পূরণকারী বস্ত্রের মত। ওদেরকে যা করতে হবে তা হলো ওদের পছন্দমত স্থানে আমাদের প্রতিরক্ষাকে ভেদ সংযোগ স্থাপন করা। সেটাই আমাদের এই নিয়মিত নির্ধারিত কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।' 'তোমার ভীতি একদমই ভিত্তিহীন। মনে হচ্ছে তুমি সংখ্যা নিয়েই ভাবছো। কিন্তু যদে সংখ্যা নয়,— সেনাপতিত্তুই বিবেচ্য বিষয়। তুমি কী জান সেনাপতিত্তু কাকে বলে? এটা হচ্ছে সঠিক সংখ্যক সৈন্য, সঠিক জায়গায় এবং সঠিক সময়ে নিয়োগের নৈপুণ্য।'

ধাঙ্গা দেয়ার ব্যাপারটিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অথবা তার কমান্ডার নিয়াজির একক অধিকার ছিল না। যারা লাইনে থাকতো তারাও একই বিষয়ের প্রশ্ন দেয়। ডিভিশনাল সদর দফতর ও ব্রিগেড সদর দফতরে সফরকালে আমাকে সর্বদাই জেনারেল নিয়াজির সঙ্গী হতে হতো এবং প্রায় প্রত্যেকটি সামরিক ব্রিফিংয়ে উপস্থিত থাকতাম। একজন মেজর জেনারেল ও একজন ব্রিগেডিয়ার ছাড়া সব ডিভিশনাল কমান্ডার ও ব্রিগেড কমান্ডাররা জেনারেল নিয়াজিকে আশ্বাস দেন যে, অগ্রতুল সম্পদ এবং প্রচণ্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেত পারবেন। 'স্যার আমার সেক্টর নিয়ে ভাববেন না। সময় হাজির হলেই স্ক্রকে ধাক্কা মেরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো,'—এই ছিল সবগুলো ব্রিফিংয়ের সমস্বর এ থেকে ভিন্নতর কোন মন্তব্য পেশাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে আস্থার অভাবেরই ইঙ্গিত বহন করতো। ভবিষ্যৎ পদোন্নতির সন্তানাকে কেউই বিপদাপন্ন করতে চায়ন।

কমান্ডারদের এই ইচ্ছাকৃত আশাবাদের পাশে একেবারেই উল্লে ছিল সৈন্যদের অবস্থা। তাদের প্রশিক্ষণের পর্যায়, সমর উপকরণ এবং নৈতিক মনোবল ছিল নিম্নস্তরের। তারা দীর্ঘ আটমাস যাবৎ পরিস্থিতির কোন অহঙ্গতি দেখতে পাচ্ছে না। একটি প্রচলিত যুদ্ধের জন্যে প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় তাদের ছিল না। বিশ্রাম কী বিরাম, কয়েক মাস যাবৎ তাদের জানার ফুসরৎ ঘটেনি। তাদের মধ্যে অনেকেরই বুট ছিল না। মোজা কিংবা শোয়ার চৌকিও ছিল না। সবচেয়ে মন্দটি ব্লো, অপারেশনে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের অনেকেরই মনের দিক থেকে সায় ছিল না। তারা ভেবেছিল, যে বাঙালিরা হিন্দুদের সাথে হাত মিলিয়েছে তাদের সাথী মুসলমান হত্যা করার জন্যে, তাদের জন্যে জীবনদানের কোন কারণ থাকতে পারে না।

বলা হয়, অধিনায়কত্বের দুই-ত্রৈয়াংশ জানতো সৈন্যদের মনের ভেতর কি চলছে। কিন্তু সাধারণত আমাদের কমান্ডাররা এই গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি উপেক্ষা করেন। তারা তাদের অধীনস্থদের সংখ্যা ও রাইফেলের বাটেরই হিসেব নেন। যখন তাদের বলা হলো, আমরা বিদ্রোহী মোকাবেলা অপারেশনে ২৩৭ জন অফিসার, ১৩৬ জন জুনিয়র কমিশনড অফিসার এবং অন্যান্য স্তরের ৩,৫৫৯ জন সৈন্য হারিয়েছি তখন জীবিত ছিল যারা,— তাদেরকেই তারা গণনার মধ্যে আনতে অধিকতর পছন্দ করলো। তারা অনুধাবন তেমন করলোই না যে, তাদের অধিনায়কত্বাধীনে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা দৈহিক হতাহতের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি।

ফলে এ রকম নীচু নৈতিক মনোবলের কারণে সৈন্যরা টাইলদারিতে আক্রমণাত্মক ও যুদ্ধকালীন সংস্কর্ত্ত্ব, দুই-ই হারিয়ে ফেলে। সীমান্ত এলাকার প্রহরা সমান হারে শুখ হয়ে

পড়ে। একদল সৈন্য কখনও কখনও বের হতো তাদের দায়িত্বাধীন এলাকা পরিদর্শনে—সঙ্গাহতে এক বা দু'বার এবং ফিরে এসে রাতের জন্যে ঘুমিয়ে পড়তো। ১২ নভেম্বর নিয়মিত প্রহরার কাজে নিযুক্ত এ রকম একটি দল দেখতে পায় ধর্মদহ এলাকা (যশোর সেক্টরে সীমান্তের দেড় কিলোমিটার অভ্যন্তরে) ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১ম নাগা ব্যাটালিয়ন দখল করে বসে আছে। অনুপ্রবেশকরা গোপনে ৫নভেম্বর সীমান্তে পেরিয়ে আসে এবং এক সঙ্গাহ যাবৎ নির্বিম্বে ওই এলাকায় বসে থাকে। ১৩ নভেম্বর তাদেরকে বিতাড়িত করা হয় এবং ৪ জনকে বন্দি করা হয়। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের সঙ্গেই ছিল।

কুমিল্লার দক্ষিণে বিলোনিয়ার উচু এলাকায় গিয়ে আমরা একই রকম বিস্থিত হই। সেখানে আমরা আবিক্ষার করি, উচু এলাকার প্রায় অর্ধেক ১০ নভেম্বর থেকে বিদ্রোহী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা দখল করে বসে আছে। কয়েকদিন পর তাদের প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে ফেলার জন্যে রাতে আক্রমণ চালানো হয়। আক্রমণ সফল হলো। একই সঙ্গাহে ১৩ নভেম্বর বয়রা সীমান্তের (যশোর সেক্টর) কাছাকাছি শক্ত সৈন্যরা সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে আমাদের ভেতরে এসে ঢোকে আমাদের অঞ্জাতে তারা সেখানে এক সঙ্গাহ গেড়ে বসে থাকে। এ সময়ের মধ্যে ভারতীয়রা তাদের শক্তিকে পুরোপুরি দু' ব্যাটালিয়নে উন্নীত করে। ব্যাটালিয়ন দু'টি জমু ও কাশীর এবং ২ শিখ লাইট ব্যাটালিয়ন। আমরা তাদের উপস্থিতির সংবাদ নভেম্বরের ১৯ তারিখে পাই। স্থানীয় ব্রিগেডকে (যশোর) অনুপ্রবেশকদের বিতাড়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২২ এবং ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দু' কোম্পানির সৈন্যকে আক্রমণের আদেশ দেয়া হলো। আক্রমণ ব্যর্থ হলো। ক্ষয়ক্ষতি আমাদের প্রচুর হলো। পরে শক্তরা 'পাল্টা' আক্রমণ চালায়। আমাদের ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্যরা তাদের অন্ত ফেলে দিয়ে নিজেদের রক্ষাব্যুহ ছেড়ে পিছেয়ে আসে।

এক দিকে এ ঘটনা প্রমাণিত করলো যে, আমাদের সৈন্যরা টিকে থাকার ক্ষমতা হারিয়েছে অন্যদিকে শক্ত দৃঢ় সংকল্পবন্ধ। তাদেরকে বিতাড়নের জন্যে সত্যিকার অর্থে ভীষণ রকমের প্রচেষ্টার দরকার। ডিভিশন ডিভেশনাল সৈন্য যোগাড় করলো। ২১ পাঞ্জাব (আর এবং এস) ও ৬ পাঞ্জাবকে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত করা হলো। সংগঠিত করা হলো টাক্ষ ফোর্স 'আলফা' ও টাক্ষ ফোর্স 'ব্রাভেন'। প্রথমটি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইমতিয়াজ ওয়ারিক এবং শেষেরটি লেফটেন্যান্ট কর্নেল শরীফের অধিনায়কত্বে দেয়া হলো। তাদের সহায়তা দানের জন্যে এক ক্ষোয়াড়ন ট্যাংক ও ফিল্ড রেজিমেন্টের কামানও দেয়া হয়।

আক্রমণ শুরু হয় ২১ নভেম্বর সকাল ৬টায়। প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রগতি সূচিত হয়। যখন আক্রমণকারী বাহিনী ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগোতে আরম্ভ করে, তখন শক্ত ট্যাংক গোপন অবস্থান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। আমাদের জন্য এটা একটা বড় রকমের বিস্ময় ছিল। কেননা আমরা জানতাম যে, এলাকাটি ছিল 'ট্যাংকযুক্ত'। সীমান্তের ওপার থেকে শক্ত গোলন্দাজ যুদ্ধে যোগ দিল। আমরা পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাহায্য চাইলাম। দ্রুত তিনটি স্যাবর মাথার ওপর এসে হাজির হলো। ভারতীয় মিগ-এর মুখোমুখি হলো সেগুলো। আমরা দু'টো বিমান ও সবগুলো ট্যাংকই হারালাম। আক্রমণ পরিহার করতে হলো। শক্ত কিন্তু অবস্থান পরিত্যাগ করলো না। আগ বাড়ানোকে রোধ করার জন্য আমরা তাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করে রাখলাম। ৩ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও অব্যাহত

রইল। এটাকে একটি বড় ধরনের অর্জন বলে আমরা শিঙা ফুঁকতে লাগলাম যদি কোশলগত দিক দিয়ে আমরা শক্র হাতে খেলেছি। ডিভিশনের প্রধান শক্তিকে একটি 'ক্ষত' স্থান কেন্দ্রীভূত করাতে, শক্র জন্যে সেটা ডিভিশনের যে কোন দুর্বল প্রতিরক্ষামূলক কেন্দ্রের বেষ্টনী ভঙ্গে বেরিয়ে যাবার বিরাট সুযোগ এনে দিল। সৌভাগ্যবশত তখনো শক্র লক্ষ্য ছিল সীমিত।

প্রকাশ্যে ২১ নভেম্বরের যুদ্ধকে আমরা মিগ, সঁজোয়া বহর ও গোলন্দাজ সহায়তায় শক্র আক্রমণ বলে চিহ্নিত করি। মূলত যে শক্ররা ১৩ নভেম্বর থেকে আমাদের এলাকা দখল করে ছিল, তাদেরকে বিতাড়নের পদক্ষেপ ছিল সেটা।

একই সপ্তাহে (২০-২৫ নভেম্বর) ভারত সিলেট এলাকার আটগ্যাম ও জকিগঞ্জ, দিনাজপুরের হিলি এবং রংপুর জেলার পঞ্চগড়ে আক্রমণ পরিচালিত করে। ভবিষ্যতের অপারেশনে স্প্রিং বোর্ড হিসেবে ব্যবহারে জন্য শক্র সীমান্ত এলাকায় কিছু সুবিধাজনক স্থান দখল করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমরা ভাসা গলায় চিকারাগুরু করে দিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। সিলেট ও রংপুর সেউরে হামলা প্রতিহত করার দায়িত্বে নিয়োজিত কিছু সৈন্য পিছু হটে আসতে বাধ্য হলো। যশোর সেউরে ঢাক্ষিণ্যায় ফোর্সকে তাদের অবস্থান পরিয়াগ করতে হয়। এমন কী তাদের অন্ত্র রান্না-বান্নার সরঞ্জামাদিও ফেলে আসতে হয়।

এ তিনটি ঘটনা জেনারেল নিয়াজিকে ক্ষেত্রী করে তোলে। আমরা উপস্থিতিতেই দোষীদের গালিগালাজ করেন এবং আদেশ দেন, 'শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষয়ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রত্যাহার চলবে না। এরপর জিওসি যদি অনুমতি দেন, একমাত্র সেক্ষেত্রেই প্রত্যাহার করা যাবে।' এই মৌখিক আদেশ পরবর্তীকালে লিখিতভাবে বহাল করা হল।

প্রায় প্রতিদিনই—২২ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেনারেল নিয়াজি সীমান্ত এলাকা সফর করে বেড়ান। সফরে আমি তার সঙ্গে থাকতাম। ২৭ নভেম্বর হিলি এলাকায় গেলে জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে একদল সাংবাদিকের দেখা হয়। হিলির যে এলাকায় ভারতীয় আক্রমণ পরিচালিত হয়, তিনি সেখানে তাদেরকে নিয়ে যান এবং আমাদের সীমান্তের ভেতর পড়ে থাকা একটি অকেজো ভারতীয় ট্যাংক দেখান। এই অনানুষ্ঠানিক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার চলে প্রায় আধ ঘটনা যাবৎ। শেষের দিকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার ধারণায় সর্বাত্মক যুদ্ধ কখন শুরু হচ্ছে?' মুরগি কাবাবের প্লেট থেকে মুখ তুলে তিনি বললেন, 'সর্বাত্মক যুদ্ধ ইতিমধ্যেই আমার জন্য শুরু হয়ে গেছে।' কেউই এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। কেননা, আমরা সবাই জানি, ভারত যদি তার যাবতীয় সামরিক শক্তি,—বিমান, সঁজোয়া বহর এবং গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে, জেনারেল নিয়াজি সেক্ষেত্রে কাবাবের প্লেট সামনে নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে রাস্কিতা করতে পারতেন না।

সাংবাদিকরা হিলির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলে জেনারেল ঢাকায় আসার জন্য হেলিকপ্টারে উঠলেন। শক্র জেট বিমান পথে বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে, এ ব্যাপারে এতটুকু ভীতিও তার মধ্যে দেখা গেল না। সঙ্গে নিলেন একজন যুবতী সাংবাদিককে। ফ্লাগ স্টাফ হাউসে গিয়ে তাকে একান্ত সাক্ষাৎকার দেবেন।

## পরাজয়ের জন্য সমাবেশ

জেনারেল নিয়াজির সর্বাত্মক যুদ্ধ লড়াই ঘোষণার সঙ্গে সৈন্য সমাবেশের পদ্ধতি ছিল অসংগতিপূর্ণ। ঘোষণাটি তিনি দেন নভেম্বরের শেষ দিকে। সৈন্যরা শুন্দ শুন্দ দলে সীমান্ত বরাবর তৎপর থাকলেও তাদের লক্ষ্য ছিল অনুপবেশ ও ভারতীয় আক্রমণ ঠেকানো। যুদ্ধ ভিন্ন ধরনের সৈন্য সমাবেশের একান্ত দাবি রাখে। সমাবেশের ক্ষেত্রে নিয়াজির বিপ্লবকে পরীক্ষা করার আগে যে অঞ্চল তাকে রক্ষা করতে হবে, সেটাকে বিবেচনায় আনার আবশ্যিকতা রয়েছে।

১৬০০ কিলোমিটার দূরত্ব পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করে রেখেছে, তিনি দিকে শক্রভাবাপন্ন ভারতীয় রাষ্ট্র ভূখণ্ডে বেষ্টিত। চতুর্থ দিকটিতে বঙ্গেশসাগর—যথানে সহজেই ভারতীয় নৌ-বাহিনী আধান্য বিস্তার এবং অবরোধ করতে পারে। শুধুমাত্র দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে, বার্মার দিকে একটি ছোট মুখ খোলা আছে। এই খোলামুখ বরাবর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। গভীর জঙ্গলে ঘেরা এটা একটি পার্বত্য এলাকা এখানে রাজত্ব করে বন্যগন্ড এবং মিজোরা। অনুপবেশমূলক ও বিদ্রোহাত্মক কার্যক্রম চালনা ছাড়া এ এলাকায় কোন সামরিক অপারেশন পরিচালনা সম্ভব নয়।

প্রদেশের বাকি অঞ্চল গঠিত পলিজ মাটিতে। বিশাল যমুনা, পদ্মা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবং মেঘনা প্রদেশকে চারটি প্রাকৃতিক বলয়ে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেকটি বলয় আবার কয়েকটি জলপথ—চিকিরের রৈখিক টানের মত করে আড়াআড়িভাবে ছেদিত। জলপথগুলো মধ্যবর্তী স্থলভাগ ঘন গাছপালার জঙ্গল, লতাগুল্য এবং ফসলে ভরা। এ ছাড়া আছে দু'টো ত্যক্ত জঙ্গল, একটি দক্ষিণ-পশ্চিম সুন্দরবন এবং অপরটি উত্তরে টাঙ্গাইলের কাছাকাছি মধু-পুর।

একমাত্র বৰ্ষাকাল ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। নিয়ম অনুযায়ী বৰ্ষাকাল মধ্য মে থেকে শুরু হয়। শেষ হয় গিয়ে মধ্য সেপ্টেম্বরে। বাস্তবে বৰ্ষা একমাস আগে শুরু এবং শেষ হয় এক মাস পর। বন্যা তার সাংবৰ্ধীক সফর কদাচিং পরিহার করে। প্লাবিত করে বিশাল এলাকা। একমাত্র নৌ-যোগাযোগ ছাড়া অন্য সব যোগাযোগ মাধ্যমকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তখনো এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে আর্দ্র র্থাকে। মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম চলাচল অসম্ভব করে রাখে।

নদীমাত্ক এ ভূখণ্ডের দীর্ঘস্থায়ী বন্যা মৌসুম ভারতের জন্য কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। শীঘ্ৰ মৌসুমে সে 'অভিযান' পরিচালনা করতে পারলো না। এবং দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার মাধ্যমে সে সময়কে আমাদের সৈন্যদের নৈতিক মনোবল ও কার্যক শক্তির ক্ষতি সাধনে ব্যবহার করে ইতিমধ্যে সে তার সমর যন্ত্র প্রস্তুত করে ফেলে। এবং পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে নতুন আটটি ডিভিশনের এক সেনা সমাবেশ ঘটায়।

দ্বিতীয় কোর-এর অধীনে দু'ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য যশোর সেষ্টেরে আমাদের বিরুদ্ধে

পশ্চিমবাংলায় সমাবেশ করা হলো। অন্যদিকে উত্তর বাংলায়<sup>১</sup> অভিযানের জন্যে ৩৩ কোর-এর অধীনে তিনটি ডিভিশনকে নির্দিষ্ট করা হলো। আমাদের উত্তর সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকায় নিয়োজিত ছিল তার ১০১ কম্যুনিকেশন জোন। এ জোনকে একটি যোদ্ধা জোন-এ পরিণত করা হয় এবং অধিনায়ক করা হয় একজন মেজর জেনারেলকে। আমাদের পূর্ব সীমান্ত চতুর্থ কোর-এর অধীনে এনে তিনি ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হল। আটটি ডিভিশন ও একটি কম্যুনিকেশন জোন নিয়ে গঠিত এ তিনটি কোর সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বহরে পুরোপুরি ছিল সজিত। ছিল ১০টি মধ্যম ও ৪৮টি ফিল্ড রেজিমেন্ট। পরে এ সংখ্যা বাড়িয়ে যথাক্রমে ১২ ও ৬০টি রেজিমেন্ট করা হয়।

ভারতীয় গোলন্দাজ বহরে ১৩০ এম এম কামান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো ৩০ কিলোমিটার-দূরের লক্ষ্যের জন্যে কার্যকরভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে টি-৫৫ ট্যাংকের একটি রেজিমেন্ট ও পিটি-৭৬ শেরম্যান ট্যাংকের দুটি রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত হয় তার সাঁজোয়া বহর। এছাড়া পিটি-৭৬ ট্যাংকের অতিরিক্ত দুটি স্থতন্ত্র স্কোয়াড্রনও ছিল তার। ছিল দুটি ব্যাটালিয়ন বহনযোগ্য যথেষ্ট পরিমাণে সাঁজোয়া পরিবহণ অধিকাংশ ট্যাংকই রাতে কার্যক্ষম ছিল। সেগুলো নদ-নদী জাতীয় বাধাকে সহজে অতিক্রম করতে পারতো।

মিগ-২১ এস (বাধা প্রদানকারী), ক্যানবেরা (বোমারু), ন্যাট (ভূমি সহায়ক বিমান), এসইউ-৭ এস (জঙ্গী ও বোমারু) বিমানের সমন্বয়ে দশটি স্কোয়াড্রন নিয়ে গঠিত হয় তার আকাশ শক্তি। সে পূর্ব পাকিস্তানের চারদিক বিমান ঘাঁটির বিশেষ জাল বিস্তার করেছিল,—যেখান থেকে এ আক্রমণ চালানো যেতো। পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে থাকা নদীগুলির ওপর আকাশ সেতু নির্মাণের জন্য সে বিরাটসংখ্যক পরিবহণ বিমান ও হেলিকপ্টার জড় করে।

ভারত তার পূর্বাঞ্চলীয় মঞ্চের জন্যে একটি শক্তিশালী বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ টাক্ষ ফোর্স সৃষ্টি করে। তার বিমানবাহী জাহাজ ‘বিক্রান্ত’-এ ছিল ৬টি অ্যালিজি (পর্যবেক্ষণ বিমান), ১৪টি সি হকস (জঙ্গী) এবং দুটি সি-কিং (সাবমেরিন বিধ্বংসী হেলিকপ্টার)। এ ছাড়া প্রহরায় ছিল তিনটি ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেট। টাক্ষ ফোর্সে ৪টি যুদ্ধজাহাজ<sup>২</sup>, ২টি সাবমেরিন,<sup>৩</sup> একটি মাইন সুইপার, পাঁচটি গানবেট এবং তিনি অবতরণ যান সংযোজিত ছিল। এই বাহিনী কার্যকরভাবে পূর্বোপুরিভাবে নৌ-অবরোধে ছিল সক্ষম।

এছাড়া ভারতের অতিরিক্ত ছিল এক ব্রিগেড ছত্রী সেনা এবং ৩টি ব্রিগেড ফ্র্যান্স। তার পরিসম্পত্তের সাথে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ২৯টি ব্যাটালিয়ন ও এক লাখ শক্তিশালী মুক্তিবাহিনীকেও হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রসঙ্গে বলা যায়, তারা সাধারণভাবে আমাদের প্রতি শক্তভাবাপন্ন হয়ে পড়ে এবং আমাদের শক্তকে মূল্যবান সাহায্য করতে পারতো।

আমাদের ক্ষেত্রে—এই বিশাল ভারতীয় বাহিনী মোকাবেলার জন্যে ছিল হালকা অস্ত্রে

১. প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার সীমানা নির্ধারিত হয়েছে দক্ষিণে গঙ্গা এবং পূর্বে যমুনা প্রবহমান জলধারায়
২. আইএনএস বিয়াস, আইএনএস ব্রাক্ষপুত্র (লেপার্ড ক্লাস), আইএনএস কামোরতা ও আই-এন এস করারাটি (পেতিয়া শ্রেণী)।
৩. আইএনএস কান্দারি ও আইএনএস কালভারি

সজ্জিত তিনটি পাদাতিক ডিভিশন, এফ-৮৬ স্যাবর-এর একটি ক্ষোয়াড্রন (অতিরিক্ত বিমান ঘাঁটি ছাড়া অধিক বিমান নিরীক্ষণ) ও চারটি গানবোট। এই সামরিক শক্তি ছাড়াও ৭৩ হাজারের একটি আধা-সামরিক বাহিনী ছিল। এরা ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস, ক্ষাউট, মুজাহিদ ও রাজাকার বাহিনীর সদস্য। এই পরিসম্পরাম আমাদের সর্বোত্তম সুযোগের জন্যে কীভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি? এটা অনেকাংশে শক্র সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা নেয়ার ওপরই নির্ভর করে।

পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় লক্ষ্য ছিল কী? আজকে এ প্রশ্নকে মূর্খামি বলে মনে হবে। এর জবাবও স্পষ্ট। ১৯৭১ সালে বেশ কিছু পাকিস্তানি সমরবিদ নিরূপণ করেন যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের ‘একটি বড়সড় এলাকা’ দখল ছাড়া ভারতের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এতে সে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ সরকারের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে সরিয়ে আনতে এবং শরণার্থীদের বিরাট বোৰা ‘মুক্ত এলাকায়’ চালান করতে পারবে। পাকিস্তানের জন্য এটা লাগাতার বিরক্তিকর বিষয়ে পরিগত হবে এবং ভারতের জন্যে হবে স্বত্ত্বাধারক। এই-ই ছিল আমাদের সমর কৌশলীদের উপলব্ধি।

অতএব, ‘বড়সড় এলাকা দখল’ থেকে বিদ্রোহীদের কিংবা তাদের প্রতিপোষকদের বঞ্চিত করার জন্যে আমাদের সৈন্যদের নিয়োজিত করা হয়। প্রায় আট মাস তারা তাদের নির্ধারিত ভূমিকা পালন করে এবং এর জন্যে তারা কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। কিন্তু এই সময়ে একটি বড়সড় এলাকা কেটে নেয়ার জন্যে ভারত তার বিশাল সমর্যদ্বের বজ্জু চিলা করেন। কেননা, সে জানে, এর অর্থ সর্বাত্মক যুদ্ধ। এবং সে এটা চায়ওনি যতক্ষণ না দুর্বল মুখগুলো শক্ত করে বাধা যাচ্ছে। অতএব, সে গড় প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির জন্যে সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্যে কাজ চালিয়ে যায়।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে পূর্বাহ্নে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাত করা হয়—যা ছিল ‘পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা’ করা। কাগজে-কলমে উদ্দেশ্য অপরিবর্তিতই ছিল এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর এর জন্য প্রচণ্ড খাটে—আবার কাগজে-কলমেই তাকে পূরণ করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে কীভাবে রক্ষা করা যায়—এ প্রশ্ন জেনারেল নিয়াজি এবং তার পূর্বসূরিদের দারণভাবে আলোড়িত করে। বিভিন্ন সময়ে চারটি রণকৌশল নির্ধারণের জন্যে সুপারিশগুলির প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্তভাবে পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার একটি পথ হল ঢাকা-রক্ষায় কেন্দ্রীভূতকরণ। কেননা, এটাই সারা প্রদেশের ভাগ্যকে নির্ধারণ করবে। ঢাকা-রক্ষায় সর্বোত্তম ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তিনটি বিশাল নদী তীরবর্তী বরাবর এলাকা দিয়ে। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ—এই তিনটি নদী রণকৌশলগত ক্ষেত্রে একটি ত্রিভুজাকৃতির সীমারেখা টেনে বেঠন করে রেখেছে—যা সাধারণত ‘ঢাকা বোল’ (ঢাকা বাটি) নামে অভিহিত। এই রণকৌশলের স্পষ্টতাই দুটো অসুবিধজনক দিক ছিল। প্রথমত এর অর্থ দাঁড়ায় সমষ্ট অঞ্চল—যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, বংপুর, সিলেট, বৈরব বাজার, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম এই ‘বোল’-এর বাইরে থেকে যায়। এবং যুদ্ধ ছাড়াই প্রতি ইঞ্চি ভূমি শক্রের কাছে ছেড়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের আত্মরক্ষার পরিধিকে ছেট করায় ভারতকে তার আটটি ডিভিশনের কমপক্ষে চারটি ডিভিশনকে পশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে পরিচালনার সুযোগ করে দেবো আমরা। যেখানে

ইতিহাসে এই প্রথম (সম্ভবত সর্বশেষ) আমরা ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে সংখ্যা সাম্য আনতে পেরেছিলাম। বলাই বাহ্য জাতীয় রণকৌশলের ঐতিহ্যবাহী ধারণা অনুসারে—পঞ্চম পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি যথাসম্ভব নিজেদের অনুকূলে ধরে রাখতে হবে। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীল।

পূর্ব পাকিস্তান রক্ষাকারীদের দ্বিতীয় কৌশলটি হল,—সীমান্ত এলাকায় সৈন্য সমাবেশ ঘটানো এবং পর্যায়ক্রমে তাদেরকে 'চাকা বোল'-এর দিকে প্রত্যাহার করা। এ রণকৌশলটি ছিল যুক্তিনির্ভর। কিন্তু একটি প্রধান বিবেচনা একে অকার্যকর প্রমাণিত করে। দিনে আকাশে শক্তির প্রধান এবং রাতে বিদ্রোহীদের তীব্র তৎপরতা সীমান্ত থেকে 'বোল'-এর দিকে সৈন্য অপসারণ সম্ভব করে তুলবে।

তৃতীয় বিকল্পটিতে 'চলমান যুদ্ধের' কথা বলা হলো। যারা এর প্রবক্তা তাদের মতানুসারে এই ধারার উপযোগিতা পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে ছিল আদর্শ। বিরুদ্ধবাদীরা বললো, 'যদি এই রণকৌশল গ্রহণ করা হয় তাহলে বিদ্রোহী এবং আক্রমণকারীরা আমাদেরকে তাড়িয়ে শিকার করে হত্যা করবে।'

চতুর্থ এবং সর্বশেষ,—যেটা জেনারেল নিয়াজির গ্রহণের জন্যে খোলা ছিল সেটা 'দুর্গ' প্রতিরক্ষা রণকৌশল। এর অর্থ—সীমান্ত শহরগুলো বিশেষ করে যেগুলো শক্তির প্রধান অক্ষের মধ্যে পড়বে, সেগুলোকে দুর্গে পরিণত (তবুকের মত) করা এবং শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়া। আধুনিক রণকৌশলে এই মতধারা অপ্রচলিত তথ্যপি এতে দু'টি প্রধান সুবিধা ছিল। প্রথমত এটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমাদের বিশাল এলাকার আত্মসমর্পণকে বাধাদান করে। দ্বিতীয়ত, এটা সমরসম্ভারকে কেন্দ্রীভূত করে—যা খোলাখুলি প্রথাসিদ্ধ যুদ্ধের জন্যে যথেষ্ট নয়। তবে মনে করা হয়, এই 'দুর্গগুলো' শক্তি আগমনের পথে বড় রকমের বাধা হিসেবে প্রমাণিত হবে। হয় এগুলোকে শক্তির নিষেজ করতে হবে, না হয় পাশ কাটিয়ে বিকল্প পথ দিয়ে যেতে হবে। নিষেজকরণে তাকে আত্মরক্ষাকারীদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শক্তি নিয়োগ করতে হবে। এটা অনেকটা নেহাই-এর ওপর হাতুড়ি পড়ার মত। নেহাই-এর অনভাবনীয় ক্ষতি সাধিত হবার আগেই হাতুড়ি পরিচালনাকারীর বাহুর ক্ষমতা নিঃশেষিত হবে। দুর্গকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে অবরোধ করার জন্যে সমপরিমাণ শক্তি নিয়োজিত হবে। হিসাব করা হয়, এই রণকৌশলে শক্তি অগ্রগমণ অব্যাহত রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অতিরিক্ত সৈন্য ব্যবহারে সুযোগ পাবে না।

জেনারেল নিয়াজি চতুর্থ রণকৌশলকে পছন্দ করলেন এবং যশোর, বিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, তৈরববাজার, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামকে<sup>৪</sup> দুর্গে পরিণত করার আদেশ দিলেন। আদেশে আরো বলা হলো, দুর্গগুলোতে ৬০ দিনের গোলাবারুদ ও ৪৫ দিনের খাদ্য সম্ভার মজুদ করতে হবে। এবং এগুলোতে অবস্থান নেয়ার আগে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার জন্যে সৈন্যদের সীমান্ত এলাকায় লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

সুতরাং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড বিকশিত অপারেশন পরিকল্পনাকে এই কার্যধারার মুখোমুখি করলো:

- সীমান্তে নিয়োজিত সৈন্যারা ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না জিওসি প্রত্যাহারের  
৪. সীমান্ত এলাকার অন্যান্য শহরগুলোকে 'শক্তিশালী কেন্দ্র' হিসেবে উন্নত করতে হবে।  
কেন্দ্রগুলি নির্বাচিত করবেন স্থানীয় কঢ়াভাবে।

ଆଦେଶ ଦିକ୍ଷେନ

দুর্গে প্রত্যাহারকালে তারা যুক্ত করবে বিলম্বিত প্রক্রিয়ায় যাতে 'সময়ের ব্যাপি' ঘটানো  
যায়।

সর্বশেষে তারা দুর্গের দখল নেবে এবং দুর্গ রক্ষার জন্যে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে।

পরিকল্পনাটিকে এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত শোনালো। কেউই এতে সাধ্যাতিক রকমের কোন আপত্তি তুললো না। ঢাকা সফরে এলে জেনারেল হামিদের সামনে এটা পেশ করা হয়। নীতিগত দিক দিয়ে তিনি পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলেন। পরে সেনা সদর দফতরের পেশ করা হলো। সেখানে নিয়ন্ত্রিত স্পারিশসহ এটাকে অনুমোদন করা হয়:

ইংলিশ বাজারে (রাজশাহীর বিপরীত) বিরক্তে আক্রমণাত্মক কার্যধারায় নতুন সৈন্য ও অস্ত্রশস্তি পরিকল্পনায় সন্বিশেষিত করতে হবে।

ଫାରାକ୍କା ବାଁଧେର ଧ୍ୱନି ବା କ୍ଷତି ସାଧନେର ଜନ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନାଯ କମାନ୍ତୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେର ସ୍ଥିଲନ ଘଟାତେ ହେବେ ।

চট্টগ্রামের জন্যে শাঁস হিসেবে একটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন তৈরি করতে হবে (পরবর্তীকালে সমুদ্র পথে) নতুন অস্ত্র ও সৈন্য সংযোজনের জন্য। ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার লৌহ খিল হিসেবে দেখতে হবে।

জেনারেল নিয়াজি জিএইচ কিউকে (জেনারেল হেড কোয়ার্টার) নিশ্চিত করেন যে, সকল সুপারিশগুলো পরিকল্পনায় সন্তুষ্টিপূর্ণভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। এতে মনে হল, বিষয়টি সমাধান হয়ে গেছে।

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଲୀୟ କମାନ୍ ପରିଷ୍ଠିତିର ଶୁରୁତ୍ୱ ମୂଳ୍ୟନ କରିଲୋ । ଏଇ ଭିତ୍ତିତେ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ଗତିପଥ ନିର୍ଧାରଣେ ଏକଟି ଅନୁମାନ ନିର୍ତ୍ତର ଯାଚାଇ କରା ହଲୋ । ଯାଚାଇୟେର ପର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଲୋ ଯେ ପଞ୍ଚମ ଦିକ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଆକ୍ରମଣଟି ଆସିଲେ ପାରେ (ଯଶୋର ସେଟ୍ରେର ବିପରୀତ) ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନେଇଲା ହତେ ପାରେ ପୂର୍ବଦିକ ଥିଲେ (କୁମିଳ୍ଲା ସେଟ୍ରେର ବିପରୀତ) । ସେଇମତେ ଏହିଭାବେ ଆଣ୍ଟ ସମର ଉପକରଣେ ବାଟୋଯାଇଲା ହଲୋ ।

যশোর সেষ্টের যশোরকে সদর দফতর করে মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারীর অধীনে নবম ডিভিশনকে ন্যস্ত করা হয়। যশোরকে সদর দফতর করে ১০৭ বিগেড, ঝিনাইদহকে সদর দফতর করে ৫৭ বিগেড, দুঁটো গোলদাঙ ফিল্ড রেজিমেন্ট, একটি পর্যবেক্ষণ ও সহায়ক (আর আর্য এস) ব্যাটালিয়ন।

**উত্তর বাংলা :** নাটোরকে সদর দফতর করে মেজর জেনারেল নজর হুসেন শাহর অধীনে মোড়শ ডিভিশনকে নতুন করা হয়।

ରୁଙ୍ପୁରକେ ସଦର ଦଫତର କରେ ୨୦ ଟ୍ରିଗେଡ, ବଗୁଡ଼ାକେ ସଦର ଦଫତର କରେ ୨୦୫ ଟ୍ରିଗେଡ, ଏକଟି ଗୋଲନ୍ଦାଜ ଫିଲ୍ଡ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ଦୁଇ ମର୍ଟାର ବ୍ୟାଟାରି, ଏକଟି ଆର ଆୟାନ୍ ଏସ ବ୍ୟାଟାଲିଯାନ ଏବଂ ଏକଟି ସାଂଜୋୟା ରେଜିମେଣ୍ଟ,—ସା ପର୍ବ ପାକିସ୍ତାନେ ଏକଟିଇ ଛିଲ ।

পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত মেজের জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর অধীনে চতুর্দশ ডিভিশন,  
সদর দফতর-ঢাকা।

କୁମିଳାକେ ସଦର ଦଫତର କରେ ୧୧୭ ବିଗେଡ, ଯଥମନ୍‌ସିଂହଙ୍କେ ସଦର ଦଫତର କରେ ୨୭ ବିଗେଡ, ସିଲେଟକେ ସଦର ଦଫତର କରେ ୨୧୨ ବିଗେଡ, ଏକଟି ଗୋଲନ୍ଦାଜ ଫିଲ୍ଡ ରେଜିମେନ୍ଟ ଦାଟି

মর্টার ব্যাটারি এবং চারটি ট্যাংক।

চট্টগ্রাম সেন্ট্রেল ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লাহর অধীনে ৯৩ স্বতন্ত্র ব্রিগেড, সদর দফতর—চট্টগ্রাম।

এই নিয়মিত সৈন্য ছাড়াও শক্তি বর্ধনের জন্যে প্রত্যেকটি ডিভিশনের সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবে ইপিসিএফ, মুজাহিদ ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের দেয়া হল। সেনাবাহিনীর সাথে তাদের নিয়োজিত করা হয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঘন করার জন্য। কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে দুর্বলতম সংযোগ হিসেবে প্রতিপন্থ করে।

যুদ্ধের মেঘ যখন ঘন হতে শুরু করে সে সময় জেনারেল নিয়াজি আরেকটি বড় ধরনের ধাক্কার আশ্রয় নেন। তিনি আকস্মিকভাবে দু'টি এডহক ডিভিশনাল সদর দফতর এবং চারটি এডহক ব্রিগেড সদর দফতর সৃষ্টি করেন। ঢাকাকে একটির এবং ঢাঁদপুরকে আরেকটির ডিভিশনাল সদর দফতর করা হলো। ইপিসিএফ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল মেজর জেনারেল জামশেদের অধীনে একটি এবং ডেপুটি সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল রহিম খানের অধীনে অপরাণি ন্য৷ করা হয়। জামশেদ পেলেন দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এদেরকে ২৭ ব্রিগেড থেকে খসিয়ে নেয়া হয়। তাদেরকে ময়মনসিংহ থেকে তৈরববাজারে অন্যদিকে রহিমকে দেয়া হলো ৫৩ ব্রিগেড,—যা ঢাকার জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। চতুর্দশ ডিভিশন থেকে ১১৭ ব্রিগেডকে (কুমিল্লা) নিয়ে রহিমের অধীনে দেয়া হয়। এডহক ব্রিগেডগুলোর অবস্থান এবং সেগুলোর ভূমিকা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

জেনারেল নিয়াজি তার এই 'সৃষ্টির' জন্য ভীষণ অহংকারী হয়ে ওঠেন। 'এই অতিরিক্ত সদর দফতরগুলো দেখে শক্তি হত্যবৃদ্ধি হয়ে পড়বে। সে মনোগত দিক দিয়ে আমাদের শক্তির সংখ্যা হিসেবে আনবে। এটা নিঃসন্দেহে ভীতিদায়ক বাধা হবে তার জন্য।' তিনি প্রায়শই আমার উপস্থিতিতে এভাবে গর্ব করে বলতেন। কিন্তু এডহক সদর দফতর সৃষ্টিতে সৈন্যের অপর্যাঙ্গতা পূরণ করা গেল না। ফলে নভেম্বরের মাঝামাঝিতে জেনারেল নিয়াজির অতিরিক্ত সৈন্য পাবার জন্যে আলোচনার উদ্দেশ্যে মেজর জেনারেল জামশেদ এবং তার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকীকে রাওয়ালপিণ্ডিতে পাঠাতে হলো। ইতিমধ্যে সীমান্তে চাপ বেড়ে যায়। বহিদিকে অভিক্ষিণ স্থানের দখল আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং অভ্যন্তরের অনেক এলাকা শক্তির হাতে চলে গেল। দলটি জিএইচকিউতে তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করে আরো দু'টো ডিভিশন চাইলো। কিন্তু আটাটি পদাতিক ব্যাটালিয়নের আশ্বাস দেয়া হলো। এর পাঁচটি নভেম্বরের শেষ দিকে এসে পৌছে কিন্তু বাকিটা আর আসেনি। পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যাটালিয়নকে কোম্পানিতে বিভক্ত করা হয় এবং যেসব অঞ্চল চৰম চাপের মুখে ছিল সেসব জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। ফলে তারা একক যোদ্ধা ইউনিট হিসেবে স্বকীয় পরিচিতি হারিয়ে ফেলে।

মুসলমানদের সর্বশেষ উৎসব দিনের আগের দিন, ১৯ নভেম্বর, ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে জিএইচকিউ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠালো। বাতায় বলা হয়, সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী শক্তির প্রধান আক্রমণটি আসতে পারে পূর্বদিক (কুমিল্লা) থেকে এবং সহায়ক আক্রমণ হতে পারে পশ্চিম থেকে (যশোর)। আরো বলা হল, সম্ভাব্য আক্রমণ পরিচালিত হতে পারে দ্বিতীয় দিনটিতে যখন সৈন্য এবং তাদের কমান্ডাররা দ্বিতীয় উৎসবে

মেতে থাকবে, তখন। মনে করা হয়, তদনুযায়ী জিএইচকিউ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে তার পুনর্বিন্যাসের উপদেশ দেয়।

বার্তাটিকে অভীব ওরুত্তের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। সীমান্তের বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরের অবস্থান পরীক্ষা করা হলো। দেখা গেল, কুমিল্লা ও ফেনীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড অত্যন্ত নাজুক। সুতরাং ৫৩ বিগেডকে দ্রুত ঢাকা থেকে ফেনীতে প্রেরণ করা হয়। এই সেক্টরটি রক্ষার জন্যে জেনারেল রহিম তার মর্শাল ল' কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে চাঁদপুর চলে যান। ফেনী ও কুমিল্লায় একটি করে বিগেড দেখে তাকে পুরোপুরি আস্থাবান মনে হলো। যথানে সহায়ক আক্রমন আসার ধারনা করা হচ্ছিল। অন্যান্য সকল কমান্ডারদেরকেও জ্ঞাত করা হলো।

পূর্বাঞ্চল কমান্ড যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে ব্যর্থ হল। এক্ষেত্রে সে ২,৭০০ কিলোমিটার বরাবর সীমান্ত জুড়ে অনুপ্রবেশ ও আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যাপ্ত ছিল। রাওয়ালপিণ্ডির উপদেশ সত্ত্বেও বিন্যাসের কোন পরিবর্তন করা হলো না।

সৌভাগ্যবশত শক্র দুদের দিন সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করলো না। সে শুধু কয়েকটি সেক্টরে চাপ তীব্রতর করে মাত্র। চাপ সামাল দিয়ে নিয়াজি ভাবলেন, তিনি স্বোত প্রতিরোধ করতে পেরেছেন। মূলত তখন স্বোত প্রবাহ শুরুই হয়নি। ঢাকা পুরোপুরিই শান্ত ছিল। ভারতীয় জেট তখনও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। বাস, রেল ও ফেরি আগের মত স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক নিয়মে সচল ছিল। হেলিকপ্টারে ঢড়ে জেনারেল নিয়াজির সীমান্ত এলাকা সফরের দৈনিক কর্মসূচি অব্যাহত রইলো। এবং তার অশ্বীল রসিকতাকে আরো সমৃদ্ধ করলেন এবং একই সাথে চলতে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূরগি কাবাব।

এতদসত্ত্বেও জেনারেল নিয়াজি জোরগলায় বলতে থাকেন যে, ২১ নভেম্বর থেকে তার জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে (বয়রা ঘটনা) এবং তিনি সাফল্যজনকভাবে লড়াই করে চলেছেন। একই সাংবাদিক সাক্ষাত্কারে,—যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে,—সেখানে তিনি তার সীমান্ত সমাবেশকে ‘প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী অবস্থান’ বলে উল্লেখ করেন। বিদেশী সংবাদদাতাদের কাছে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: ‘সীমান্ত চৌকিগুলিতে আমার সৈন্যরা খোলা হাতের প্রসারিত আঙ্গুলের মতো বিস্তৃত যত দীর্ঘ সময় সম্ভব তারা সেখানে যুদ্ধ করবে নিজেদের দুর্গে গুঠিয়ে আনা পর্যন্ত এবং দুর্গে তারা শক্ত মুঠো তৈরি করবে শক্রের মস্তকে আঘাত হানার জন্য।’

আমি তার দেয়া উপমায় মুক্ষ হলাম। কিন্তু তার সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কথা আমার মনে পড়ে গেল, যে সিদ্ধান্তে তিনি শতকরা ৭৫ ভাগ হতাহত না হওয়া প্রয়ত্ন প্রত্যাহারকে নিষিদ্ধ করেন। যখন চার আঙুলের তিনটেই ভেঙে যায় কিংবা জখম হয়, তখন মুঠো তৈরি কী সম্ভব? আমি অন্তত পারবো না যদি আমার নথ উপড়ে যায়।

এ হচ্ছে জেনারেল নিয়াজির সমর কৌশলের একটি নবিশি বিশ্লেষণ। পেশাদাররা এটাকে দেখেন তার ‘পারঙ্গমতা সম্পর্কে অযোক্ষিক আস্থা’ হিসেবে। আসল ঘটনা হচ্ছে, তিনি স্বীকার করতে নারাজ যে, তিনি পরাজয়ের জন্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

## হিসাব-নিকাশ শুরু

ঢাকার বাইরে জেনারেল নিয়াজির সর্বশেষ সফর ছিল ময়মনসিংহে ও ডিসেম্বরে। সফর শেষে আমি আমার অফিসে বসে সারাদিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছিলাম। সেই সময় তার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী বিকেল টে ১০ মিনিটে আমাকে টেলিফোন করলেন। তিনি দারকুন বিপর্যস্ত ছিলেন। প্রায় চিৎকার করে আমাকে বলেন, ‘তুমি কী ধরনের প্রেস অফিসার? রেডিও পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে যাওয়ার ঘোষণা প্রচার করছে অথচ তুমি আমাকে খবর দাওনি? আমি বললাম, ‘আমি ভেবেছিলাম খবরটি আপনার কাছ থেকেই পাব।’ ‘অজুহাত তোলার চেষ্টা করোন্তু। জলদি ট্যাকটিক্যাল সদর দফতরে চলে এসো।’

‘ট্যাক’ সদর দফতর আধ মাইল দূরে ক্যান্টনমেন্টের এক জনহীন অংশে। প্রথম যখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার (রাওয়ালপিংডি) যুদ্ধ আতঙ্ক সৃষ্টি করে তখন ১৯ নভেম্বর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর সেখানে সরিয়ে নেয়া হয় এবং ডালপালা বিস্তারী একটি শিশু গাছের নীচে মাটির প্রায় তিনি মিটার ভূগর্ভে এই ট্যাক সদর দফতর নির্মাণ করা হয়। ছ’টি সিড়ি ভেঙ্গে আমি নীচে নামলাম, তারপর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে তিনিটি ছোট কামরা অতিক্রম করে করিডোরের শেষ মাঝায় বড় কক্ষে প্রবেশ করলাম। এটাই হচ্ছে ট্যাক সদর দফতরের অপারেশন কুম—পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক অপারেশন চালাবার স্থায় কেন্দ্র।

আমি যখন কক্ষে ঢুকলাম, সে সময় জেনারেল নিয়াজি অফিসারদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন। পরনে ছিল গ্রীষ্মকালীন প্যান্ট, গায়ে ছিল ধূসর বর্ণের বুশ শার্ট এবং গলায় ছিল সিঙ্কের গলাবন্ধ। চারমিটার প্রস্থ সাত মিটার দৈর্ঘ্যে অপারেশন কুমটির সবগুলো দেয়ালটি ঢাকা পড়ে গেছে বিরাট বিরাট অপারেশনাল মানচিত্রের আড়ালে। কামরার একপাশে সার্ভিস করে বসানো টেবিলের ওপর টেলিফোন ও বেতার যন্ত্র। দেয়াল পেছনে রেখে জেনারেল নিয়াজি কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তার সামনে মেজের জেনারেল জামশেদ, মেজে জেনারেল ফরমান ও রিয়ার এডমিরাল শরীফসহ ৩০ জন অফিসার বসেছিলেন।

এটা আনুষ্ঠানিক বক্তৃতাটি ছিল না। ঘরোয়া কায়দায় বলছিলেন এবং শ্রোতা ও দেয়ালের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ফাঁকা জায়গাটিতে আন্তে ধীরে পায়চারি করছিলেন। তার চেহারায় কোন উদ্বেগ বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা এতই গুরুগত্তীর ছিল যে, তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ তার শ্রোতাদের হৃদয়ে গিয়ে গ্রাহিত হচ্ছিল। তার আলোচনার মূল সূর ছিল দীর্ঘ প্রতিক্রিত খোলাখুলি যুদ্ধ আঘাত হেনেছে। রাশ আলগা করে দেয়ায় আর কোন বাধা নেই। আন্তর্জাতিক সীমাত অতিক্রমের প্রশ্নে নেই কোন বিধিনিষেধ। অনুপ্রবেশকারীকে তার নিজস্ব এলাকার মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কোন সীমারেখাও ছিন হয়ে গেছে। সমস্ত মেঘ অপসারিত।

বৈঠক শেষে আমি অফিসারদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষক স্বত্তির চিহ্ন দেখতে পেলাম। তারা

১. ট্যাকটিক্যাল সদর দফতর (সমর কৌশল সম্পর্কীয় সদর দফতর)

অত্যন্ত দীর্ঘ কর্দমাক্ত এক বিদ্রোহ দমনমূলক যুদ্ধ লড়ে এসেছে। কিন্তু সমাপ্তি দেখতে পায়নি। তারা ভাবলো, এখন এটার সমাপ্তি ঘটবে। ‘পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পক্ষিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল’—আমাদের সমর কৌশলগত এই ধারণাকে পক্ষিম পাকিস্তানে আমাদের সৈন্যরা নিশ্চিত প্রমাণ করার সুযোগ পাবে।

সবাই যখন অপারেশন কৰ্ম ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন তখন জেনারেল নিয়াজি তার অফিস রুমে আমাকে ডেকে পাঠান এবং তার জন্য চলমান পরিস্থিতির ওপর একটি কর্মসূচির খসড়া তৈরি করে দিতে বললেন। কর্মসূচিতে দুটি বিষয়ের ওপর অবশ্যই জোর দিতে হবে। প্রথমত, এতে সৈন্যদের জানিয়ে দিতে হবে যে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের বাছ-বিচার ছাড়াই এখন থেকে তারা যেখানেই শক্তকে পাবে সেখানেই আঘাত হানার ব্যাপারে স্বাধীন। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত তাদের লড়ে যেতে হবে। কেননা, স্থল, আকাশ কিংবা সমদ্রপথ নেই যেখান থেকে তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাহার করা যেতে পারে। কর্মসূচির খসড়া তৈরি হয়ে গেল অনুমোদিত হল এবং পরের দিন অনুলিপি করা হলো। কিন্তু পরিবহণের অভাবে তা আর সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা গেল না। পরবর্তীকালে সবগুলো কপিট পুড়িয়ে ফেলা হলো।

৩ ডিসেম্বর বিকেলে পক্ষিম পাকিস্তান যুদ্ধক্ষেত্রে পিএএফ জেট সাতটি আইএএফ বিমান ঘাঁটিতে আঘাত হানে এবং পদাতিক বাহিনী কয়েকটি কেন্দ্রে সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে। কিন্তু পর দিনটি শুরু হবার কয়েক ঘন্টা আগে ঢাকা ভারতীয় প্রত্যাঘাত লাভ করলো। রাত ২টা ৪০ মিনিটে বিমান বিধ্বংসী কামান ও ভারতীয় ক্যানবেরোর শব্দে আমার দ্বুম ছুটে গেল। শোবার ঘরের জানালা দিয়ে ধ্রায় এক ঘন্টা যাবৎ ট্রেসার বুলেট বর্ষণ দেখলাম। প্রচণ্ড রোষে শক্ত বিমান বিমান বন্দরের ওপর বোমা ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু হালকা অ্যাক অ্যাক রেজিমেন্টের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ গোলন্দাজরা, অবিরাম পাল্টা আঘাত হানলো। অন্যান্য যুদ্ধাঞ্চ—যেমন মেশিনগান, হালকা মেশিনগান ভূমি থেকে গোলা বর্ষণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যে শুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। এই এক্যবন্ধ প্রচেষ্টা রাতের অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভৌতি সংঘার করতে সক্ষম হলো এবং তারা বিদায় নিলো। বিমান বন্দরের কোন ক্ষতি হলো না। এই ‘দন্দযুদ্ধে পিএএফ’র স্বারবরগুলো অংশ নেয়নি। কেননা, রাতে কর্মক্ষম ছিল না সেগুলো।

ভোর হতেই আকাশ-আক্রমণ থেমে গেল। আমি দাঢ়ি কামিয়ে পোশাক বদলে ট্যাক সদর দফতরে গেলাম। কিন্তু সেখানে কর্মতৎপরতা তেমন দেখলাম না। শুধু খুব সকালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো মাত্র। এ সম্পর্কে পরে আসছি। প্রথমে নৌ-বাহিনী ও পিএএফ এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে প্রথমে যাচাই করা যাক। আইএএফ জেটগুলো আবার এলো নাস্তার সময় এবং দিনভর হামলা চালালো। শক্ত হামলার তরঙ্গকে প্রত্যাঘাতের জন্যে আমাদের ছিল সর্বমোট ১৪টি এফ-৮৬ই স্যাবর, ১৪ জন্য জঙ্গী পাইলট এবং ১৪ দিনের রসদ। প্রথম দিনে পিএএফ কে ৩২ বার উড়ান দিতে হলো এবং ৩০ হাজার রাউড গোলা ব্যব করলো। এটা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ইতিহাসে প্রতিদিনে প্রতি বিমানপিচু সবচেয়ে বেশি খরচ। একইভাবে ভূমিতে নিয়োজিত একটি বিমান বিধ্বংসী কামান ৭০,০০০ বুলেট

ব্যয় করে ফেলে। আশংকা প্রকাশ করা হয়, এই হারে যদি খরচা হতে থাকে তাহলে ভাস্তরে যে রসদ আছে, তা বড়জোর সাত থেকে দশ দিন চলবে। অতএব, গোলাবারুন্দ সংরক্ষণের জন্যে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হলো এই কারণে যে, আমাদেরকে একটি দীর্ঘ যুদ্ধ লড়তে হবে। কিন্তু দ্রুত যখন অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্তিটা এসে যায় তখন সংরক্ষিত ভাণ্ডার পুড়িয়ে ফেলা হয়।

প্রথম দিনেই ভারত দশ থেকে বারোটা বিমান হারায়। রানওয়ের কোন ক্ষতি করতে পারলো না। বিমান বন্দরের আশ-পাশে মাত্র চারটি বোমা পড়লো। এতে আমাদের কার্যক্ষমতার কোন ক্ষতি হলো না। এটা ভারতকে তার আকাশ যুদ্ধ কৌশলে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করে। রানওয়ের ওপর সরাসরি বোমা ফেলা থেকে সরে এস তারা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নকরণে নেয়ে যায়। মিগ-২১ এস বিমানের বদলে এসইউ-৭-এস এবং হাস্টার নিয়োজিত করা হয় ফেরি এবং ঘাটগুলি বোমা ফেলে সেগুলি বিধ্বস্ত করার জন্য। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় গোলা নিষ্কেপের মধ্যদিয়ে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে সহায়তা দিয়ে যেতে থাকে। ভারতীয় যুদ্ধ কৌশলের এই পরিবর্তনে ৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিমান বন্দরের ওপর চাপ হাস পায়। ফলে কুমিল্লা ও অন্যান্য এলাকায় আমাদের পদাতিক বাহিনীকে সহায়তাদানের জন্য পিএএফ-এর পক্ষে কয়েকটি উড়ান সম্ভব হয়। কাছাকাছি পর্যায়ের কোন যুদ্ধ হয়নি। কেননা, আমাদের স্যাবরের স্থিতিকাল (আকাশ যুদ্ধে ৩৫ মিনিট) এসইউ-৭-এস এবং হাস্টারের চেয়ে কম। দ্বিতীয় দিনে কুড়িবার আকাশে উড়লো পিএএফ স্যাবর। এর ফলে বড়জোর ১২,০০০ রাউন্ড গোলা খরচা হলো।

৫ ডিসেম্বর এবং রাতে অ্যাক অ্যাক কামান অনুপ্রবেশকারীদের ঢাকা বিমানবন্দর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ৬ ডিসেম্বর যখন আমাদের স্যাবরগুলো একটি পদাতিক সহায়ক মিশন থেকে সবে ফিরে এসেছে এবং বিমানবন্দর আকাশযুদ্ধ টহল বিহীন ছিল ঠিক সেই সময় জঙ্গী বিমানের প্রহরায় ১০টি ভারতীয় মিগ-২১ এস হাজির হলো। বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। শক্ত বিমানগুলো একেকটি ৫০০ কিলোগ্রাম ওজনের আধুনিক রুশ বোমা ফেললো। দু'টি পড়লো রানওয়ের ওপর।

প্রত্যেকটি মসৃণ বোমা বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত বিলম্বিত ফির্জ পদ্ধতিসম্পর্ক। মাটির ভেতর প্রবেশ করার সেকেন্ডের এক চতুর্থাংশ ভাগ সময় পর বোমা বিক্ষেপণ ঘটায়। বোমাগুলো রানওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ছেদবিন্দুতে—একটা থেকে আরেকটা ১২০০ মিটার দূরত্ব গিয়ে পড়ে। এবং রানওয়েকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলে। বোমা পতনের ফলে সৃষ্টি গর্তের গভীরতা দাঁড়ালো দশ মিটার এবং প্রস্ত্রে কুড়ি মিটার। অন্তত যতক্ষণ একটি ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত না করা যাচ্ছে ততক্ষণে রানওয়ে ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়ে। এইভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী আমাদের স্যাবরকে বিমানবন্দর ব্যবহার থেকে বণ্টিত করার লক্ষ্যে সফল হলো। এর জন্যে তাকে দুই দিনে কুড়ি থেকে পঁচিশটি বিমান হারানোর ক্ষতি স্থীকার করতে হয়। পিএএফ নিল সাতটি। বাকিটা নেয় ৬ হালকা অ্যাক অ্যাক রেজিমেন্ট।

রানওয়ের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতের কাজ যাবতীয় উদ্দীপনা এবং আগ্রহের সাথে

নেয়া হলো। গর্ত ভরাটের জন্য বিমান বাহিনীর প্রকৌশল বিভাগ এবং সেনাবাহিনী অমানুষিক প্রচেষ্টা নিল। তাদের সঙ্গে কিছুসংখ্যাক উর্দুভাষী বেসামরিক শ্রমিক এবং স্থানীয় প্রকৌশলী ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা নিজেদেরকে যুক্ত করে। সবিবাম বিমান আক্রমণ তাদের প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। কিন্তু তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে যায়। এতে ১১ জন মারা যায় এবং ২০ জন আহত-হয়। পরের রাতে (৬ এবং ৭ ডিসেম্বর) গর্ত মেরামতের উন্নত প্রচেষ্টা নেয়া হলো যাতে পরদিন সকালেই জেটগুলো আকাশে উঠতে পারে। ৭ ডিসেম্বর ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে কাজের প্রধান অংশ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। উপরিভাগে সিমেন্টের কাজের জন্য আর মাত্র ছয় থেকে আট ঘন্টার প্রয়োজন। কিন্তু সকাল হতেই শক্তির বিমান বহরের নতুন চেউ আছড়ে পড়তে শুরু করলো এবং রানওয়ের আরো তিনটি ছেবিন্দুতে গর্ত সৃষ্টি হলো। এখন এই কাজ শেষ করার জন্যে প্রয়োজন নির্বিঘ্ন ৩৬ ঘন্টার কঠোর পরিশ্রম। এত বিবাম দিল না হামলাকারী বিমানগুলো এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত রানওয়ে অকেজো অবস্থায় পড়ে রইলো।

জেগাঁ (ঢাকা) থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে কুর্মিটোলায় আরেকটি বিমানবন্দর নির্মাণ কাজ চলছিল। সেটার প্রধান রানওয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো বটে, তবু শেষের দিকের কিছু কাজ তখনও বাকি ছিল। এই অসমাপ্ত বিমান বন্দরটির প্রতি শক্তি একইভাবে মনোযোগ দিল এবং প্রথমদিনেই সাফল্যের সাথে বোমাবর্ষণ করলো।

যখন পূরনো এবং নতুন বিমানবন্দর দুটোই অকেজো হয়ে পড়লো, তখন একজন দ্বিতীয় রাজধানীর চওড়া রাজপথকে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু পিএএফ-এর ধাঁচি কমান্ডার অগম্যতা এবং টেকনিক্যাল সমস্যার বিষয়টি তুলে প্রস্তাবটি বাতিল করে দেয়। এখানেই পূর্ব পাকিস্তানে পিএএফ অনুষ্ঠির বন্ধনে আটকে গেল। এবং ৬ ডিসেম্বর সকাল দশটা থেকে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ভূমিতেই পড়ে থাকে।

পিএএফ-এর জঙ্গী পাইলটরা,—যাদের কর্মসূক্ষ্মতাকে ঢাকায় আর ব্যবহার করা গেল না—তাদেরকে একটি বন্ধু রাষ্ট্রের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ৮ ডিসেম্বর দশজন চলে গেল। চারজন গেল পরদিন। সেনা পরিবহনের হিলেকগ্টার পাইলট ও শিক্ষার্থীরা রয়ে গেল।

পিএএফ-এর আক্ষেপ করার কিছুই নেই। যেখানে এর জীবৎকাল ধরা হয় চৰিশ ঘন্টা সেখানে টিকে ছিল ষাট ঘন্টা। টিকে ছিল কেবলমাত্র চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্থির সংকল্প এবং পেশাগত দক্ষতার কারণেই।

পিএএফ-এর অনুপস্থিতিতে ঢাকায় আকাশ প্রতিরক্ষা এককভাবে সেই বিমান বিধ্বংসী কামানগুলোর দায়িত্বে এসে যায় এবং যেগুলো সর্বপ্রথম গোলাবর্ষণ শুরু করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে সর্বশেষে নীরব হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে গানপিট-এ বসে তাদের কর্ম প্রক্রিয়া দেখি। অকুতোভয় গোলন্দাজরা তাদের কামানের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ধূসর বর্ণের টুপি। দৃষ্টি অনবরত আকাশকে তন্ম তন্ম করে ঝুঁজছে। যখনই কোন শক্তি বিমানকে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে,—দ্রুত তারা তাদের কামানের মুখ শূন্য বিন্দুতে স্থির করছে এবং সেটাকে লক্ষ্য করে একের পর এক গোলা ছাড়ছে। তারা

গোলাবর্ষণকে বলীয়ান করে তুলছে তেজস্বিতাপূর্ণ ‘নারায়ে তকবীর, আল্লাহ্ আকবৰ’ শ্লোগান তুলে। তাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোটা আমার জন্যে ছিল একটা প্রেরণা সৃষ্টিকারী অভিজ্ঞতা। পাকিস্তানে নৌ-বাহিনী বিমান বাহিনীর তুলনায় ভাল অবস্থায় ছিল না। চারটে টহল বোট<sup>২</sup> এবং একজন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিয়ে গঠিত ছিল এর পুরো শক্তি। তিনি যদিও একজন সহজাত শুণসম্পন্ন কমান্ডার ছিলেন তথাপি ভারতীয় নৌ-বাহিনীর টাঙ্ক ফোর্সের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে তার কোন সমর সম্ভাব ছিল না। একটি বিমানবাহী জাহাজ, কয়েকটি ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট এবং আরো অনেক সামরিক জলযান নিয়ে ভারতীয় টাঙ্ক ফোর্স গঠিত করা হয়। আর আমাদের টহল বোটগুলো মূলত চোরাচালান বিরোধী অপারেশনের জন্য কেনা হয় এবং ৪০ ও ৬০ মিলিমিটারের কামান বসানো হয়েছিলো। প্রতিটিতে ২৯ জন নাবিক ছিল। কামানের পাল্লা ছিল ৫০০০ মিটার। এদের মধ্যে দ্রুততমটির স্বাভাবিক গতি ছিল প্রায় কুড়ি নটিক্যাল মাইল। ভারতীয় টাঙ্ক ফোর্সের সমস্ত জাহাজ এগুলোকে সহজে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারতো, গতির দিক দিয়ে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতো এবং পাকড়াও করতে পারতো।

অ্যাডমিরাল শরীফ বেসামরিক সূত্র থেকে সতেরটি নৌ-যান হুকুম দখল করেছিলেন। সেগুলোতে ১২.৭ মিলিমিটার ও ২০ মিলিমিটার কামান বসিয়ে নৌ-বাহিনীর সাথে যুক্ত করেন। জোড়াতালির মাধ্যমে কার্যোপযোগী এইসব নৌ-যানে ৫০ অথবা ৩০ ব্রাউনিং হালকা মেশিনগান বসানো ছিল। বিদ্রোহ দমনমূলক অপারেশনে এগুলো কাজে দেয়। কিন্তু সর্বাত্মক যুদ্ধে এগুলোর তেমন কোন কার্যকারিতা ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বাহিনী অসাধ্য সাধনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। প্রায় ৬০০ কিলোমিটারের মত বিস্তৃত তটরেখা—বার্মা<sup>৩</sup> সীমান্তের টেকনাফ থেকে শুরু হয়ে ভারতীয় উপকূলের কাছাকাছি পশুর পর্যন্ত এসেছে। এখান থেকে করাচি পর্যন্ত কয়েক হাজার কিলোমিটারের সমুদ্র পথ ভারতীয় নৌ-নৌবাহিনী আধিপত্যাধীনে ছিল। অভ্যন্তরীণ জলপথ এত বেশি যে, সেগুলোর টহলদারীতে কয়েক হাজার নৌ-যানের প্রয়োজন। যুদ্ধের আগে অ্যাডমিরাল শরীফ সকলকেই পরিষ্কার বলে দেন যে, বর্তমানের সমর-সম্ভাব নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় নৌ-বাহিনী কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। অবস্থা নিরূপণে তার এই খোলাখুলি স্বীকৃতিতে সম্ভবত জেনারেল নিয়াজি ‘নৌ-বাহিনী ছাড়াই যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।’

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এলাকায় নৌ-বাহিনী উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করলো। বাদবাকি সমুদ্র তটরেখা আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যাটারি বাহিনীর দু'টো কামান (৪ ইঞ্চি কামান সর্বোচ্চ ১২,০০০ মিটার দূরত্বে গোলা নিক্ষেপ করতে পারে) বসানো হল। অন্যদিকে একটি অ্যাড হক ব্যাটারি চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এছাড়া ৪০০ লোকের একটি সামুদ্রিক ব্যাটালিয়ন এবং একটি নৌ-প্লাটুনকে যথাক্রমে বন্দরের পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নজর রাখবার জন্য নিয়োগ করা হয়। মংলা বন্দরকে একটি গ্যারিসন কোম্পানির (হালকা অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত)

২. কুমিল্লা, বাজশাহী, যশোর ও সিলেট  
৩. আজকের মিয়ানমার-অনুবাদক

হাতে দেয়া হলো ; তাদের সঙ্গে দেয়া হয় এক কোম্পানি ইপিসিএএফ, জোড়াতালি দিয়ে তৈরি তিনটি গানবোট এবং দু'টি ২৫ পাউন্ডার কামান।

তি ডিসেম্বর বিকেলে হঠাতে করে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় দেখা গেল, টহল নৌযানগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জোড়াতালি দিয়ে প্রস্তুত করা গানবোটগুলো,—যাদের ঘাঁটি ছিল ঝুলনা,—সেগুলো তখন রুটিন টহলে রয়েছে। অন্যদিকে গানবোট ‘রাজশাহী’ চট্টগ্রাম ঘাঁটি ছেড়ে সন্ধীপ প্রণালীতে টহলে ছিল। চট্টগ্রাম এবং প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে এই এলাকাটির একমাত্র সংযোগ মাধ্যম ছিল প্রণালীটিই। যান্ত্রিক ক্রিটির কারণে ‘সিলেট’ আগে থেকেই ডকইয়ার্ডে আটকে ছিল। ‘কুমিল্লা’ই ছিল একমাত্র নৌ-যান,—যেটাকে জেটিতে পাওয়া গেল।

নৌ-দণ্ডের এই মর্মে আগাম আদেশ জারি করে যে, যদি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে সকল গানবোটগুলোকে সফর সংকুচিত করে পোতাশ্রয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসতে হবে। পালনের পক্ষে নৌ-যানগুলোর জন্যে এটা একটা মাঝুলি গোছের আদেশ ছিল। কিন্তু যে ২৩টি বিদেশী জাহাজ এবং ৭টি উপকূলবাহী পোত বহির্নির্সের অপেক্ষা করছে, তাদের কী হবে? তারা তো নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। কিংবা খোলা জায়গায় নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। তাদের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাত্মকান্ত আদেশ জারি করা গেল না। কেননা, নির্দিষ্ট সময়ে তারা তাদের যোগাযোগ যন্ত্র খোলা রাখে। তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে শারীরি উপস্থিতি। একজন দুঃসাহসী অফিসার বাছাই করা এক নাবিককে নিয়ে একটি নৌকায় উঠলেন এবং তারা যাতে সরে যেতে পারে সে ব্যবস্থা করেন। বিমান হামলা এড়ানোর জন্যে জাহাজগুলো বিদেশী পতাকা উড়িয়ে দিল।

৪ ডিসেম্বর রাত দু'টোর সময় চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম যুদ্ধের তাপ অনুভব করে। এ সময় একটি শক্তি বিমান একটি তৈলাধারে আঘাত হানে। পর দিন একটি নিরীহ দর্শন হালকা বিমান সাগরের দিক থেকে এগিয়ে এলো এবং ধীরে-সুস্থে গুঞ্জন তুলে নগরীর ওপর দিয়ে পাক খেতে থাকলো। রাজাকারণী ছিল উপকূলীয় কামানের রক্ষী। চট্টগ্রাম তেল শোধনাগারের আওন ধরিয়ে দেবার আগ পর্যন্ত বিপদের মাত্রা তাদের ধারণায় আসে না। এরপর এলো পাঁচটি ক্যানবেরার একটি তরঙ্গ। অ্যাড হক বিমান বিদ্রব্সী ব্যাটারি তাদের দু'টোকে গুলি করে নামাতে সক্ষম হয়। অন্য তিনটি নৌ-ঘাঁটি, বিমান বন্দর এবং তেল শোধনাগারের কাছে বোমা ফেলে ভারমুক্ত হয়ে ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে কুতুবদিয়া দ্বীপের কাছাকাছি রাতে শক্তি সেন্য অবতরণের একটি অসমর্থিত খবর আসে চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম ঘাঁটির কমোডর-ইন-চার্জ ভাবলেন ‘কুমিল্লা’, ‘রাজশাহী’ এবং (জোতড়াতালির মাধ্যমে তৈরি গানবোট) ‘বালাঘাট’কে পাঠিয়ে অবতরণের বিষয়টি অনুসন্ধান করা বিজ্ঞেচিত কাজ হবে। যখন শক্তি দরোজায় আঘাত হানছে তখন নৌ-যানগুলোকে লুকিয়ে রাখার কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পেলেন না।

বর্ণিত অবতরণস্থলে পৌছে ‘রাজশাহী’ শক্তি সেনার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। কিন্তু নিজে শক্তির চারটি হাট্টার বিমানের হামলার শিকারে পরিণত হলো। সে তার ৪০ ও ৬০

মিলিমিটার কামান দেগে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং সরাসরি চারটে আঘাত গ্রহণ করে। ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। প্রবলবেগে প্রধান কামরার ভেতর পানি ঢুকতে শুরু করলো। আগুন এবং পানি—একে অপরের চিরকালীন শক্র—দুর্ভাগ্য জলযানটিকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে যৌথভাবে শক্তি নিয়োগ করলো। কমাণ্ডিং অফিসারসহ নাবিকদের মধ্যে সাতজন আহত হলো (পরে একজন মারা যায়) কিন্তু তারা অত সহজে নৌ-যানটিকে ডুবতে দিল না। কয়েকজন আগুন নেভানো এবং অন্যরা পানির গতি রোধের চেষ্টায় নেমে গেল। সৌভাগ্যবশত নৌ-যানটিকে জুলত দেখে বিমান ফিরে গেল। নাবিকদের উন্নত প্রচেষ্টা নৌ-যানটিকে অবশেষে রক্ষা করতে সমর্থ হলো এবং তারা সেটাকে পোতাশ্রয়ে ফিরিয়ে আনলো।

এই সময় ‘রাজশাহী’র সাহায্যে ‘কুমিল্লা’ এগিয়ে আসতে পারলো না। যদিও সে মাত্র অর্ধ কিলোমিটার দূরে ছিল। কেননা, একই সময়ে ন’টি বিমান তার ওপর হামলা চালায়। এই হতভাগার ওপর দিয়ে তখন পাইলটরা লক্ষ্যভেদের অভ্যেসটা ভালভাবে সেরে নেয়। অনেকটা এই রকম—একজন লাইট ওয়েট মুক্তিযোদ্ধা অসম প্রতিদ্বন্দ্বীর বার বার আঘাতে অস্থির হয়ে উঠেছে। অবশেষে ‘কুমিল্লা’র তালিকাভুক্তি শুরু হয়ে গেল। যতক্ষণ না আর একটি আঘাতে জুলানি ট্যাংক অকেজো হয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত কুরা সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সংগ্রাম করে চলে যদিও সে আহত হয়েছিল। কমাণ্ডিং অফিসার বুঝতে পারেন যে, পরবর্তী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ৬শ রাউন্ড গোলা-বারংদে আগুন ধরে যাবে এবং সব কিছুই বিস্ফোরণে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি দু’জন অফিসার এবং ২১ জন নৌ-সেনাকে লাইফ জ্যাকেট পরে জাহাজ পরিত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। যে মুহূর্তে তিনি এবং তার কু সাগরে বাঁপ দিয়েছেন সেই মুহূর্তেই এক প্রচও বিস্ফোরণে নৌ-যানটি বিদ্রীণ হয়ে গেল। দ্রুত কাত হয়ে গেল জাহাজটি এবং ডুবে গেল।

‘বালাঘাট’ শক্র মনোযোগকে এড়াতে সক্ষম হয়েছিল। অবশেষে সে ‘কুমিল্লা’র নাবিকদের চট্টগ্রাম ঘাঁটিতে নিয়ে আসে। ‘রাজশাহী’ এবং ‘কুমিল্লা’র জীবিত নাবিকরা ঘাঁটিতে নিয়ে আসার পর আর কোন নৌ-যানকে শক্র অবতরণ অনুসন্ধান কিংবা অন্যকেন মহত্ত্ব পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে পোতাশ্রয়ের বাইরে পাঠানো হয়নি। আসলে পাঠাবার যোগ্য কোন নৌ-যানই ছিল না।

আকারের দিক দিয়ে ছেট এবং কম গুরুত্বপূর্ণ খুলনা ঘাঁটি অল্লই শাস্তি ভোগ করে। এই ঘাঁটিতে গানবোট ছিল একটি—নাম ‘ঘশোর’। আর ছিল জোড়াতালির মাধ্যমে তৈরি চারটি নৌ-যান। যুদ্ধের প্রথম দিনেই বিমান আক্রমণে দু’টো নৌ-যান ধ্বংস হয়ে যায়। বাকি তিনটি কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

বস্তুত এটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বাহিনীর জন্যে যুদ্ধের সমাপ্তি। যুদ্ধের অবশিষ্ট দিনগুলিতে নৌ-বাহিনী তার জনশক্তিকে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে উপকূল প্রহরা এবং পরে ‘দুর্গ’ প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করে। কিছু নৌ-যান অভ্যন্তরীণ জলপথে সেনাপরিবহনে সাহায্য করে। এই দায়িত্ব তারা পালন করে যায় যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত।

এর সাথে যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক দিনগুলোতেই নৌ-বাহিনী এবং বিমান বাহিনী নির্মল হয়ে গেল। এখন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ভর করছে জেনারেল নিয়াজি এবং তার ৪৫,০০০

সামরিক, ৭৩,০০০ আধা-সামরিক সৈন্যের ওপর। জেনারেলের নেতৃত্ব সাহস এবং তার সৈন্যদের দৈহিক শক্তি বিষয়টির নিষ্পত্তি করবে।

যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক দিনগুলোতে আমি জেনারেল নিয়াজিকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত দেখেছি। তিনি সাল সকাল সাড়ে আটটায় নিয়মিত বৈঠক করতেন এবং কোন অফিসার তার সংস্পর্শে এলে প্রফুল্ল মেজাজে সাক্ষাৎ দিতেন। আমি আবাক হলাম এ দেখে যে, এই সময়ে তিনি নিজের দায়িত্বাধীন এলাকার চেয়ে পশ্চিমাঞ্চলের যুদ্ধের অগ্রগতির ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ দেখাতে থাকেন। পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ-ক্ষেত্রের নির্দেশসম্পর্কে এক ইঞ্জিন মাপের একটি মানচিত্র অপারেশন রুমের দেয়ালে সঁট ছিল। প্রতিদিন সকালে নিয়াজি পৌছানোর আগে একজন স্টাফ অফিসার অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে প্রাণ সর্বশেষ সিগন্যাল অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র তুলে ধারার জন্যে মানচিত্রের ওপর বিন্দু কেটে রাখতে (জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স দারণ রকমের কাটাঁটকৃত দৈনিক যুদ্ধ পরিস্থিতির একটি বিবরণ বিতরণের ব্যবস্থা করে)।

মানচিত্রে ভারতীয় ও পাকিস্তানি বাহিনীকে নির্দেশ করা হয়েছিল লাল এবং সবুজ পেনসিলের বিন্দু বসিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্রটিতে তিনটি অথবা চারটি সবুজ বিন্দু ছিল, আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে কয়েক সেক্টিমিটার অভ্যন্তরে। বিন্দুটি শক্র ভূখণে আমাদের ঢুকে পড়ার ইঙ্গিত দেয়। সেগুলো আমার কাছে তেমন চিতাকর্মক বলে মনে হয়নি। অবশ্য বিশেষজ্ঞা বললেন, অর্জনটি মোটা রকমের।

৪ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে আমি যখন অপারেশন রুমে ঢুকলাম—সেটা তখন আনন্দ সংবাদে বুদ্ধ বুদ্ধ তুলছে। তা এই, অমৃতসরের পতন ঘটেছে এবং আমাদের সৈন্যরা ফিরোজপুরের কাছাকাছি কোথাও অবস্থান নিয়েছে। রিয়ার এ্যাডমিরাল শরীফ,—যিনি বাস্তবতার কাছাকাছি ছিলেন, জানতে চাইলেন, ‘যদি খবরটি সঠিকই হয় তাহলে তারা (জিএইচকিউ) কেন সিগনালে বলছে না?’ ‘ওহ, তারা লিখিতভাবে কিংবা রেডিওতে ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে চাইছে না—যতক্ষণ না তারা নিজেদের অর্জনকে শক্ত করতে পারছে’ তাকে বলা হলো।

খবরটি জেনারেল নিয়াজির ছোট কামরায় পৌছানোর সময় আমি সেখানে ছিলাম। তিনি চেয়ারে বসেছিলেন। খবরটি শোনামাত্র একজন মণ্ডায়োদ্ধার মতো লাফিয়ে উঠলেন এবং আবার বসে পড়েন এবং আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, ‘তুমি সর্বদাই আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এই ষলে—আমি যেন তেমন উচ্চ আশা পোষণ না করি যে, আমি যুদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্র সীমার মধ্যে নিয়ে যাব। এখন দেখ, যদিও আমি নই,—আমার বড় ভাই (পশ্চিম পাকিস্তান) তো যুদ্ধ ভারতীয় সীমাত্তের মধ্যে নিয়ে গেছে।’ তিনি তৎক্ষণাত গভর্নরকে টেলিফোন করলেন এবং তাকে এই বিরাট অগ্রগতির সংবাদ জানালেন। তিনি আরো আদেশ দিলেন যে, খবরটি সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করতে হবে। ‘এটা নেতৃত্ব দিক দিয়ে ভাল কাজ দেবে।’ কিন্তু অ্যাডমিরাল শরীফ পরামর্শ দিলেন যে, এর যথার্থতা আগে পরীক্ষা করা উচিত।

যে অফিসারটি প্রথম ঝুনেছিল তার কাছ থেকে আবার জানার জন্য আমাকে আদেশ

দেয়া হয়। ওই অফিসারের সাথে আমি যোগাযোগ করি। সে বলে যে, বিএএফ প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান সন্তুষ্ট ঢাকার পিএএফ ঘাঁটিতে খবরটি দিয়েছেন। আমি ঘাঁটিতে টেলিফোন করলাম। তারা বিমান বাহিনী প্রধানের কাছ থেকে এমন কোন খবর পায়নি বলে জানালো। ‘কিন্তু আপনারা তো খবরটি শুনেছেন।’ আমি জিজেস করলাম। ‘হ্যাঁ, ‘কোথা থেকে?’ ‘পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরের অপারেশন রুম থেকে।’ রাওয়ালপিণ্ডিতে টেলিফোন করা হলো। কিন্তু নিশ্চিত সংবাদ দিতে তারা ব্যর্থ হলো। অবশ্যে বোঝা গেল গুজবটি ভূয়া এবং এই গুজবটি যে আশার সম্ভাব করেছিল হঠাতে করে তা নৈরাশ্যের জন্ম দিল।

পরদিনের সকালটি কোন আনন্দ সংবাদ বয়ে আনলো না। সবুজ পিনটি—যা পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে আমাদের অর্জনকে নির্দেশ করছিল, সেটা চাবিশ ঘন্টা আগে যেখানে ছিল সেখানেই স্থির হয়ে রইল। আমরা রেডিও পাকিস্তানের প্রতি দৃষ্টি ফেরাই প্রত্যেকটি সংবাদ বুলেটিন শুনতে থাকি, কিন্তু তারা ‘প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী’ করার কথা ছাড়া আর কিছুই বললো না।

৬ ডিসেম্বরে এসে জেনারেল নিয়াজি পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে ভেদ করে ভারতীয় ভূখণ্ডে চুকে পড়ার কোন সংবাদের আশা পরিত্যাগ করেন। সকালের ব্রিফিং বৈঠকে তিনি জিএইচকিউ থেকে প্রাণ্ডি সিগনালের নির্যাস পড়া বন্ধ করে দেন। এবং আদেশ দেন দেয়াল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলতে। তিনি নিজেকে সংকুচিত করে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব খোলসের ভেতর চলে এলেন। অধিকতর অভিনিবেশ সহকারে অপারেশনাল মানচিত্রটি নিয়ে অনুধ্যানে বসেন। এখানে তীর চিহ্ন দিয়ে সৈন্য বিচলন নির্দেশ করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত নির্দেশকারী ক্ষুদ্র পিন থেকে এটা বড়। এই তীর চিহ্নগুলো সাধারণত শক্রের অগ্রগতির পথ এবং আমাদের প্রত্যাহারকে তুলে ধরেছে।

## প্রথম দুর্গের পতন (নবম ডিভিশন)

নবম ডিভিশন অধীন এলাকাটি অনেকটা চমৎকার করে কাটা একখণ্ড রুটির মত। উত্তর দিকে কেটেছে গঙ্গা, পদ্মা এবং পূর্ব দিকে যমনা। ভারতের পশ্চিম বাংলা প্রাদেশ লাগোয়া এই এলাকাটিতে রয়েছে খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, বরিশাল এবং ফরিদপুরের মত গুরুত্বপূর্ণ শহর।

ডিভিশন এলাকার ভারতীয় সীমান্তটি ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ, গঙ্গার দক্ষিণ তীর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ এবং কুষ্টিয়া সংযোগকারী রাস্তাটি। সীমান্ত থেকে দূরত্ব পঞ্চাশ থেকে আশি কিলোমিটারের মধ্যে এছাড়া সীমান্ত এলাকার ভেতর থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে মধুমতি নদী। প্রশস্ততা প্রায় অর্ধকিলোমিটার। জরুরি কালে নদীটি একটা উত্তম আত্মরক্ষাযুক্ত রেখা হিসেবে কাজে দিতে পারে। বাদ বাকি অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শুক্ষ। সৈন্য বিচলন, ট্রাক এবং ট্যাংকের সহজ চলাচলের জন্য উপযুক্ত।

ডিভিশনের উত্তর সীমান্তের প্রায় অর্ধেক রাজাপুর থেকে দর্শনা পর্যন্ত, এলাকাটির ভার অর্পণ করা হয় ব্রিগেডিয়ার মনজুরের অধিনায়কত্বে ৫৭ ব্রিগেডের ওপর। ঝিনাইদহকে করা হয় এর সদর দফতর। অন্যদিকে নিম্ন রেখাটি—যার বিস্তৃতি জীবননগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত,—এলাকাটির ভার অর্পিত হয় ১০৭ ব্রিগেডের ওপর। এর অধিনায়কত্ব দেয়া হয় ব্রিগেডিয়ার মাকমাদ হায়াতকে। ব্রিগেড সদর দফতর শান্তি সময়ও ডিভিশনের সদর দফতর ছিল যশোরেই। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিনেই সরিয়ে নেয়া হয় মাগুরায়,—ঝিনাইদহ ও মধুমতির প্রায় মাঝপথে শহরটি। ইপিসিএফ এবং রাজাকারণের সমন্বয়ে গঠিত একটি এডহক ব্রিগেড নিয়োগ করা হয় খুলনাতে।

অপারেশন পরিকল্পনা অনুযায়ী সৈন্যেরা বেনাপোল-দর্শনা-রাজাপুর সীমান্ত বরাবর শক্রকে বিলম্ব করিয়ে দেবার জন্য 'সময়ের প্রসার খটাবে'। অতঃপর এলাকার দু'টি দুর্গ যশোর এবং ঝিনাইদহে এসে জড় হবে। হিসেব করা হয় যে শক্র বেশি দূর গলা বাড়ানোর বুকি নেবে না যে কোন একটি দুর্গ বা দুটিকেই প্রশংসিত না করে। যদি সে অবরোধ করতে চায় তাহলে তাকে প্রত্যেকটি দুর্গের জন্য এক ডিভিশন করে সৈন্য নিয়োগ করতে হবে এবং সাফল্য অর্জনের জন্য তখন তার হাতে আর বেশি সৈন্য থাকবে না।

হিসেব আরো করা হয় যে, 'শক্র কোলাকাতা-বেনাপোল-যশোর, কৃষ্ণনগর-দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা অথবা মুর্শিদাবাদ-রাজাপুর-কুষ্টিয়া এই তিনটি প্রধান অক্ষের যে কোন একটিকে ব্যবহার করতে পারে। প্রত্যেকটির জন্য এক ডিভিশন সৈন্য শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম এবং কম দুরত্বের হচ্ছে বেনাপোল অক্ষরেখ। সুতরাং এটাই সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য আগমন পথ। এবং তারা বললেন, একজন বুদ্ধিমান শক্র কখনও সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য

ধারাকে অনুসরণ করে না। যেখানে তাকে সবচেয়ে কম আশা করা যায়,—সেখানেই সে আঘাত করে।

ভারত এই তিনটি অক্ষের একটিও ব্যবহার করলো না। পরিবর্তে সীমান্তে আমাদের ভেতর যে অবস্থানগুলো তৈরি করেছিল সেগুলোর সুর্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই রকম একটি অবস্থান ছিল গরিবপুর এলাকায়,—যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি,—যে এলাকায় শক্রকে আমরা ২১ নভেম্বর থেকে ঘেরাও করে রেখেছিলাম। নভেম্বরের শেষাশেষি দর্শনার কাছাকাছি আমরা আরেকটি অবস্থান তৈরি করি। দুটি ব্রিগেড জেলার সীমান্তে ছিল এটি। প্রথমটি পড়ে ১০৭ ব্রিগেডের অধীন এলাকার মধ্যে। আর দ্বিতীয়টি ৫৭ ব্রিগেড এলাকায়।

১৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী গরিবপুর অবস্থান থেকে বড়জোর এগার কিলোমিটার—যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে গোলা উড়ে আসতো। নভেম্বর থেকে ক্যান্টনমেন্ট ও বিমান ঘাঁটি এলাকায় শক্র কামান থেকে বিক্ষিণ্ডভাবে গোলা বর্ষিত হতে থাকে। কিন্তু তার তীব্রতা ছিল সহনীয়। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা গোলাবর্ষণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল এবং বুরিন্দা ৮আর (এই নামে সাধারণভাবে পরিচিত ছিল) এবং মোহাম্মদপুরের বেষ্টনীতে ফাটল সৃষ্টিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা অবস্থানকে ধরে বাখলো। ৬ পাঞ্চাব, ১২ পাঞ্চাব, ২১ পাঞ্চাব (এক কোম্পানি কম) এবং ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের এক কোম্পানি সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল আমাদের শক্তি। তারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ঘাট ঘট্টা ধরে শক্র সংগে লড়ে। আশংকা করা হলো, শক্র ভেতরে ঢুকে পড়ায় যদি সাফল্য অর্জন করতে পারে, তাহলে সে সরাসরি যশোরে আঘাত হানবে এবং আমাদের ব্রিগেড কমান্ডারকে সীমান্ত থেকে নিজ সৈন্যদের গুটিয়ে এনে দুর্গ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সময় দেবে না। ব্রিগেড কমান্ডারের সৈন্যরা সবচেয়ে কাছাকাছি এলাকা বলতে ছিল বেনাপোলে আর দূরের এলাকা বলতে ছিল সাতক্ষীরায়। যশোর থেকে প্রথম এলাকাটির দূরত্ব ৪৩ কিলোমিটার আর দ্বিতীয়টির নবরই কিলোমিটার।

একজন আদ্যোপাত্ত পেশাদার ব্রিগেডিয়ার মাকমাদ হায়াত সম্যক বিপদকে উপলব্ধি করলেন এবং তার জিওসি'র কাছে অনুমতি চাইলেন যাতে তিনি তার বিস্তৃত আঙুলগুলি সময় মতো গুটিয়ে আনতে পারেন যশোরে মুঠো তৈরির জন্য (যেখানে কোন নিয়মিত সৈন্যই ছিল না)। পঞ্চাংভাগে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে বসে জেনারেল নিয়াজির আদেশের কথা উল্লেখ করে জেনারেল আনসারী প্রত্যাহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে বলেন, সীমান্তে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ক্ষয়ক্ষতি না হওয়া প্রয়োজন কোন প্রত্যাহার চলবে না।

ব্রিগেডিয়ার হায়াত হিসেব করে দেখেন, যদি আফরা অক্ষ থেকে গরিবপুর প্রতিরক্ষা যুদ্ধ সরিয়ে আনা যায় তাহলে শক্রকে খুলনার দিকে টেনে আনায় প্রলোভিত করা যাবে। এটা যশোরে মুখোযুথি হওয়ার চেয়ে উত্তম। ফলে তিনি সমস্ত গোলাবারুদের একটি অংশ যশোর থেকে খুলনায় স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন। অবশ্য মাওরায় প্রত্যাহারের বিকল্প পথও খোলা ছিল তার জন্য। আর মাওরা তার ডিভিশনের সদর দফতর। বিলম্বকরণ প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ চালিয়ে গিয়ে তিনি মধ্যমতি নদীতে যেতে পারতেন। এবং নদী অতিক্রম করে শক্র জন্য এক দীর্ঘতর প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারতেন। প্রচুর গোলাবারুদ ছিল তার। পঞ্চাংভাগে

মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে ফরিদপুরে রেশনও পাওয়া যেত।

ব্রিগেডিয়ার হায়াতের অফিসারবা যুক্তি দেখান যে, মধুমতি রক্ষা ব্যবস্থা কখনও অপারেশন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তারা বললেন, ‘প্রবেশ নিষিদ্ধ রেখা’ তাদের জন্য যশোর-বিনাইদহ রাস্তাকেই নির্ধারিত করে। জেনারেল নিয়াজির চিকিৎসা স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর পরে জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘মধুমতি রক্ষা রেখা’ আলোচিত হয় এবং জেনারেল আনসারীর সঙ্গে বসে চূড়ান্তও করা হয়েছিল। কিন্তু অপারেশন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এই আশংকায় যে, ‘প্রবেশ নিষিদ্ধ রেখা’ দূর্বল হয়ে পড়বে এবং সৈন্যরা পেছনে তাকাতে পারে। পরিকল্পনায় কী ছিল কী ছিল না—তা নিয়ে নয়; ব্রিগেডিয়ার হায়াত এটাকে বাতিল করে দেন এবং তার মূল্য ভাবনা,—খুলনার দিকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে অবিচল থাকেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিষয়টি গোপন রাখেন। তিনি এ ব্যাপারটিতে তার একজন কমান্ডিং অফিসারকে ভাগিদার করেন। একমাত্র তার ওপরই তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ৫ ডিসেম্বর দুপুর বেলার দিকে তিনি তাকে পশ্চত্তে বললেন, ‘ঝিমোবে না। মনে রেখো, যদি যশোর ত্যাগ করি তাহলে আমরা খুলনা যাচ্ছি।’

ইতিমধ্যে শক্র ১২ পাঞ্জাব, ২১ পাঞ্জাব এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের এক কোম্পানিকে তিনি কিলোমিটার পেছনে ঠেলে দিয়ে গরিবপুর অবস্থানে তার বিস্তৃতি ঘটালো। ফলে কায়মখোলা-সন্তোষনগর-অমৃতনগর হল আমাদের নতুন প্রতিরক্ষা রেখা। কিন্তু গলবন্ধটি তখনো শক্রুর কঠকে বেষ্টন করে রেখেছে।

নতুন প্রতিরক্ষা বেষ্টনী তৈরি হওয়ায় বেনাপোল অক্ষে প্রহরারত প্রতিবেশী ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের অবস্থানে পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পশ্চাত্ভাগে চার কিলোমিটার দূরে শার্শাতে বেনাপোলের কোম্পানিকে সরিয়ে আনা হলো। যশোর রোডেই সদর দফতর করে দ্বিতীয় কোম্পানি ছিল রঘুনাথপুরে, সেটাকে প্রত্যাহার করে আনা হলো ঝিকরগাছাতে।

৬ ডিসেম্বরে শক্র তার নবম ডিভিশনের সমগ্র চাপ আফরা অক্ষে প্রয়োগ করলো। সকালের প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। বেলা এগারটার দিকে তারা আরেকটা চেষ্টা চালায়। কিন্তু ফল উৎপাদক হয় না। মধ্যাহ্ন ভোজের পর পরই তৃতীয় আঘাতটি হানে। এইবার আংশিক সফলতা এলো তাদের। আফরা অক্ষের ডানদিকে তারা এক প্ল্যাটুন সৈন্যকে হটিয়ে দিল। কিন্তু ছেউ একটি ফাঁক ছিল এখানে। রিজার্ভ সৈন্যের অভাবে সেখানে ছিপি আঁটা সম্ভব হয়নি। ৮ পাঞ্জাবের সেকেন্ড-ইন কমান্ড মেজর ইয়াহিয়া ভাবলেন, অবস্থার এই মোড় পরিবর্তনের সংবাদ ব্রিগেড সদর দফতরে পৌছে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি বার্তা পাঠালেন যে, শক্রুর ট্যাংক ও সাঁজোয়া বহরের পরিবহণ যান ফাঁকা এলাকা দিয়ে দ্রুত যশোর-বিনাইদহ রোডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বার্তাটি ব্রিগেডিয়ার হায়াতের কাছে পৌছে বেলা তিনটায়। তখন তার পাশে ছিলেন ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামস। তিনি শামসকে বেনাপোল-যশোর রোড থেকে তার ব্যাটালিয়ন প্রত্যাহারের আদেশ দিলেন এবং খুলনা থেকে উনিশ কিলোমিটার দূরে নওয়াপাড়ার দিকে রওনা হতে বললেন। আর আর ব্যাটালিয়নের নিরাপদ গমন নিশ্চিত করার জন্য যশোর শহরের রেল জংশনে এক কোম্পানি সৈন্য রাখতেও বলেন। সেই মতে সকল অধিনায়কদের

জানিয়ে দেয়া হলো ।

৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ব্রিগেড সদর দফতর যশোর পরিত্যাগ করে । দুর্গ পরিত্যক্ত হল কিন্তু একটি গুলিও ছোঁড়া হলো না । এমন কী তারা স্থুপকৃত মূল্যবান গোলাবারণ্ডও ধ্বংস করলো না । শক্র ধারণা করে যশোর একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে । সে কারণে তারা পরদিন সকাল এগারটা পর্যন্ত দখলে নেবার জন্য এগোয়নি । এমনকী যশোরের পতনের পর দু'দিন পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড দাবি করে চলে যে, সেখানে এখনও যুদ্ধ চলছে । ইতিমধ্যে অনেক বিদেশী সাংবাদিক, যারা ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যশোরে প্রবেশ করে, তারা ঢাকায় পৌছে আমাদের এই অবাস্তব দাবি নিয়ে বিদ্রুপ করতে থাকেন । তারা বললেন, আমাদের ব্রিগেড কমান্ডারের শূন্য তাঁর তারা দেখেছেন, দেখেছেন ছাইদানি তার আধা পোড়া সিগারেটও । একই অবস্থা ছিল পরিত্যক্ত ব্রিগেড সদর দফতরের । সেখানকার কেরানিয়া তাদের ট্রাইপরাইটার থেকে কাগজ বের করে আনার সময়ও পায়নি ।

অনেক অফিসারই ৬ ডিসেম্বরের শেষ বিকেল পর্যন্ত যশোর-ঝিনাইদহ এবং যশোর-মাগুরা রোডে যাতায়াত করেছে । কিন্তু ব্রিগেড প্রত্যাহারের সম্ভাব্য এই সব পথে শক্র সেনার উপস্থিতি কোন চিহ্নই দেখতে পায়নি । আসলে লেফ্টেন্যান্ট কর্নেল এহসান দেখেন, মাগুরা রোডের ফেরিঘাটে নিয়োজিত আমাদের একদল সামরিক পুলিশ পশ্চাত্যদিকে ফিরে আসা যানবাহনকে মাগুরার দিকে যাওয়ার নির্দেশনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে । একইভাবে আমাদের সরবরাহ ও পরিবহণ (এস এবং টি) যানগুলো নির্বিঘ্নে চলাচল করেছে । শক্রের কোন বাধার সামনাসামনি হতে হয়নি । এতে এটাই প্রমাণ করে, ব্রিগেডিয়ার হায়াত মাগুরায় তার ব্রিগেড প্রত্যাহারের জন্য যে কোন একটি পথ ব্যবহার করতে পারতেন ।

৬ এবং ৭ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতটি ১০৭ ব্রিগেডের অধীন সৈন্যদের জন্য ছিল ভীষণ রকমের উত্তেজনাকর । মানসিকভাবে তারা যশোর দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে । তখন তাদেরকে চলত গাড়িতে উঠে পড়ে নওয়াপাড়ায় যেতে বলা হয়— যে গন্ত ব্যস্তলটি তারা কখনো দেখেনি কিংবা আগে কখনো আলোচিত হয়নি । দারুণ রকমের বিভাসির মধ্যে প্রত্যাহার হলো । রেল জংশনের কোম্পানি কমান্ডার পরে আমাকে বলেন, যানজট কাটিয়ে উঠে খুলনার দিকে এগিয়ে যাওয়া রীতিমত খাটনির কাজ হয়ে দাঁড়ায় ।

প্রায় মধ্যরাতের দিকে নওয়াপাড়ার পরিবর্তে গরিবপুরের দিকে একটি অ্যাম্বুলেন্সকে ধাবিত হলে দেখা গেল । একজন অফিসার গাড়িটিকে থামিয়ে চিৎকার করে বললেন,— ‘এই নির্বোধ, খুলনার রাস্তা কোনদিকে জান না? তুমি তো উল্টো দিকে যাচ্ছে ।’ ‘হ্যাঁ স্যার,’ সে বিনম্র কঢ়ে বললো, ‘আমি জানি খুলনার রাস্তা কোন দিকে । কিন্তু গরিবপুরে একজন আহত সৈনিককে কথা দিয়ে এসেছি দ্বিতীয় ট্রিপে আমি তাকে তুলে নিয়ে আসবো । সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে ।’

১০৭ ব্রিগেড একটানা পথ চলায় নওয়াপাড়ার কাছাকাছি মাইল<sup>1</sup> ফলক ২০-তে পৌছতে পারলো না । প্রথমে থামে মাইল ফলক ৩০-এ; তারপর থামে মাইল ফলক-২৫-এ । কিন্তু হতভঙ্গ সৈন্যরা নতুন পরিবেশে তাদের অস্থায়ী রক্ষাবৃহত্তে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে

১. এ সময় পাকিস্তান মুদ্রা ব্যবস্থায় ছাড়া মেট্রিক পদ্ধতি এহণ করেনি ।

পারলো না। ১০ ডিসেম্বর মাইল ফলক কুড়ি (নওয়াপাড়া) অক্ষে তারা তাদের প্রথম যুদ্ধটি লড়ে এবং ১১ ডিসেম্বর মাইল ফলক-৯-এ (দৌলতপুর) পিছিয়ে আসে। ১৬ ডিসেম্বর খুলনায় প্রত্যাহারের জন্য তারা তৈরি হচ্ছে তখন ঢাকায় যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বিগেডিয়ার হায়াতের কাছে অন্ত সম্ভরণের আদেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়—যিনি একটি ব্যক্তিগত যুদ্ধে সাফল্যের সাথে লড়ার যাবতীয় কৃতিত্বের দাবিদার।

খুলনার এডহক বিগেডেকে কখনও পরীক্ষায় নামানো হয়নি। মূলত যশোর দুর্গের পতনের পর খুলনাকে ধরে রাখায় আর আস্তাবান ছিল না কেউ। সুতরাং ৬/৭ ডিসেম্বরে প্রাণ্য যাবতীয় পরিবহণে এই বিগেডটি ঢাকার পথে রওনা হয়ে গেল। খুলনা মৌ-ঘাঁটির দায়িত্বে ছিলেন কমান্ডার গুলজারিন। নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে একটি গানবেট নিয়ে সাগরের দিকে পালিয়ে যান। খুলনার প্রত্যাহার যশোর দুর্গের অক্ষমাং পরিত্যক্তকরণের সাথে সাম্যজ্য-পূর্ণ ছিল না।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সদর দফতর খুলনার সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ কিংবা কমান্ডার গুলজারিনের পলায়নের খবর ওই দিন জানতে পারেনি। এরা তখনও খুলনা গ্যারিসনের দীর্ঘ জীবৎকালের কাল্পনিক গল্প ফেঁদে চলেছে। অথচ এরা জানতো, পশ্চাদপসরণকারী ১০৭ বিগেডের কাছে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদও নেই। সেখানে মূল্যবান সব গোলাবারুদ পাঠানো হয় হেলিকপ্টারে করে। সেনা পরিবহণের অকুতোভয় পাইলটরা রাতে সে সব খুলনায় পৌছে দেয় কিন্তু কোন কাজেই লাগে না।

এখন আমরা বিগেডিয়ার মনজুরের ৫৭ বিগেডের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি,—যাকে ৪ ভারতীয় মাউন্টেইন ডিভিশনের মোকাবেলা করতে হয়। বিগেডে ছিল ২৯ বালুচ, ১৮ পাঞ্চাব, ১২ পাঞ্চাবের (পর্যবেক্ষণ ও সহায়ক) একটি কোম্পানি এবং ৫০ পাঞ্চাবের দুটি কোম্পানি। এছাড়া ছিল এক রেজিমেন্ট গোলন্দাজ ও এক ক্ষোয়াড্রন এম-২৪ ট্যাংক (কোর রিজার্ভ)। ন্যূ স্বত্বাবের মানুষ বিগেডিয়ার মনজুর যখন তার সদর দফতরে (ঝিনাইদহ) পায়চারী করছিলেন সেই সময় শোনেন যে, শক্র জীবনগর এলাকায় তার সেতুমুখের বিস্তৃতি ঘটাবার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে চলেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর দর্শনার প্রতি হমকি সৃষ্টি করেছে। তিনি অনুমান করেন, দর্শনার যদি পতন ঘটে তাহলে গর্ভনর মালিকের নিজ শহর চুয়াড়ঙ্গা রক্ষামূলক আচ্ছাদন থেকে বাস্তিত হবে। শক্র তখন ঝিনাইদহ কিংবা কুষ্টিয়ার দিকে অবাধে ধাবিত হবে পারবে। অতএব, তিনি নিজেই গেলেন সে এলাকায়,—যাতে সীমান্তে শক্রকে যত বেশি সময় ঠেকিয়ে রাখা যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু তার উপস্থিতি সত্ত্বেও যুদ্ধ শুরুর দিনেই দর্শনার পতন ঘটে। বিগেডিয়ার মনজুর সীমান্ত চৌকিগুলি থেকে তার সৈন্যদের সংগ্রহ করে চুয়াড়ঙ্গায় জড় করেন শক্রের মুখোযুধি হবার জন্য।

কিন্তু শক্রের অগ্র পদক্ষেপের সঠিক গতি সম্পর্কে তখনও নিশ্চিত হওয়া গেল না। চুয়াড়ঙ্গার রাস্তায় তাকে দেখা গেল না। সম্ভবত সে কালিগঞ্জের রাস্তা দিয়ে এগোনটাই পচ্চন্দ করেছে। এতে ঝিনাইদহ-যশোর সড়ককে বিচ্ছিন্ন করা যাবে এবং অন্যান্য সেনা কলাম,—যারা আমাদের আফরা প্রতিরক্ষাকে ভেদ করেছে—তাদের সঙ্গে এই বাহিনী মিলিত হতে পারবে। অতএব, নবম ডিভিশনের কর্নেল স্টাফ কর্নেল আফ্রিদীর অধিনায়কত্বে

৩৮ এফ এফ এবং ৫০ পাঞ্জাবের (বিয়োগকৃত)<sup>২</sup> সমন্বয়ে একটি টাঙ্ক ফোর্স গঠন করে কালিগঞ্জের কাছাকাছি নিয়োগ করা হয় শক্র অঞ্চলি পর্যবেক্ষণের জন্য। অবাক করার বিষয়, শক্র কালিগঞ্জের পথেও গেল না। বদলে সুত্তিবাহিনী,—যারা এই ভূখণ্ডের প্রতিটি ইঞ্জিনে ভালো করে তাদের প্রদর্শিত পথে গ্রামের ভেতর দিয়ে সে সাধুহাটির কাছে গিয়ে চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ রাস্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্থানটি চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহের মধ্যবর্তী পথে। ৪/৫ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এক কোম্পানি পদাতিক সৈন্য এবং কয়েকটি ট্যাংক এই স্থানে পৌছে। কিন্তু পর দিন সকাল দশটার আগ পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার মনজুর তাদের আবিষ্কার করতে সক্ষম হন না। কয়েকটি প্রশাসনিক যানবাহন চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহে চলাকালীন সড়ক প্রতিবন্ধকে ধাক্কা খায় এবং আবিষ্কৃত হয়।

পুরো ব্রিগেড নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার মনজুরের সামনে একটি দু'টি বিকল্প রয়েছে। প্রথমত, দ্রুত তিনি রোড ব্রককে নিষ্কায় করে ঝিনাইদহ দুর্গ দখল করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ডিভিশনের একটি 'শক্তি কেন্দ্র' হিসেবে চুয়াডাঙ্গায় থেকে যেতে পারেন,—যা পূর্ব দিকে চাপ সৃষ্টিকারী শক্র জন্য বিশেষ উৎসেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তিনি কোনটাই করলেন না। পরিবর্তে তিনি সাধুহাটিতে একটি আধা খেঁড়া ধরনের প্রচেষ্টা চালান। রোড ব্রকের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য তিনি সর্বপ্রথম একজন অফিসার পাঠান। তারপর রোড ব্রক অপসারণের জন্য একটি ছোট আকারের সেনাদল প্রেরণ করেন। অবশ্যে শক্রকে উচ্ছেদের জন্য মেজর জাহিদের অধীনে এক প্লাটুন সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু আকালেই ফেরত নিয়ে এলেন যখন জানালেন ইতিমধ্যেই শক্র ওই অবস্থানে তার শক্তিকে এক ব্যাটালিয়ন ও এক ক্ষোয়াড়ন ট্যাংকে উন্নীত করেছে। তিনি দেখলেন একটি পদাতিক ব্যাটালিয়নের জন্য এটি একটি দুঃসাধ্য কাজ।

সাধুহাটি রোড ব্রকের দায়িত্বে নিয়োজিত মুখ্য যে ব্যক্তি ছিল—সেই ভারতীয় মেজর পরে মেজর জাহিদের কাছে স্থাকার করে যে, প্রথম চরিশ ঘন্টা তিনি কাঁপছিলেন এবং অভিশাপ দিতে থাকেন তার উর্বরতন অফিসারকে,—যিনি তাকে ওই স্থানে পাঠান মাত্র একটি কোম্পানি দিয়ে। ঠেলে দেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুটি চোয়াল—ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গার মধ্যে। সৌভাগ্যবশত পাকিস্তানিদের মুখোমুখি হবার আগেই ভারতীয় সৈন্যের পুনঃসমাবেশ ঘটে। নবম ডিভিশনের ব্রিগেডের জন্যই ৬ ডিসেম্বর ছিল একটি সংকটময় দিন। একটি সাব-সেক্টর থেকে ব্রিগেডিয়ার মনজুর ঝিনাইদহ যাওয়ার রাস্তা উন্মুক্তকরণের আশা পরিত্যাগ করেন। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার হায়াত যশোর পরিত্যাগ করেছেন। জিওসি,—যিনি মাওরায় থাকতেন এবং অধিকাংশ সময় কাটাতেন নামাজের পাটিতে। সন্ধ্যার দিকে তিনি মনজুরের ব্রিগেড মেজরকে টেলিফোনে বললেন, 'জাফর হচ্ছে কী?' 'তেমন কিছু নয়,' সে জাবাব দেয়। 'আমার মনে হয় তোমাদের মাওরায় চলে আসা উচিত। যশোরের ইতিমধ্যেই পতন ঘটেছে। আফ্রিদীকে বলো পিছিয়ে আসতে। ডিভিশনাল সদর দফতর রক্ষার জন্য এখানে কিছুই নেই।' একই রাতে কর্নেল আফ্রিদীর বাহিনীকে কালিগঞ্জ থেকে ঝিনাইদহে সরিয়ে আনা হয় এবং পরদিন সকালে বিনা যুক্তে ঝিনাইদহ ও পরিত্যক্ত

২. এক ব্যাটালিয়নের কম

হলো। সকাল এগারটায় আমাদের সর্বশেষ যানটি 'দুর্গ' ছেড়ে বেরিয়ে আসে। শক্র এটা দখল করে সন্ধ্যার দিকে।

ইতিমধোই ব্রিগেডিয়ার মনজুর কৃষ্ণিয়ায় গঙ্গার (পদ্মা) ওপর হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে তার ব্রিগেডকে নিয়ে গেলেন। ৮ ডিসেম্বর শেষ রাতে তিনি সেখানে পৌছেন এবং দ্রুত শহরের বহিসীমানা রক্ষায় সেনা সমাবেশ ঘটান। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সদর দফতর তাকে ঝিনাইদহের দিক থেকে পথ করে নিতে অথবা রেল লাইন ধরে মাগুরার দিকে সরে আসতে বললো। কিন্তু দুটোতেই তিনি তার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণিয়ায় থেকে যাওয়াকেই তিনি অধিকতর শ্রেয় মনে করেন। ৮/৯ ডিসেম্বর রাতটি তিনি সেখানে কাটান। পরদিন সকালে ঝিনাইদহের দিক থেকে শক্র মুখোমুখি হলেন। শক্রকে বাজিয়ে দেখার জন্য মনজুর মেজর জাহিদের অধিনায়কত্বে ১৮ পাঞ্জাবের এক কোম্পানি সৈন্য এবং মেজর শের-উর-রহমানের অধিনায়কত্বে অর্ধ ক্ষোয়াড্রন ট্যাংকের একটি বহর পাঠালেন। লড়াই শুরু হলো বেলা একটায় এবং প্রায় তিনি ঘন্টা ধরে চলে। এটাই সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ লড়াই,—যা সমস্ত যুদ্ধে এই ব্রিগেডটি লড়ে।

লড়াইয়ের ফলাফল আমাদের পক্ষেই আসে। লোভনীয় বীরত্বপূর্ণ পুরক্ষার—মিলটারি ক্রসের সমান্তরাল,—‘সিতারা-ই-জুরাত’ উপাধি লাভ করেন মেজর জাহিদ ও মেজর শের-উর-রহমান। শক্র পিছু হটে গেল এবং ফেলে রেখে গেল মৃত এবং আহতদের। শক্র মৃতদেহগুলো,—যার মধ্যে একজন ভারতীয় জেনারেলের পুত্র ছিল, সেগুলো মাঠে এবং রাস্তার পাশে উঁচু বাঁধের ঢালে পড়ে ছিল। এর মধ্যে কতগুলো আমাদের এম-২৪ ট্যাংকের ঢাকার নীচে পড়ে পিষ্ট হয়। পরে ‘মৃতদেহের অঙ্গচেদ’ করার অভিযোগে অপরাধী করে শক্র তার এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে বন্দিদশায় মেজর শের-উর-রহমান ও মেজর জাহিদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে।

ব্রিগেডিয়ার মনজুর যেমনটি ভেবেছিলেন কৃষ্ণিয়া তেমন নিরাপদ স্থান হলো না। শক্র গোলন্দাজ এবং বিমান বাহিনী তার বৃক্ষ-বুর্জের ওপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে কিন্তু জবাব দেবার মত সঙ্গতি তার ছিল না। মেহাইয়ের মত অবস্থা,—অসহায়ভাবে হাতুড়ির আঘাত খেতে থাকেন। অবুধাবন করতে তার একদিনের বেশি সময় লাগে না যে, প্রতিরক্ষার জন্য কৃষ্ণিয়া কোন জায়গা নয়। কিন্তু কোথায় তিনি যেতে পারেন? হার্ডিঞ্জ সেতু খুব কাছে। সেতুটি তাকে গঙ্গার ওপারে ঘোড়শ ডিভিশনের শক্তি বৃদ্ধিতেও লাগাতে পারেন।

ব্রিগেডিয়ার মনজুরের ব্রিগেড ১০/১১ ডিসেম্বর রাতে কৃষ্ণিয়া পরিত্যাগ করে। ১১ ডিসেম্বরে ব্রিগেডের অধিকাংশ যান, উপকরণ এবং লোকজন নিরাপদে নদী অতিক্রম করে ঘোড়শ ডিভিশনের এলাকায় পৌছে যায়। কিন্তু ১২ ডিসেম্বরের সকালে ভারতীয় বাহিনী,—সম্ভবত এত দিনে সেতুটিকে অব্যাহতি দিয়েছিল। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সবকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে এবং সরাসরি আঘাত হানে ১,৭৯৫ মিটার দৈর্ঘ্য সেতুটির একটি খিলানের ওপর। এখন নদী অতিক্রম করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

অবস্থার আরো অবনতি ঘটে যখন কৃষ্ণিয়ার দেশপ্রেমিক অংশের জনগণ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে এলো প্রত্যাহত পাকিস্তানি সৈন্যদের অনুগমন করতে। মুক্তিবাহিনীর হাতে

ভয়াবহ পরিণতির ভয়ে ভীত ছিল তারা। পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে নিজেদের ভাগ্য বরণ করে নেয়াকে তারা অধিকতর শ্রেয় মনে করে। এইসব পুরুষ, নারী ও শিশুদের এবং সাথে তাদের মূল্যবান সহায়-সম্পত্তি বয়ে নিয়ে আসে। মেজর রাঠোর (প্রকৌশলী),— যিনি তাদেরকে পারাপার করছিলেন,— সেগুলো তার অগ্নি পরীক্ষাকে তীব্রতর করে। তাদের প্রতি তার যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি আছে ব্রিগেড সৈন্যদের প্রতিও। তাদের নিরাপদে পৌছে দেয়ার কাজে তাই তিনি সর্বক্ষণ বিরামহীনভাবে পরিবহণে ব্যস্ত থাকলেন। এক বৃদ্ধার কথা তার স্পষ্ট মনে আছে। সে তার সারা জীবনের সঞ্চয় বাম বগলে শক্ত করে চেপে রেখেছে এবং ডান হাতে দিয়ে ধরে ধরে ঝঠার চেষ্টা করছে। একজন পাকিস্তানি সৈন্য তাকে সাহায্য করে। দ্রুত সে নদীর অপর পাড়ে পৌছে যায়। নবম ডিভিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫৭ ব্রিগেডের পরিসমাপ্তি ঘটলো এখানেই।

আমাদের নবম ডিভিশনকে কেটে আলাদা করা হয়। পশ্চাদ্বাবনে ১০৭ ব্রিগেড গিয়ে উপনীত হয় খুলনাতে আর ৫৭ ব্রিগেডকে ঠেলে গঙ্গা অতিক্রম করানো হয়। সর্বশেষে জেনারেল আনসারীর হাতে যা ছিল—সেটা দুর্বলতর শক্তি। ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্য এবং ৫০ পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত বাহিনী। প্রথমে তাদেরকে মাওরার কাছাকাছি নিয়োজিত করা হয়। পরে সরিয়ে নেয়া হয় মধুমতি নদীর পূর্ব পাড়ে। শক্র তাদের অনুসরণ করলো না। পার্শ্বভাগ থেকে আক্রমণের হৃষ্কিককে সে সর্বপ্রথম নিশ্চিহ্ন করতে চাইলো। ৫৭ ব্রিগেডের গঙ্গা অতিক্রমের দুইদিন পর ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের মধুমতি রক্ষাবৃত্তে আক্রমণ চালালো। আমাদের সৈন্যরা তাদের অবস্থান ধরে রাখলো। সামনাসামনি ব্যস্ত রেখে শক্র নদী অতিক্রমের জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে লাগলো। রাতে প্রায় সাত কিলোমিটার উজানে নিয়ে গিয়ে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে উপযুক্ত অতিক্রম স্থানে হাজির করায়। সেখানে ভারতীয়রা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমণে ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করলো এবং পার্শ্বদেশ থেকে আমাদের সৈন্যদের ওপর বাঁপিয়ে পড়লো। আঘাতে আঘাতে ক্ষয়িক্ষণ ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং অমিশ্রিত ৫০ পাঞ্জাব নড়বড়ে হয়ে গেল। ১৫ ডিসেম্বর তাদেরকে মধুমতি থেকে সরিয়ে এনে জেনারেল আনসারীর নতুন সদর দফতর ফরিদপুরের পশ্চিমে নিয়োজিত করা হল। ১৬ ডিসেম্বরে শক্র মুখোয়াখি হতে যাচ্ছে তারা,—এমন সময় ঢাকা থেকে ‘যুদ্ধ বিরতির’ আদেশ পৌছে গেল তাদের কাছে।

## উত্তরে পতন (মোড়শ ডিভিশন)

ভঙ্গিল উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভার একজন উদার ও সাহসী জেনারেলের ওপর ন্যস্ত ছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য এপ্টিলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শোড়শ ডিভিশন এসে পৌছানোর সময় থেকে জেনারেল নজর হসেন শাহ সেখানেই ছিলেন। বিদ্রোহীদের তাড়া করে ফিরে এবং তাদের সঙ্গে লড়াতে গিয়ে তিনি যুদ্ধের আগেই এ অঞ্চলের প্রতি ইঞ্চি ভাল করে চিনে ফেলেন।

দক্ষিণে পদ্মা এবং পুরো যমুনা,—এ বিরাট অঞ্চল নিয়ে উত্তরবঙ্গ, একে রক্ষা করতে হবে একটি ডিভিশনকে। এর আওতায় পড়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তের উত্তর অংশের অর্ধভাগ এবং উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের পশ্চিমাংশের অর্ধভাগ। এখনকার ভূমি সাধারণত শুষ্ক—প্রদেশের বাকি অংশ থেকে অধিকতর শুষ্ক। এ কারণে একমাত্র ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট ২৯ ক্যাভালরিকে এ অঞ্চলে রাখা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বাধা ছিল তিস্তা নদী,—যা উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর প্রবাহিত হয়ে পাটিঘাট, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাটকে একটি আলাদা উপ-অঞ্চলে পরিণত করেছে। রেল এবং সড়ক যোগাযোগ উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত। রেলপথ সীমান্তের কাছাকাছি এবং সড়কপথ প্রায় মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে গেছে। যেহেতু দক্ষিণ থেকে উত্তরে রেলপথে যাওয়া সম্ভব ছিল না, সে কারণে ডিভিশনের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ১০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ বগুড়া-রংপুর সড়কপথেই পাঠানো হতো। সীমান্ত থেকে সড়কটির দূরত্ব চালুশ কিলোমিটার।

এ সেচ্চের শক্তির উদ্দেশ্য কী হতে পারে, সে কী পথের যাবতীয় বাধা অপসারণ করে শিলিঙ্গড়ির মধ্যবর্তী ফাটল দিয়ে জলপ্রবাহের মত বগুড়ার দিকে ধাবিত হবে? অথবা হিল-চিলমারী অক্ষরেখাকে ছিন্ন করতে সে কী আঘাত হানবে? দু'টি ক্ষেত্রেই সে ‘বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যুক্ত করতে পারবে।’ ডিভিশন তার সমর-সম্ভাব সেই মতে নিয়োগ করে। সুতরাং ২০৫ ব্রিগেডের (তাজামূল) অংশ হিসেবে,—যার সদর দফতর বগুড়ায়, তার অধীনে সে তার অন্যতম ক্রাক ব্যাটালিয়ন ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে হিলিতে নিয়োগ করে। উত্তরাঞ্চলের প্রবেশ পথের দায়িত্ব অর্পিত হয় ২৩ ব্রিগেডের (আনসারী) ওপর। রংপুর এর সদর দফতর। তৃতীয় ব্রিগেডটিকে (৩৪ ব্রিগেড) ব্রিগেডিয়ার নঙ্গেরের অধিনায়কত্বে দিয়ে নাটোরে রাখা হয়। অন্যদিকে যে এডহক ব্রিগেডটি সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে সৃষ্টি করা হয়, সেটাকে দক্ষিণে রাজশাহীতে নিয়োগ করা হলো পদ্মা দিয়ে আসা যে কোন জলপথ অপারেশনকে ঠেকাতে।

দুর্ভ বস্তু ট্যাঙ্ক—যা ছিল ২৯ ক্যাভালরির সঙ্গে, তিনটি ব্রিগেডকে ভাগ করে দেয়া হলো। ২৩ ব্রিগেডের ভাগে পড়ে এক ক্ষোয়াড়ন ট্যাঙ্ক। সেটিকে সে বোদা-ঠাকুরগাঁও অক্ষে নিয়োগ করে। ২০৫ ব্রিগেড তার ভাগে পড়া ট্যাঙ্ক বহরকে রেখে দেয় নওগাঁ এলাকার সঙ্গে। রাখে প্রতিবেশী বালুঘাট এলাকায় আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালাবার জন্য ১৩ ফ্রন্টিয়ার

ফোর্সকে। ৩৪ ব্রিগেড পেল এক ক্ষোয়াড্রন সেটাকে হার্ডিং সেতুর কাছে নিয়োগ করে। এই ক্ষোয়াড্রনটি আবার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জেনারেল স্টাফের রিজার্ভ ক্ষোয়াড্রন ছিল। এটাকে একমাত্র পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অনুমতি সাপেক্ষেই ব্যবহার করা যাবে। এ ট্যাংকগুলো সেই একই ট্যাংক—যা ব্রিগেডিয়ার মনজুরকে (৫৭ ব্রিগেড) ধার দেয়া হয় কৃষ্ণিয়ার যুদ্ধে লড়ার জন্য। রেজিমেন্টের চতুর্থ ক্ষোয়াড্রনটি আবার ‘দল’-এ ভাগ করা হলো এবং অন্যান্য স্থাপনার মাঝে ভাগ করে দেয়া হলো।

অতীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এম-২৪ ট্যাংক বড় রকমের গর্বের বিষয় ছিল। দাবি করা হয় যে, এগুলো কোরীয় যুদ্ধে (১৯৫১) অংশগ্রহণ করে। কামানের খৌজগুলো ক্ষয় পাওয়ার কারণে পান্ত্রাহস পায়। ফলে ১০০০ মিটার দূরত্বের অধিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ছিল না। এর বিপরীতে ভারতের ছিল অত্যাধুনিক ট্যাংক। রাশিয়া থেকে পাওয়া তার ‘টি’ শ্রেণীভুক্ত (টি-৫৫, টি-৫৬) ট্যাংক ভারত অথবা পাকিস্তানের যে কোন ট্যাংক থেকে ছিল বহুন কর্মশক্তি সম্পন্ন। ভারতের নিজস্ব ট্যাংক (বৈজ্যত্বী) এই আমদানিকৃত যন্ত্রগুলোর গোলাবর্ষণের সম্পূরক হিসেবে কাজ দেয়। স্পষ্টতই এটা একটা অসম যুদ্ধ ছিল।

এ সেষ্টের প্রকৃত যুদ্ধের বিবরণীতে যাওয়ার আগে—৩ৱা ডিসেম্বরে এ অঞ্চলের পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা সংক্ষেপে দেখা করা যাক। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভারত হিলির প্রতি গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ নিবিষ্ট করে। সে তার ডিভিশন ২০-কে তার যাবতীয় সাঁজোয়া এবং গোলান্দাজ বহরসহ সেখানে নিয়োগ করে। কয়েক সপ্তাহ ধরে কামান ও মার্টারের গোলাবর্ষণ দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। মাঝে মধ্যে আমাদের এলাকা দখলেরও পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু ওই সময়ে অকুতোভয় ফ্রন্টিয়ার ফোর্স শক্রুর চাপ প্রতিহতই শুরু করেনি, শক্রুর রেল লাইন অতিক্রমের চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেয়। রেল লাইনটি বিপক্ষ বাহিনী এবং আমাদের মধ্যে ‘নো-ম্যান ল্যান্ড’ হিসেবে কাজ করছিল।

২১ নভেম্বর থেকে ভারতের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তখন সে ‘বহিগামী যুদ্ধ’ শুরু করে দেয়। তাদের ৭ গার্ড বাহিনী হিলি এবং এর কাছাকাছি কাসিম, বাবুর, নবপঢ়া ও আপতোর চৌকি আক্রমণ করে। ট্যাংক এবং গোলান্দাজ বাহিনীর সমর্থনে শক্রসেনা হিলির মুখ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রায় দু’ কিলোমিটার উত্তরে কাসিম চৌকি দখল করে নেয়। সেখানে আমাদের প্লাটুনের দশজন মারা যায় এবং তরঙ্গ কমান্ডিং অফিসারসহ বারজন আহত হয়। সেখান থেকে রেল লাইনের পূর্বে শক্রু বাবুর চৌকি আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু ড্যানাকভাবে ক্ষতিহস্ত হয়। তাদের তিনটি ট্যাংকের মধ্যে মাত্র একটি ট্যাংক পূর্ব পার্শ্বের রেলওয়ে বাঁধের ওপর কোনৰকমে উঠতে পারে। সেটাকেও আমাদের রিকমেললেস রাইফেল আঘাত হানে এবং অচল করে দেয়। দৃষ্টিতে ধরা পড়ার মতো এই আঘাতসনের প্রমাণকে শক্রু সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় তাকে অধিকতর ক্ষতির শিকার হতে হলো। অকেজো ট্যাংকটি সেখানে কয়েকদিন যাবৎ পড়ে থাকে। ভারতীয় আঘাতসনের এটাই হলো সেই প্রমাণ, যা আমরা ২৭ নভেম্বরে বিদেশী সাংবাদিকদের দেখাতে চেয়েছিলাম এবং সে সময়টিতে সামনে মুরগি কাবাব ভর্তি প্লেট নিয়ে জেনারেল নিয়াজি তাদের সাক্ষাৎ দেন।

শক্র বাবুর চৌকিতে চাপ অব্যাহত রেখে চললো কিন্তু দখল করতে পারলো না। ফ্রন্টিয়ার ফোর্স দ্রুত অনুধাবন করলো যে, চৌকিতে নিয়োজিত প্লাটুনটি বেশি সময় ধরে চাপ প্রতিহত করতে পারবে না। সুতরাং, প্লাটুনটি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। পরে শক্র সেনা কোন বাধা ছাড়াই চৌকিটি দখল করলো। সেটা তাকে রেলওয়ে লাইনের পুরবদিকে পা রাখার জন্য শক্ত জায়গা করে দেয়।

আমরা আবার আমাদের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করি। কয়েকটি ট্যাংক কোর রিজার্ভের (হার্ডিঞ্জ সেতু) কাছ থেকে ধার নেয়া হলো এবং ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ‘ডি’ কোম্পানির সদর দফতর ডাঙ্গাপাড়ায় সেগুলোর সমাবেশ ঘটানো হয়। একটি পর্যবেক্ষণ ও সহায়ক প্লাটুনকে (৩৪ পাঞ্চাব) রিকমেললেস রাইফেলসহ এর স্পন্স উভরে বসানো হল। বাবুর চৌকি থেকে প্রত্যাহত ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স প্লাটুনকে পুনঃসংগঠন করে কাছাকাছি অন্য সেনাদলে পুনঃনিয়োগ করা হয়। বাবুর চৌকিতে পাল্টা আক্রমণ চালাবার ব্যাপারে আমরা নিজেদেরকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে শক্র সেটাকে দখল করে রাখলো শক্তি বৃদ্ধি করেই এবং আমরা তাদের বিতাড়নে ব্যর্থ হলাম। বিকল্প হিসেবে শক্রকে তার নিজ অবস্থানে আটকে রাখার জন্য আমরা তিনটি কোম্পানি নিয়োগ করি। বাবুর চৌকির দক্ষিণ ও পুরবদিকে দুটি কোম্পানি ধেরাও অবস্থা সৃষ্টি করে। মেজর আকরাম তার সি কোম্পানিকে নিয়ে রেলওয়ে বাঁধের পশ্চিম পাশে অবস্থান নেয়া শ্রেয় মনে করলো। মেজর আকরামের অবস্থান পার্শ্বদেশে শক্র জন্য তীব্র ক্রোধ উৎপাদন করে এবং বাঁধ বরাবর তার গতিবিধি ও বাধাপ্রাণ হয়। তারা ‘সি’ কোম্পানি অবস্থান দখলের চেষ্টা কয়েকবারই করে, ব্যর্থ হয়। এই হল ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিস্থিতির চিত্র।

এদিকে উত্তরাঞ্চলীয় সীমাত্তে পঁচিশ কিলোমিটার প্রশস্ত শিলিগুড়ি ফাঁকটি (দূরত্ব চীনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সীমাত্তে থেকে মাত্র সত্ত্ব কিলোমিটার) শক্রের জন্য মুখ্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফাঁকটি পশ্চিম বাংলা/বিহার এবং আসাম/ত্রিপুরার মধ্যে একমাত্র সংযোগ স্তৰে। তারতীয় সামরিক কমান্ডের প্রায় এক-ত্রৈয়াংশ এই পূর্বাঞ্চলেই রয়েছে এবং তাদের জন্য সরবরাহ এই ফাঁক দিয়েই করতে হবে। সুতরাং সম্ভাব্য সব আক্রমণ থেকে এই ভঙ্গিল মূল্যবান যোগাযোগ স্তৰটি সম্ভাব্য যে কোন আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থাই করলো না,—ফাঁকটির ৫৫ কিলোমিটার বিস্তৃত ঘটালো শক্র আমাদের তেঁতুলিয়া এলাকাসহ আশেপাশের অঞ্চল দখল করে। ২৮-২৯ নভেম্বরের রাতে তারা আমাদের পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁওয়ের উত্তর বাহিসৰ্মায় এসে যায়। ও ডিসেম্বরের মধ্যে তারা এতখানি জায়গা হাতে পেয়ে গেল।

উত্তরের উচু ভূখণ্ডে বরাবর সরবরাহ স্তৰকে নিরাপদ রাখার জন্য পাটিগাম ও ভুক্সামারীর উচু ভূখণ্ডের কিছু অংশ তারা দখল করে নেয়। এ ভূখণ্ডে তাদের অর্জন এতই সবল হয়ে দাঁড়ায় যে, আমরা শংকিত হলাম এই ভেবে—তারা ভুক্সামারী দিয়েই আক্রমণ শুরু করতে পারে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বিহার-আসাম রেলপথ অব্যবহার্য অবস্থায় পড়েছিল। ভূখণ্ডে তাদের অর্জনকে সীমিত রাখার লক্ষ্যে আমরা রেল লাইন ব্যবহারে তাদেরকে সুযোগ দিলাম না। কিন্তু তারা ১ ডিসেম্বরের মধ্যে সেটাকে আয়ত্তে এনে ফেললো এবং আমাদেরকে

এ অঞ্চলের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ শহর ও রেল জংশন কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাটের দিকে ঠেলে দিল। হালকা বিমান নামার উপযোগী রানওয়ে লালমনিরহাটে ছিল। রাজাকার ও ইপিসিএফ-এর লোকজন—যারা চিলমারী এবং এর আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাদেরকে ৩ ডিসেম্বরে কুড়িগ্রামে প্রত্যাহার করে আনা হলো।

সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে আইএএফ কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটের ওপর বিনা বাধায় বোমা বর্ষণ করলো। এ দু'টো শহরের ওপর দিয়ে আগে কয়েকবার ভারতীয় জেট চককর মেরে গেছে। কিন্তু সেগুলো ৪ ডিসেম্বরের মত প্রচণ্ড ক্ষেত্রের উদ্গীরণ ঘটায়নি। সূতরাং জিওসি আমাদের সৈন্যদের আদেশ দিলেন কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট ছেড়ে তিঙ্গা নদী বরাবর দেশের অভ্যন্তরে চলে আসতে এবং সেতুটি উড়িয়ে দিতে। প্রত্যাহার শুরু হল ৪-৫ ডিসেম্বরের রাত থেকে এবং চলে পরের দিন পর্যন্ত।

দেশপ্রেমিক জনতার অংশও তাদের বাড়িগুলি ছেড়ে চলে আসে প্রত্যাহার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে। যে ট্রেনটি আমাদের সৈন্যদের রংপুরে নিয়ে আসবে সেটাতে এসে তারা ভিড় করলো এ অঞ্চলে পাকিস্তান পরিচালিত এই সর্বশেষ ট্রেনটির দায়িত্বে যে মেজব ছিলেন, তিনি তার এই সফরের একটি অবিস্মরণীয় ছবি স্মরণপটে ধরে রাখেন। তার সফরের বিবরণ মোটামুটি এ রকম: ট্রেনটি বেসামরিক লোকজনে ভর্তি ছিল। তাদের অধিকাংশই হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল অথবা আর্তস্বরে চীৎকার করছিল। সৈন্যরা জানলার ধারে বসে তাদের পাহারা দিছিল। রাইফেলের নল জানলা দিয়ে বাইরে বের করে রেখেছিল। শেষের বগিটি একটি সমতল প্লাটফরম-এর মত। সেটার চারদিকে বালির বস্তা স্তুপ করে রাখা হয়েছিল মর্টার বসানোর জন্য। পথে ট্রেন লক্ষ্য করে শুলি করে বিদ্রোহীরা। আমরা তাদের ডয় পাইয়ে দেবার জন্য মর্টার থেকে কিছু গোলা বর্ষণ করি, হালকা মেশিন গান থেকেও শুলি ছেঁড়া হয়। পথে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা রাজাকার কিংবা বেসামরিক লোকজনদের তুলে নেয়ার জন্য গাড়ি থামালে মেশিন গান এবং মর্টার থেকে আমাদের প্রতি গোলা বর্ষণ করা হচ্ছিল। তিঙ্গা সেতু অতিক্রমের মুখে কিছু পুবে দাঁড়িয়ে থাকা একদল রাজাকার আমাদের নজরে এল। আমরা থামলাম এবং তাদেরকে ট্রেনে উঠে আসার জন্য ডাক দিলাম। কিন্তু তারা নড়লো না। আমরা যে মুহূর্তে নদী অতিক্রম করে সেতুটি উড়িয়ে দিলাম তৎক্ষণাত তারা উল্লসিত হয়ে অন্ত শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিতে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠলো। তারা ছিল মুক্তিবাহিনী—রাজাকারদের ভেতর অনুপ্রবেশ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর শক্তকে সরবরাহ করে।

৫-৬ ডিসেম্বর রাতে আমাদের সৈন্যরা রংপুরে ফিরে এলো। ডোমার অক্ষে অবস্থানরত আমাদের সেনাদল একই রাতে সৈয়দপুরে চলে এলো। এর একদিন আগে ঠাকুরগাঁওয়ের পতন ঘটে, সেখানকার গ্যারিসন দিনাজপুরের উত্তরে মণ্ডলপাড়ায় বিকল্প অবস্থান গ্রহণ করে। ৬ ডিসেম্বর নতুন প্রতিরক্ষা রেখা মণ্ডলপাড়া-সৈয়দপুর অক্ষ বরাবর বিস্তৃত হল। ঠিক এর পেছনেই দিনাজপুর-রংপুর প্রতিরক্ষা রেখা। যুদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত এ রেখা রক্ষায় ২৩ বিগেড় বৈধভাবে গর্ব করতে পারে। কিন্তু যে কেউ বিস্মিত না হয়ে পারে না এই ভেবে যে, যখন পশ্চিম সীমাত দিয়ে সোজাপথে যাবার বিকল্প সুযোগ রয়েছে সেক্ষেত্রে শক্তি কি আসলেই

উত্তর থেকে দক্ষিণগামী এই দীর্ঘ পথটি অনুসরণের বি঱ক্কিকর ঝামেলায় যেতে চাইবে?

৪ ডিসেম্বর শক্র আমাদের প্লাটুন অবস্থান দখল করলো এবং হিলির এগার কিলোমিটার উত্তরে চিরাইর কাছাকাছি একটি ফাঁককে ফলোৎপাদক সোজা পথ হিসেবে দেখতে পেল। চিরাই একটি প্লাটুনের অধীন ছিল। কিন্তু নডেম্বরের শেষ দিকে কাসিম চৌকির ঘটনার পর অবস্থানকে হালকা করে আনা হয়েছিল অন্যান্য স্থানের ঘাটতি পূরণের জন্য। এ এলাকাটির দিক থেকে কোন রকমের হৃষকি আসার কথা ধারণা করা যায়নি। কেননা এলাকাটি বিল এবং সংকীর্ণ ও গভীর খানাখন্দে ভরা। ট্যাংক পরিচালনার জন্য এক রকম অসম্ভব মনে করা হল। তাছাড়া সেখানে কোন বড় রাস্তা ও ছিল না, যা দিয়ে শক্র আক্রমণের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তথাপি এ অসম্ভাব্য রাস্তাটিকেই ব্যবহার করলো শক্র। মুক্তিবাহিনীর পরিচালনা ও সাহায্যে শক্র ট্যাংক এবং একটি পদাতিক সেনাদল চিরাই চৌকি দখল সম্পন্ন করে পূর্ব দিকে এগোতে শুরু করলো।

এ বার্তাটি উর্ধ্বতন সদর দফতরে প্রেরিত হলে ক্রুদ্ধ স্টাফ অফিসার প্লাটুন কমান্ডার বললেন, ‘কল্পনার ফানুস উড়িও না। যেখানে বিল, খাল আর মাইন ঠাসা সেখানে ট্যাংক আসে কী করে? নিশ্চয়ই তুমি মোষ দেখেছে।’ তরুণ ক্যাটেন জবাব দিল, ‘আপনি হয়তো ঠিক বললেন, স্যার। কিন্তু আপনি শপথ করে বলতে পারি, মোষগুলোর কাঁধে ১০০ মিলিটিমিটার কামান বসানো এবং সেগুলো আমাদের বাংকারগুলোকে একটার পর একটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।’

যদিও শক্র চিরাইতে আমাদের প্রতিরক্ষাকে বিদীর্ণ করে দেয় তথাপি দক্ষিণ পার্শ্বভাগে অবস্থানরত মেজর আকরামের কোম্পানিকে যতক্ষণ না তচ্ছন্দ করতে পারছিল, ততক্ষণ তারা পুরো শক্র নিয়ে রংপুর-বগুড়া রোডের দিকে এগোতে পারছিল না। সুতরাং দু'টো শক্র সেনাদল মেজর আকরামের অবস্থানকে আক্রমণ করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে গড়িয়ে এলো। কিন্তু মেজর আকরাম দু'দিকে প্রচণ্ড শক্তিতে প্রত্যাঘাত করলেন এবং পরিস্থিতি দুদিন যাবৎ নিজের অনুকূলে রাখলেন। দিনটি ছিল ডিসেম্বরের ৬ তারিখ। স্পষ্টতই শক্র এই নাছোড়বান্দা প্রতিবন্ধককে দ্রুত ঝোড়ে ফেলতে চাইছিল। যদিও পুরোপুরি চাপ সৃষ্টি করা হলো মেজর আকরামের ওপর তবু তিনি ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো ৪৮ ঘন্টা যাবৎ টিকে থাকলেন। ‘সি’ কোম্পানি ইতিমধ্যে প্রবল প্রতিক্রিতার মুখে নিজের তেজবিতার স্বাক্ষর রাখে। মেজর আকরাম এক পরিখা থেকে আরেক পরিখায় দৌড়-ঝাঁপ করছিলেন সৈন্যদের উদ্দিষ্ট রাখতে, যারা তখনও তেজোদীগুল ছিল। এই দৌড়-ঝাঁপের মাঝে ট্যাংকের একটি গোলা তাকে আঘাত করলো এবং তৎক্ষণাত তিনি মারা গেলেন। তার বীর সৈনিকদের জন্য সেটা ছিল একটি মারাত্মক আঘাত। শক্র আবার উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করলো এবং হতাহত হলো সাংঘাতিক রকমের। ‘সি’ কোম্পানির মাত্র চালিশজন বেঁচে রইলো এবং তারা ব্যাটালিয়নের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য পিছু হটে এলো। মেজর আকরামকে (শহীদ) মরণোত্তর ‘নিশান-ই-হায়দার’ খেতাব দেয়া হল, যা পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বীরত্বের পুরস্কার।

যখন শক্র প্রধান চাপ মেজর আকরামের প্রতি নিয়োজিত ছিল সে সময় তাদের

আরেকটা হালকা সাঁজোয়া ও একটি পদাতিক দল দুর্গাপুর রেল স্টেশনের ভেতর দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায়। ৭ ডিসেম্বর এরা বগুড়া-রংপুর রোডের উপর পীরগঞ্জে আঘাত হানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অঙ্গাতসারে।

একই দিন বিকেল মেজর জেনারেল নজরের হসেন শাহ সড়কপথে রংপুর থেকে বগুড়ায় ফিরছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিগেড়িয়ার তাজামুল এবং আরো কয়েকজন স্টাফ অফিসার। পীরগঞ্জের কাছে রাস্তা মোড় নিতেই তারা শক্র গোলাগুলির মুখে পড়লেন। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে তারা দ্রুত গাছগাছালির মধ্যে অদ্র্শ্য হয়ে যান। জিওসি পরে একজন বিজয়ীর উল্লাসভরা কষ্টে আমাকে বললে, ‘আমার ডানপাশে মাত্র পাঁচশ’ মিটার দূরে শক্র ট্যাংক দেখেছিলাম।’ তাকে এবং তার দলকে সাহায্য করে এক খোদাইরী বাঙালি। সে তাঁদেরকে একটি নিরাপদ পথে নিয়ে গিয়েছিল এবং সে পথ ধরে তারা রংপুরে ফিরে যান।

মেজর জেনারেল নজরের জিপে দুই তারকা বসানো চাকতি ছিল। এর উল্টো পিটে ছিল তিনি তারকা। জেনারেল নিয়াজির সফরকালে যাতে ব্যবহার করা যায় সেজন্য উল্টো পিটে তিনি তারকা বসানো হয়। একজন ভারতীয় সৈন্য গাড়ি থেকে প্লেটটি খুলে নিয়ে অফিসারের হাতে তুলে দিল। একজন তিনি তারকাবিশিষ্ট জেনারেলকে অ্যামবুস করতে পারায় তারা উৎকুল্প হয়ে ওঠে। আর তিনি জেনারেল নিয়াজি নিজেই। কিন্তু তারা জানতো না যে, যুদ্ধ শুর হয়ে যাওয়ার দিন থেকেই তিনি আর ঢাকার বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি নেননি।

আমি ৭-৮ ডিসেম্বর রাতে জেনারেল নিয়াজির সদর দফতরের অপারেশন কক্ষে ছিলাম। সে সময় পীরগঞ্জ দুর্ঘটনার খবর ঢাকায় এসে পৌছে। তখনও জিওসি নির্খোঝ রয়েছেন। মনে করা হচ্ছে তিনি ধরা পড়েছেন। ইপিসিএএফ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল ও ৩৯ অ্যাডহক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল জামশেদকে তৎক্ষণাত্মে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো হলো জেনারেল নজরের দায়িত্বার প্রশংসনের জন্য। তিনি দুঃঘন্টা পরে ফিরে এলেন ক্লান্ত এবং হাল ছেড়ে দেয়া অবস্থায়। তার হেলিকপ্টার রাতে ডিভিশনের সদর দফতর খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়। সৌভাগ্যবশত জেনারেল নজর ততক্ষণে তার পথ খুঁজে পেয়ে যান।

জিওসি'র জীবনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা সত্ত্বে ষোড়শ ডিভিশনের সদর দফতর তাঁর প্রধান যোগাযোগ রেখার ওপর শক্রের উপস্থিতি আবিষ্কার করে ফেলে। এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ালো ডিভিশন দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আর ডিভিশন ভাগ হওয়া মানে ডিভিশন ধ্রংস হয়ে যাওয়া। জিওসি সঙ্গে সঙ্গে টাক্ষ ফোর্স-'এ' এবং টাক্ষ ফোর্স 'বি' গঠনের আদেশ দিয়ে বললেন, তাঁদেরকে অনতিবিলম্বে পীরগঞ্জে পাঠাতে হবে শক্রকে খতম করতে। যুদ্ধের পুরু থেকে রংপুরে সেঁটে ছিলেন বিগেড়িয়ার নন্দম। তিনি উত্তরাঞ্চলীয় টাক্ষ ফোর্সের অধিনায়কত্ব দেবেন। আর দক্ষিণের সেনাদলের অধিনায়কত্ব দেবেন বিগেড়িয়ার তাজামুল। প্রায় আটচালিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেল তথাপি 'কাঁচির ফলা' শব্দ তুলতে ব্যর্থ হলো। এ সময়টিতে শক্র তার শক্তিকে একটি ব্রিগেড ও একটি ট্যাংক রেজিমেন্টে উন্নতি করে ফেলে।

৭ ডিসেম্বর দুর্ঘটনার পর বিগেড়িয়ার তাজামুল বগুড়ায় তাঁর সদর দফতরে ফিরে এসে ডিভিশনের যোগাযোগ রেখার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের জন্য ৩২ বালুচের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতানকে তিরক্ষার করেন। কর্নেল ছিলেন একজন কর্তব্যনির্ণিত

অফিসার। বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে নিলেন এবং তৎক্ষণাত নিজের ব্যাটালিয়নসহ বেরিয়ে পড়লেন শক্রকে নিশ্চিহ্ন করতে। শক্র অবস্থান থেকে স্বল্প দূরে তিনি তার সৈন্যদের গাড়ি থেকে নামিয়ে আনার কথা ভাবলেন এবং ঠিক করলেন রাতে আক্রমণ চালাবেন। কিন্তু তিনি জানতেনই না যে, শক্র ইতিমধ্যে তার নাগাল আরো দক্ষিণে পলাশবাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে ঐবৎ শক্রিও বাড়িয়েছে। পূর্বে সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে এগিয়ে গিয়ে সুলতান কার্যত শক্র প্রতিরক্ষার ভেতরে গিয়ে ধাক্কা খেলেন। অগ্রবর্তী কোম্পানিকে কর্তন করে ফেলা হলো এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান নিজেও মারা গেলেন। অবশেষে ৩২ বালুচ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নিজেদেরকে টেনে-হিঁচড়ে ফিরিয়ে আনে। ব্রিগেডিয়ার তাজামুল দক্ষিণবাহী প্রবাহকে খতিয়ে দেখার জন্য-৮ বালুচ, ৩২ পাঞ্চাবের একটি কোম্পানি এবং কিছু ফিল্ড গানের সমন্বয়ে গঠিত একটি নতুন সেনাদল পাঠালো।

বগুড়া-রংপুর রোডের পীরগঞ্জ-পলাশবাড়ী সেকশনে শক্রের উপস্থিতি ২০৫ ব্রিগেডের (ব্রিগেডিয়ার তাজামুল) সীমান্ত প্রতিরক্ষায় এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করলো। ফলে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের বিস্তৃত আঙুলগুলিকে বগুড়ায় গুটিয়ে আনা হয় মুষ্টি তৈরির জন্য। একই প্রক্রিয়ায় ৪ ফ্রিটিয়ার ফোর্সকে হিলি প্রতিরক্ষা থেকে প্রত্যাহার করে আনা হল। পূর্বদিকে ফুলছড়িঘাট, বোনারপাড়া এবং গোবিন্দগঞ্জের ছোট চৌকিগুলোকেও খালি করে ফেলা হয়।

এখন ষোড়শ ডিভিশন চূড়ান্তভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। এর ২৩ ব্রিগেড রংপুর-দিনাজপুর অক্ষের অবস্থান থেকে কেটে বিছিন্ন হয়ে গেল। অন্যদিকে বগুড়ার কাছে ২০৫ ব্রিগেড প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়লো। এই দুই ব্রিগেডের মধ্যে সকল সংযোগের আশা চুরমার হয়ে গেল। প্রত্যেক ব্রিগেডকে এখন নিজের নিজের জীবনের জন্য যুদ্ধ করতে হবে।

একটি যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে বগুড়া দখলের প্রতি শক্রের মূল মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল। সে কারণে মুখ্য চাপটি সহ্য করতে হয় ব্রিগেডিয়ার তাজামুলের ব্রিগেডকে। বগুড়ার চৌল্দ মাইল উত্তরে মহাস্থানে তিনি শক্রকে বিলম্বিত করার চেষ্টা করেন। প্রধান রাস্তায় ওপর মুক্তিবাহিনীর পরিচালনায় ভারতীয়রা দীর্ঘ ঘূর পথে এগিয়ে পক্ষান্তরে দিয়ে আমাদের ব্যাটালিয়ন সদর দফতরে আঘাত হানলো। পক্ষাং স্তরের সৈন্য ও যানবাহন তারা ধিরে ফেলে দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের প্রতিরক্ষার ওপর আক্রমণ হানলো। উত্তরমুখী আমাদের সৈন্যরা পেছনে ফিরতে পারছিল না। কেননা সম্মুখভাগে তারাও আক্রমণ প্রতিহতকরণে নিয়োজিত ছিল।

৩২ পাঞ্চাবের কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাজিদ ছিলো প্রধান রাস্তার পূর্বপার্শ্বে। দক্ষিণ দিক থেকে অগ্সরমান শক্র হাতে সে ধৃত ও বন্দি হল। অন্যদিকে তার সৈন্যরা উত্তর দিকে শক্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিঙ্গ ছিল। সাজিদের কোম্পানির হাবিলদার হকুমদাদ কোম্পানির উত্তর এবং দক্ষিণের সঙ্গে সংযোগের তিনি তিনটি প্রচেষ্টাকে সাফল্যজনকভাবে ব্যর্থ করে দিল। শক্রের প্রতিটি তরঙ্গ এমন প্রত্যাঘাত লাভ করে তাতে হকুমদাদের ট্রেশের সামনে শক্রকে দু-একটি মৃতদেহ রেখে আসতে হচ্ছিল। ভারতীয় মেজর বন্দি মেজর সাজিদকে ‘এই উন্নত’ লোকিটিকে থামাবার আদেশ দিতে বললো। নতুন তারা তার অবস্থানকে ‘গুড়িয়ে দেবে’

বলে শাসালো। সাজিদ অনীহা দেখালে একটি ভারতীয় সেনাদল হুকুমদাদের অবস্থানে আঘাত হানলো। সে পরিখার মধ্যে একাকীই ছিল। সেখান থেকে আক্রমণকারী সৈন্যদের প্রতি সরাসরি বুলেট বৃষ্টি করছিলো। তিনজন মারা পড়লে এবং অন্যরা দ্রুত মাথা নীচু করে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এলো।

এ ঘটনা ভারতীয় মেজরকে ক্ষীণ করে তোলে। সে তার পিণ্ডল সাজিদের বুকে ঢেপে ধরে ‘ওই উন্নত লোকটাকে থামাতে’ আদেশ দিলো। সাজিদ আদেশ মানলো এবং হুকুমদাদের উদ্দেশে চিন্কার করে বললো, ‘ক্ষান্ত দাও হুকুমদাদ, ক্ষান্ত দাও।’ উত্তরে সে চিন্কার করে বলে, ‘মনে হচ্ছে সাহেবের গোলা-বারুদ সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও আমার কাছে দু’টো ম্যাগাজিন আছে। ভাববেন না, আমার কাছে যথেষ্টই আছে।’<sup>1</sup> অবশ্যে প্রচুর মূল্য দিয়ে তাকে তার পরিখার মধ্যেই হত্যা করতে হয় ভারতীয়দেরকে।

১২ ডিসেম্বর আমরা আমাদের মহাস্থান রক্ষাব্যুহ পরিত্যাগ করে বগুড়া দুর্গের বহির্ভাগে চলে আসি। শহরের চারদিকে ২০৫ বিগেডকে নিয়োজিত করা হয়। শক্র বিমান ও গোলন্দাজ বহর একের পর এক গোলা বর্ষণ করে চললো। বোমা, রকেট ও কামানের গোলা ছাড়াও ছিটকে আসা পাকা বাড়ির খণ্ড-বিখণ্ড ইটের টুকরো প্রাণঘাতী হয়ে উঠলো। হতাহতদের সংখ্যা করে কাছাকাছি একটি অট্টালিকার মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা হল। ডিসেম্বরের ১৩-১৪ তারিখ রাতে ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের নতুন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরফরাজ সবার অলঙ্ক্ষে একটি পাকা দালানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তার টর্চ লাইট জ্বালালেন। দ্যাখেন দরজার চৌকাঠ থেকে তাজা রক্তের স্তোত্র নেমে আসছে। দরজা খুলে এক গাদা আহত সৈন্যকে আবিক্ষার করলেন। দ্যাখেন, তারা অক্ষকারের মধ্যে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

আরো দক্ষিণ-পশ্চিম নাটোরে ইতিমধ্যে ডিভিশনাল সদর দফতর সরিয়ে আনা হয়েছে। ত্রিগেডিয়ার তাজামূলের দায়িত্বে বগুড়াকে ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি প্রায় তিনদিন ও তিন রাত ধরে শক্রের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে যান। ১৬ ডিসেম্বর সকাল শক্র যখন বগুড়ার দ্বার প্রাপ্তে তখন ঘোষিত হল যে, জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণে রাজি হয়েছেন। তিনি সৈন্যদের ডাকলেন অস্ত্র সংবরণ করে নিজেদের জীবন বাঁচাতে। কিন্তু আশ্রমজনক বিষয়, কয়েকজন সৈন্য একটি সাদা পতাকা উঠিয়ে ধরে শক্রের অবস্থানের দিকে এগিয়ে গেল। ত্রিগেডিয়ার তাজামূল যখন ও ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি এ বজ্জাতদের অভিশাপ দিতে শুরু করলেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেন। একটু পরেই তিনি তার ডিভিশনাল সদর দফতর থেকে আদেশ পেলেন: ‘গোলাগুলি বন্ধ কর।’ সৈন্যরা যেখানে ছিল সেখানেই তাদেরকে রেখে তিনি বগুড়ার দিকে রওনা হলেন। শহরের প্রায় কাছাকাছি এসেছেন এমন সময় তিনি ধরা পড়েন এবং মুক্তিবাহিনীর হাতে লাপ্তিত হন। একটি ভাঙ্গা হাত নিয়ে তিনি কমাডে ফিরে আসেন যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারতীয় আতিথ্য গ্রহণের জন্য।

১. স্পষ্ট পাঞ্জাবিতে বলে ‘সাব আনা আমনিসন মুকাই বাইঠে ওই’, পার মায়ারেই কাল দো ম্যাগাজিন হ্যায়। মেরি ফিকার না করো।

## ভাঙ্গ

## (চতুর্দশ ডিভিশন)

পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত অনেকটা অশ্ব-জিনের মত। সীমান্ত-প্রান্তের কুঁজটির উত্তরে সিলেট এবং দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রাম,—অপারেশনাল দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেই স্পর্শকাতর এলাকা নয়। যে কোন একটি অথবা দুটোই খোয়া গেলেও ঢাকা হমকির সম্মুখীন হবে না। তাই পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রধানত কেন্দ্ৰভূমিৰ প্রতিৱক্ষণ হতাশার দিকটি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল। সুতৰাং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সেমতে ফেনী, কুমিল্লা ও ব্ৰহ্মণবাড়িয়ায় একটি কৰে ব্ৰিগেড নিয়োগ কৰলো তিনটি সম্ভাৱ্য আগমন পথকে রক্ষাৰ জন্য—যাতে শক্ত ঢাকা আক্ৰমণেৰ জন্য অক্ষ হিসেবে গঠন কৰতে না পাৰে। বাদবাকি সীমান্ত এলাকা অপেক্ষাকৃত দুৰ্বলতৰ স্থাপনাৰ ওপৰ ছেড়ে দেয়া হলো।

চতুর্দশ ডিভিশনেৰ ওপৰ উত্তৰ সীমান্তেৰ অৰ্ধাংশেৰ দায়িত্ব অৰ্পিত ছিল। এৱ এলাকা বিস্তৃত ছিল কুমিল্লাৰ উত্তৰে সালদা নদী থেকে সিলেট জেলা পৰ্যন্ত। ডিভিশনেৰ ছিল তিনটি ব্ৰিগেড,—যাৰ সমগ্ৰ শক্তিৰ পৱিমাণ বড়জোৱ একটি ভাৰতীয় ব্ৰিগেডেৰ সমতূল্য। এ ডিভিশনেৰ সবচেয়ে শক্তিশালী ব্ৰিগেডটি (২৭) গঠিত হয় আড়াইটি পদাতিক ব্যাটালিয়নেৰ সমন্বয়ে। আৱ অন্য দুটি (২০২ ও ৩১২) একটিৰ ছিল ১টি, অপৱটিৰ ছিল ২টি নিয়মিত পদাতিক ব্যাটালিয়ন।

ব্ৰিগেডিয়াৰ সাদুল্লাহৰ অধিনায়কত্বে আখাউড়া-ব্ৰাহ্মণবাড়িয়া-ভৈৱৰবাজার অক্ষে ২৭ ব্ৰিগেডেৰ সমাৱেশ ঘটানো হয়। অন্যদিকে ব্ৰিগেডিয়াৰ সলিমুল্লাহৰ অধিনায়কত্বে ২০২ এুডহক ব্ৰিগেডকে সিলেটে নিয়োজিত কৰা হয়। ৩১৩ ব্ৰিগেডেৰ কমান্ডৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ ইফতিখাৰ বানা আখাউড়া ও সিলেটেৰ মধ্যবৰ্তী মৌলভীবাজারকে তাৱ সদৱ দফতৱ কৰলোন। লড়াইকে আমাদেৱ পক্ষে প্ৰভাৱিত কৰাৰ জন্য তিনি দক্ষিণ অথবা উত্তৰে চাপ প্ৰয়োগ কৰতে পাৱতেন অথবা পৱে আমাকে জেনারেল নিয়াজি বলেছেন যে, তিনি আগৱতলাকে তাৎক্ষণিকভাৱে লক্ষ্য হিসেবে গ্ৰহণ কৰে ভাৰতীয় ত্ৰিপুৰা রাজ্যে আক্ৰমণ চালাতে পাৱতেন।

চতুর্দশ ডিভিশনেৰ রক্ষাৰ্ব্যহেৰ পেছনে প্ৰবহমান বিশাল মেঘনা নদী ঢাকাৰ জন্য প্ৰাক্তিক রক্ষাবুহ্য হিসেবে ছিল বিৱাজমান। শক্তকে প্ৰথমে চতুর্দশ ডিভিশনেৰ, বিশেষ কৰে তাৱ ২৭ ব্ৰিগেড সৃষ্টি মনুষ্য প্ৰতিৱোধকে অকেজো কৰতে হবে। তাৱপৰ তাৱ ঢাকাৰ দোৱগোড়ায় পা রাখাৰ আগে এক বিৱাট জল-বাধাকে মোকাবেলা কৰতে হবে। তাৱ সবচেয়ে সম্ভাৱ্য আগমণ পথটি ছিল আখাউড়া-ভৈৱৰবাজার অক্ষ। এ অক্ষেৰ ওপৰ রয়েছে জিওসি মেজৱ জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীৱ কৌশলগত সদৱ দফতৱ এবং ২৭ ব্ৰিগেডেৰ সদৱ দফতৱও। দু'জনেই—জেনারেল কাজী এবং ব্ৰিগেডিয়াৰ সাদুল্লাহ তাৱেৰ সাহস, দক্ষতা এবং ত্যাগী মনোভাবেৰ জন্য বিশেষভাৱে পৱিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে

অর্থাৎ ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহকে সালদা নদী (কুমিল্লার উত্তরে) থেকে ইটাখোলা বাজারের দক্ষিণে) পর্যন্ত আটচল্লিশ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা রক্ষা করতে হবে। তিনি আখাউড়ায় ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সাথে ৩৩ বালুচকে দক্ষিণে এবং উত্তরে ২২ আজাদ কাশীরকে (বিযুক্ত) নিয়োজিত করলেন। দশটি ফিল্ড কামান, চারটি ট্যাংক এবং পর্যবেক্ষণ ও সহায়ক ব্যাটালিয়নের (৪৮ পাঞ্চাব) এক প্লাটুন সৈন্যও ছিল তার।

যুদ্ধের আগেই শক্র আখাউড়া ও কসবার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবিট করে। চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-সিলেট রেলপথের এ স্টেশনে দু'টিতে অনেক আগে থেকে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। অক্টোবরের গোড়ার দিকে এ দু'টি স্টেশন রক্ষণ্যী যুক্ত হয়, যা জাতীয় সংবাদপত্রগুলির শিরোনাম হতে পেরেছিল। কয়েকবারই পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কসবার হাতবদল ঘটে। দখলদাররা তাদের নিয়ন্ত্রণকালে রেল লাইনের ট্রিপার তুলে নেয়। রেলওয়ে বিভিন্নটি ছিল ইটে গাঁথা একটি কুটির। এটা পরিত্যক্ত হয় এবং সর্বাঙ্গে ছিল বুলেটেই চিহ্ন।

২১-২২ নভেম্বর ভারত যখন তার বহিগামী যুদ্ধ শুরু করে, আমরা তখন এ অক্ষে তার একটি বড় রকমের আক্রমণ আশা করি। একটি উদ্বেগময় অনিশ্চিত শান্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে চার দিন ও পাঁচ রাত কেটে যায়। অবশেষে ২৭ নভেম্বর ভারত আত্মপ্রকাশ করে। শক্তিমন্ত্র সাথেই সে আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানে আক্রমণ চালায়। আমরা এ সম্মুখবর্তী আক্রমণ প্রতিহত করতে লড়াই করিছি এই সময় মুক্তিবাহিনী তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সাথে নিয়ে পার্শ্বদেশ দিয়ে অনুপ্রবেশ করে আমাদের আখাউড়া অবস্থানকে ঘিরে ফেলে। আমরা এ অবরোধ অবস্থা থেকে চৌকিগুলোকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হই। কেননা, সংযোগের জন্য আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত রাখতে হবে থেকে। আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে পার্শ্বদেশ থেকে সৈন্য পরিচালনার অনুমতি আমাদের ছিল না।

শক্র এ বিচ্ছিন্ন অবস্থানগুলোকে হীনবল করার জন্য ৩০ নভেম্বর আখাউড়ার ওপর নতুন আক্রমণ পরিচালনা করে। অবশেষে আমাদের প্লাটুন রক্ষাব্যুহ ভেঙ্গে পড়ে। শক্র কয়েকদিন আগে থেকে আমাদের পুনঃ সমাবেশ ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখেছিল। এবার প্রচও বেগে সামনে এগিয়ে এল এবং আমাদের একমাত্র ফিল্ড কামানটি দখল করে নিল। ফিল্ড কামানটি নিয়োগ করা হয় আখাউড়া রক্ষাব্যুহের পচাতে অবস্থানরত সৈন্যদের মনোবলকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য।

অগ্রবর্তী প্লাটুনের সঙ্গে বেতার যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। প্রাথমিক সংবাদ আনার জন্য অগ্রবর্তী কোম্পানিতে ডান বিস্তৃতিতে একজন লেফটেন্যান্টকে পাঠানো হয়। তিনি দেখলেন, আমাদের সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করছে। আর আমাদের ডান দিয়ে শক্র সেনার অনুপ্রবেশ ঘটছে। তিনি প্রত্যাহারকৃত সৈন্যদের তাদের পরিখায় ফিরে যেতে দিলেন এবং ব্যাটালিয়ন সদর দফতরে অনুপ্রবেশের সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন।

আখাউড়ার দক্ষিণে গঙ্গাসাগরে ছিল আমাদের অবস্থান। সেখানকার মালিকবাড়িতে ছিল এক প্লাটুন সৈন্য আর লনচারেরও ছিল একটি সেকশন। ১ ডিসেম্বরে শক্র কামান ও ট্যাংক থেকে প্রবল গোলাবর্ষণ শুরু করে। এতে তাদের নিজ নীড়ে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব মেজর জেনারেল কাজীর কাঁধে অর্পিত হল।

যে সময় জিওসি ও ব্রিগেড কমান্ডার আখাউড়া ও গঙ্গাসাগরের প্রায় ভেঙে পড়া রক্ষাবুহের মেরামতিতে নিয়োজিত ছিলেন, সে সময় ভারতীয় ৪ গার্ডের কিছু সৈন্য মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় আমাদের ব্যাটালিয়ন রক্ষাবুহের পশ্চাঞ্চাগে ঢুকে পড়ে। যেহেতু এ ধরনের ঘটনা মোকাবেলার জন্য আমাদের কোন রিজার্ভ সৈন্য ছিল না, সে কারণে চতুর্দশ ডিভিশনের লেফটেন্যান্ট কর্নেল বাসিত ব্যাটম্যান, সামরিক পুলিশ ও কেরানিদের নিয়ে একটি ছোট বাহিনী গড়ে তুলেন। তিনি চারটি ট্যাঙ্কের দু'টিকে নিয়ে নিজের 'বাহিনী সহ অনুপ্রবেশকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনুপ্রবেশকারীরা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ছিল চোরের শামিল। যে মুহূর্তে তাদের খুঁজে বের করা হয় তৎক্ষণাত তারা দ্রুত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। বাসিত সাহসের সাথে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন এবং কয়েকটি গোলাবর্ষণ করে পশ্চাদপসরণকারী শক্তির কয়েকজনকে হত্যা করেন। যারা মাঠের মধ্যে মৃত পড়েছিল, তাদের মধ্যে ভারতীয় গোলন্দাজ বহরের একজন তরঙ্গ পর্যবেক্ষকও ছিল। তার কাছে যেসব কাগজপত্র ছিল সেগুলোর মধ্যে থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছিল একটি 'টাক্ষ টেবিল' তাতে লক্ষ্য হিসেবে তিতাস নদীর (আমাদের রক্ষাবুহের পশ্চাতে) ওপর আখাউড়া সেতু দখলের লক্ষ্য দেখান ছিল।

৩ ডিসেম্বর সর্বান্তক যুদ্ধ শুরু হলে ব্রিগেড কমান্ডার সিওসি'র সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, পূর্ণ আক্রমণকে গ্রহণ করার জন্য অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, পরের রাতেই আখাউড়া সেতু থেকে আরো ভেতরে তিনি তার বাহিনী সরিয়ে আনবেন এবং দক্ষিণ দিকে নিজের বিস্তৃত বাহকে গুটিয়ে এনে কৌশলগত দিক দিয়ে সুবিধাজনক এ সেতুটিকে উড়িয়ে দেবেন।

পরিকল্পনাটি সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হয় শুধু সেতুটি উড়িয়ে দেয়া ব্যতীত। দ্রুত পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যরা সেটাকে আস্তই রেখে আসে এবং শক্তির হাতে শিয়ে পড়ে। এর ফলে আমাদের প্রত্যাহত সৈন্যদের পদান্ত অনুসরণ করেই তারা সেতুটি অতিক্রম করে এবং অভ্যন্তরভাগে তিতাস নদী তীরবর্তী রক্ষাবুহ দখল ও প্রস্তরের জন্য কোন সময়ই তারা দেয় না। এখান থেকে আরো পচিমে বাক্ষণবাড়িয়ার দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। সেটাকে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইতিমধ্যেই শহরটিকে ডিভিশনের 'শক্ত কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিলো প্রচুর খাদ্য-সম্পদ ও পনের দিনের গোলা বারুদ জমা করে।

আমরা আমাদের ব্রাক্ষণবাড়িয়া রক্ষাবুহ দখল করলাম এবং মেহাইয়ের ওপর শক্তির হাতুড়ির আঘাত পড়ার অপেক্ষায় রইলাম। আগের মতই, আমরা যা ধারণা করি, তারা তা করলো না এবং পার্শ্বদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে আমাদের পশ্চাঞ্চাগের জন্য হৃষকি সৃষ্টি করলো। এতে আমরা আগের মতই প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করলাম এবং আরো ১৩ কিলোমিটার পেছনে মেঘনার পূর্ব পাড়ে আঙুগঞ্জের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের অবস্থান পরিত্যাগ করি। প্রত্যাহার শুরু হল ডিসেম্বরের ৭/৮ তারিখের রাতে; শেষ হলো পর দিন সকালে। এবার শক্তি আমাদেরকে নতুন রক্ষাবুহ রচনার জন্য যথেষ্ট সময় দিল।

ইতিমধ্যে চতুর্দশ ডিভিশনের কৌশলগত সদর দফতর ব্রাক্ষণবাড়িয়া থেকে মেঘনার

পশ্চিম পাড়ে তৈরববাজারে সরিয়ে নেয়া হল। এ বিচলন, যা গোপন রাখা গেল না; সৈন্যদের বিচলিত করে তোলে। তারা ভাবলো, নিরাপত্তা মেঘনার পশ্চিম পাড়েই বিদ্যমান—পুর পাড়ে নয়। অগ্রবর্তী এলাকায় ডিভিশনাল সদর দফতরের উপস্থিতি যদি সৈন্যদের মধ্যে টনিকের মতো হয় তাহলে এর প্রত্যাহারও একই নিয়মে নেতৃত্ব মনোবলহীনতার কারণ হয়ে ওঠে।

ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ আঙ্গশের পুর দিকে তার ব্রিগেডের সমাবেশ ঘটালেন এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে যে, শক্র আক্রমণের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা এ দিক থেকেই রয়েছে। তিনি উত্তর-পশ্চিম সেঁটরের দায়িত্বভার দিলেন ইপিসিএএফ-কে। এদের সঙ্গে অল্পসংখ্যক নিয়মিত সৈন্য যুক্ত করলেন।

৯ ডিসেম্বর সকালে জানা গেল যে, উত্তর পুর দিকে শক্র আঙ্গশের দিকে এগিয়ে আসছে। খবরটি অবাক করে সবাইকে—শক্র কী ভাবে ওই এলাকায় আসতে পারে? আমাদের কামান থেকে প্রথম গোলাটি বর্ষিত হবে, এমন সময় বোৰা গেল যে, ‘অগ্রসরমান শক্র’ অন্য কেউ নয়,—আমাদের ইপিসিএএফ-এর সদস্যরা। দেখা গেল, তারা তাদের অন্ত্র মাটির ওপর দিয়ে টানতে টানতে নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে ভেতরের দিকে দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওই এলাকায় শক্র সৈন্য ও ট্যাংকের উপস্থিতির খবর জানিয়ে তারা বললো, ৩০৩ রাইফেল নিয়ে পরিখার ভেতর সেঁটে থাকার কোন মৌকাক্তি তারা খুঁজে পায়নি।

ইপিসিএএফদের অনুসরণ করে আরেকটি পদাতিক সেনাদল এগিয়ে আসছিল। তাদেরকে বস্তু সৈন্য মনে করা হলো—যারা রক্ষাব্যুহের সীমানা থেকে পশ্চাদপসরণ করছে। কিন্তু তারা যখন আঙ্গশে এগিয়ে এলো তখন তাদের চিহ্নিত করা গেল। তারা সবুজ ইউনিফর্ম পরিহিত ভারতীয় সৈন্য। আমাদের ব্রিগেড সদর থেকে তারা খুব একটা বেশি দূরে ছিল না। ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় সেঁটের বার্তা পাঠানো হয় নতুন এই হৃষকিকে মোকাবেলার জন্য কিছু নিয়মিত সৈন্য পাঠাতে। পূর্বাঞ্চলীয় সেঁটের থেকে নিয়মিত সৈন্য পৌছাবার আগেই এডহক বাহিনী শক্র সেনাকে পিটিয়ে পিছু হতিয়ে দিল। শক্র দ্রুত পশ্চাদপসরণ করলো। ফেলে রেখে গেল কিছু মৃতদেহ এবং চালু অবস্থায় সাতটি ট্যাংক। আমাদের যে সৈন্যরা যুদ্ধের শুরু থেকে পা পা করে পেছনে হেঁটে আসছিল এই হোটি বিজয়টি তাদের নেতৃত্ব মনোবলকে চাঙ্গা করে তুললো।

২৭ ব্রিগেড তখনও শক্রের জন্য আঙ্গশে অপেক্ষা করছিল। ঠিক সে সময় জেনারেল কাজী মেঘনার ওপর বিশাল তৈরব সেতুটিকে উড়িয়ে দেবার আদেশ দেন। তৎক্ষণাত তার আদেশ পালিত হয় এবং সেতুর ইস্পাতের গার্ডেরগুলো ছিটকে নদীর ভেতরে গিয়ে পড়ে। পুর পাড়ের সৈন্যদের এই ঘটনা চোখ মেলে দেখা ছাড়া করার কিছুই ছিল না। সেতুটি ধ্বংস করার ব্যাপারে কোন বিষয়টি জিওসিকে উৎসাহিত করেছিল, তা জানা গেল না। সাধারণ দু'টো ব্যাখ্যা দেয়া হয়। প্রথমত বলা হয়, সৈন্যদের পেছনে তাকানো থেকে বিরত করার জন্য একটিমাত্র পথ খোলা ছিল, তাহলো সেতুটি উড়িয়ে দেয়া। এখন এরা পুর পাড়ে থেকে শেষ পর্যন্ত লড়বে। দ্বিতীয় যুক্তি জিওসি আশংকা করছিলেন যে, উত্তর দিক থেকে অগ্রসরমান শক্র সেনা সেতুটি অক্ষত অবস্থায় দখল করে নিতে পারে। যুদ্ধ শেষ হবার পর

পরই আমি জিওসি'র কাছে এ বিষয়টি উত্থাপন করি। তিনি জানান যে, তিনি খবর পেয়েছিলেন উভর উপকণ্ঠে হেলিকপ্টারবাহী শক্রসেনা অবতরণ করছে। তিনি যুক্তি দেখান, সেতুটি দখল ছাড়া ওই বাহিনীটির অন্য কোন দায়িত্ব ছিল না। অবশ্য হেলিকপ্টারবাহী শক্র সৈন্যের উপস্থিতির খবর অন্য কোন সূত্র থেকে সমর্থিত হয়নি।

২৭ ব্রিগেড প্রাণ যাবতীয় জলযানের মাধ্যমে ১০-১১ ডিসেম্বর রাতে নদী অতিক্রম করে ভৈরব বাজারে উপস্থিত হয়। পরদিনই ভৈরব বাজারে রক্ষ্যবুহ তৈরি করা হলো। বুহে পনের দিন চলার মত মজুদ রসদ ছিল। অত্যন্ত আত্মিকতার সাথে ব্রিগেডের নেতৃত্ব দেন জিওসি নিজেই এবং সেখানে তিনি বসে থাকেন যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত—কোন রকম ছেঁয়া-খোয়া ছাড়াই। যখন ২৭ ব্রিগেড তার 'নিরাপত্তা জিন'-এর মধ্যে বসে অপেক্ষা করছিল তখন অন্যদিকে শক্র হেলিকপ্টারগুলো তার সৈন্যদের মেঘনা নদী পারাপারে ব্যস্ত ছিল এবং ভৈরববাজারের প্রায় পনের কিলোমিটার দক্ষিণে রায়পুর নরসিংহনী এলাকায় নামিয়ে দেয়। এই হেলিকপ্টারবাহী বাহিনী ঢাকার জন্য হৃষকি সৃষ্টি করে। কিন্তু চতুর্দশ ডিভিশন কিংবা ২৭ ব্রিগেড এই শক্র বাহিনীর জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করলো না। কেননা, প্রায়োগিক দিক থেকে শক্র তাদের আওতার বাইরে ছিল।

এভাবে আখাউড়া-ভৈরব বাজার অক্ষে চতুর্দশ ডিভিশন তার নিজস্ব খেলায় সর্বোচ্চ ট্রাম্প কার্ড অর্জনে সক্ষম হয়।

এবার আমরা ডিভিশনের অন্য দুটি স্থাপনার প্রতি দৃষ্টি দেই। ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহর অবস্থানের ঠিক উভর ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২২ বালুচ নিয়ে গঠিত ৩১২ ব্রিগেড কলমগঞ্জ থেকে লাতু পর্যন্ত বিস্তৃত সীমান্ত চৌকিগুলোতে নিয়োজিত ছিল। ২৭ ব্রিগেডের আখাউড়া ও কসবার মত দুলাই চৌকিটি ছিল এ ব্রিগেডের দায়িত্বাধীন সবচেয়ে প্রতারণামূলক চৌকি। ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কিছু সৈন্যের দায়িত্বে ছিল চৌকিটি। অঙ্গোবর থেকেই ভারতীয় সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা (যুক্তিবাহী) কয়েকবারই আক্রমণ পরিচালনা করে এটার ওপর। এর প্রেক্ষাপটে আমাদের সৈন্য শক্তিকে এক কোম্পানিতে (মিশ্রিত) উন্নীত করা হয়। অন্যান্য স্থানে শক্ররা যে কৌশল অবলম্বন করে এখানেও তাই করলো: সম্মুখবর্তী অবস্থান থেকে আক্রমণ করে আভ্যন্তরকারীদের ব্যস্ত রাখা এবং পার্শ্বদেশ থেকে চুকে পড়ার জন্য অনুপবেশকারীদের জন্য সময় হাতিয়ে নেয়া। অঙ্গোবর মাসের চার-চারটি সপ্তাহ যাবৎ তারা এই প্রচেষ্টাটি চালিয়েছিল, কিন্তু সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ২৯ অঙ্গোবর তারা দুলাই চৌকিকে বিছিন্ন করতে সক্ষম হয়। চৌকির জন্য পুনঃসমাবেশ কিংবা সংযোগ স্থাপনের আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তথাপি সাহসিকতার সাথে অবরোধ অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে চৌকিটি। ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সেকেন্ড ইন-কমান্ড মেজর জাভেডও এ অসহায় পরিস্থিতিতে দৈর্ঘ্য হারিয়ে ফেলেন এবং ৩১ অঙ্গোবরে সিদ্ধান্ত নেন, যে কোন মূল্যে অবরোধ ভেঙ্গে ফেলবেন। তিনি স্বল্পসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করেন, যাদের সংখ্যা মাত্র আঠারো, তাদেরকে নিয়ে দক্ষিণ পার্শ্বভাগের বেষ্টনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়েন। শক্র এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। মেজর জাভেড এবং তার সাথীদের ওপর প্রবল বেগে গোলা ও বুলেটে বৃষ্টি করে চললো। কিন্তু এতে দমনো না তারা কিংবা পশ্চাদপসরণও করলো না। ভারতীয়

গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে যে পর্যবেক্ষকটি ছিল, সে এই অসম সাহসী লোকগুলোর অগ্রযাত্রা খালি চোখে অবলোকন করে এবং তাদের কামান-বন্দুকের লক্ষ্য নতুন করে স্থির করে। এবার এ দৃঢ় সংকুলবন্ধ লোকগুলোর ওপর কামান দাগা শুরু হল ডান দিক থেকে। অধিনায়কসহ অধিকার্শ সৈনাই মারা পড়লো এবং দুলাই চৌকির ভাগ্য শূন্যে ঝুলতে থাকলো।

এটাই সর্বপ্রথম লড়াই নয়—যাতে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তার অনেক সৈন্য হারালো। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত তাকে হারাতে হয় ১৬০ জন। এদের মধ্যে ছিল দু'জন অফিসার, তিনজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার এবং ৯০ জন নিয়মিত সৈন্য। বাকিরা রাজাকার ও ইপিসিএএফ-এর লোকজন। সরকারিভাবে তখনও পুর পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হয়নি।

ব্রিগেডিয়ার রানা জিউসি ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়কের কাছে প্রস্তাব দেন যে, অবরোধ-অবস্থায় নিপত্তি সীমান্ত চৌকিগুলোর সাথে সম্মুখ দিক দিয়ে সংযোগের চেষ্টার বদলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে শক্রকে পেছন থেকে আক্রমণ করলে ভাল ফল দেবে। তিনি মূলত এ উদ্দেশ্যে (নিম্ন দক্ষিণ থেকে) ২২ বালুচ, ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং ৩৯ বালুচ থেকে সৈন্য নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করলেন। দুলাই চৌকি মুক্ত করার অভিযানের সাফল্যের লক্ষ্যে তিনি দু'টো ফিল্ড কামান ও চারটি ভারি মর্টার (সিলেট ও কুমিল্লা থেকে) সংগ্রহ করলেন। জেনারেল নিয়াজি যখন নভেম্বরের গোড়ার দিকে এ এলাকা পরিদর্শনে যান সে সময় তিনি আমার উপস্থিতিতে তার কাছে এ পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দান করেন। আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা অতিক্রমের অনুমতি প্রত্যাখ্যাত হলো। তথাপি কঠোর নিষ্ঠার সাথে ব্রিগেডিয়ার রানা যে বাহিনী গড়ে তোলেন, তাকে ব্যবহার করতে বলা হলো। তিনি দিক দিয়ে সূচালো কাঁটার মত আক্রমণ পরিচালনা করা হল প্রায় সম্মুখ থেকে এবং ব্যর্থ হলো। এ আক্রমণ দুলাই চৌকির হতাহতের সংখ্যায় নতুন সংখ্যা যুক্ত করলো মাত্র।

ব্রিগেডিয়ার রানার অপর ব্যাটালিয়ন ২২ বালুচ 'সরকারিভাবে যুদ্ধ' শুরু হবার আগে একই রকমের দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। নভেম্বরের শেষ দিকে এসে শক্র লাতু, কালোরা এবং শমসেরনগরের কাছাকাছি সীমান্তের সকল বাঁক এবং ঝাঁঝলো ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে ফেলে। ১ ডিসেম্বর সে কিছুটা ভেতরে চুকে পড়লো এবং শমসেরনগর ও সীমান্ত চৌকির মধ্যে অবরোধমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ব্রিগেড কমান্ডার এ অবস্থার কথা তখনই আবিষ্কার করেন, যখন তিনি কাছাকাছি রাজনগর অবস্থান থেকে গোলাগুলির মুখোমুখি হন। পরদিন শক্র শমসেরনগরকেই আক্রমণ করে বসলো এবং সীমান্ত চৌকিগুলোকে অকার্যকর করে ফেললো। পিএএফ-এর সাহায্য চাওয়া হয়। দু'টো এফ-৮৬ এস দ্রুত এগিয়ে এলো এবং আমাদের সীমান্তের ওপর দিয়ে উড়ে গেল কিন্তু শক্র অবস্থান খুঁজে পেল না। সীমান্তের পুর পাড়ে সৈন্য, ট্যাঙ্ক এবং সামরিক যানবাহন জড় করা হয়েছিল, কিন্তু বিমান দু'টি সেগুলো ধ্বংসের জন্য এগোলো না। কেননা, তা হবে আন্তর্জাতিক সীমানা লজনের শামিল। স্যাবর দু'টি ঘাঁটিতে ফিরে এলো। একটি গুলি ও ছুড়লো না। ঘটনাটি ঘটলো সর্বাত্মক যুদ্ধের আগে আসেই।

পিএএফ'র ব্যর্থ উভয়ন অন্তত এটা প্রমাণ করলো যে, শক্র শমসেরনগর তখনও দখল

করেনি। সুতরাং আমাদের সৈন্যদের আবার ফিরে গিয়ে তাদের পরিত্যক্ত অবস্থান দখল করতে আদেশ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে শমসেরনগরের পুর্বদিকের বিছিন্ন চৌকিটিকে শক্তি দুর্বলতর করে ফেলে। বলা হয়, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জামির শেষ পর্যন্ত তার পরিষায় লেপটে ছিলেন। তাকে সর্বশেষ তার সৈন্যদের উদ্দেশে চিক্কার করে বলতে শোনা গেছে, ‘দেখ! দেখ! তারা ফিরে যাচ্ছে। নিজের অবস্থানকে শক্ত করে ধরে রাখো। শক্তরা পশ্চাত্পসরণ করছে।’

বলা হয়, এ সব সীমান্ত চৌকির রক্ষা ব্যবস্থায় সব চেয়ে দুর্বলতম অংশ ছিল ইপিসিএফ এবং রাজাকারণ। এরাই সর্বপ্রথম তাদের চৌকি পরিত্যাগ করে। বলা হয়, কাপুরুষতা সর্বদাই ছোঁয়াচে। এ সংক্রামক রোগ দ্রুত নিয়মিত সৈন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ বিষয়ক নৈতিকতা হচ্ছে এই কদাপিও অগ্রবর্তী রক্ষাব্যুহে আধা-সামরিক বাহি-নীর সদস্যদের সাথে নিয়মিত সৈনিকদের মিশ্রণ ঘটিও না।

৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ব্রিগেডিয়ার রানা সীমান্ত চৌকিগুলি থেকে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্যদের মৌলভীবাজারে প্রত্যাহারে আদেশ দিলেন। মৌলভীবাজার ছিল রানার সদর দফতর এবং ডিভিশনের ‘শক্তিশালী কেন্দ্র’। সর্ব ভানের ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কোম্পানিকে প্রতিবেশী ২৭ ব্রিগেডের সাথে সংযুক্তির অনুমতি দেয়া হল।

২২ বালুচকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। কেননা, তার ব্রিগেড সদর দফতরের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার রানা স্বাভাবিক কারণেই লাতু, কামাতনগর, জুরি, কালোরা এবং মির্জাপুরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা সৈন্যদের সম্পর্কে উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। ব্যাটালিয়ন কী শক্তির দখলে চলে গিয়েছে? সীমান্ত চৌকিগুলোর সৈন্যদের কী টুকরো টুকরো করা হয়েছে? যদি কেউ বেঁচে থাকে তার জন্য কী করা যেতে পারে?

অবশ্যে ২২ বালুচের একটি কোম্পানি সদর দফতরের সাথে বেতার মারফত যোগাযোগ স্থাপন করে। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে সুবিধামত হ্রানে জড় হতে বলা হয়। লাতু ও ফেঙ্গুগঞ্জে কিছুসংখ্যককে একত্র করা হল। অন্যরা (প্রায় পঞ্চাশজন পিছিয়ে পড়া সৈন্য) সিলেটে এসে উপস্থিত হল—নিজেরাই নিজেদের পথ করে নিয়ে ব্যক্তিগত অস্ত্রটি কাঁধে করে পায়ে হেঁটে আসে তারা। পরিত্যাগ করে আসে ভারি অস্ত্রপাতি।

অনেক পরে, আকস্মিকভাবেই একটি বেতারযন্ত্র গ্রাহক ২২ বালুচের কোম্পানি সদর দফতরকে ধরে ফেলে। সে কালোরা থেকে ঘোল কিলোমিটার দূরে একটি চা বাগানে তার নতুন অবস্থান বলে জানায়। ব্যাটালিয়নকে পুনঃগঠনের আদেশ দেয়া হল। জানা গেল, শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ ২২ বালুচকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং ব্যাটালিয়ন সদর দফতর প্রত্যাহারে বাধ্য করে। সীমান্ত চৌকিতে নিয়োজিত কোম্পানিগুলির সাথেই শুধু যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে না,—যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় ব্রিগেড সদর দফতরের সঙ্গেও। এ ঘটনাটি ঘটে ৬ ডিসেম্বর।

এ দিনেই জিওসি ৩০৩ ব্রিগেডকে আখাউড়া-ভৈরববাজার অক্ষে ২৭ ব্রিগেডের সাথে নিয়াজি—১১

সংযোগ স্থাপনের আদেশ দেন। অক্ষে পুনঃসমাবেশ জরুরি হয়ে পড়েছিল ঢাকার ভাগ্যকে প্রভাবিত করার জন্যই। ব্রিগেডিয়ার রানা এ কাজ সম্পাদনে অপরাগতা প্রকাশ করেন। তাকে কমপক্ষে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠাবার জন্য বলা হয়েছিল; কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনি কাছাকাছি এলাকায় অবস্থানরত ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি কোম্পানি ২৭ ব্রিগেডের সঙ্গে সংযুক্তির আদেশ দিলেন মাত্র। এ বিষয়টি আমি আগেই উল্লেখ করেছি। ইতিমধ্যে শক্র শমশেরনগর-মৌলভীবাজার সড়কে এগিয়ে এলো। তখনও ২২ বালুচ চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। ফলে এখন ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (যা এখন গঠিত মাত্র আড়াইটি কোম্পানি নিয়ে) এবং আধা সামারিক বাহিনীর সদস্যদের মৌলভীবাজার রক্ষা করতে হবে। ৫ ডিসেম্বর বহিসীমা রক্ষাব্যুহ রচিত হলো।

মৌলভীবাজার ও সিলেটের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে ছেষ্টি কুশিয়ারা নদী। নদীতে দু'টো ফেরি ছিল—একটি শেরপুর এবং অপরটি সাদিপুরে। ব্রিগেড সদর দফতর নদীর সিলেটের দিক থেকে সামরিক যানবাহন ও ভারি সমর উপরকণ নিয়ে সাদিপুর ফেরির দিকে এগিয়ে গেল। অন্যদিকে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ইপিসিএএফ এবং রাজাকারো মৌলভীবাজারে রয়ে গেল। শক্র বিমান ও গোলন্দাজ বহর এবার মৌলভীবাজারে হামলা চলালো। প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ এবং কামান ও রকেট থেকে গোলা বৃষ্টি করলো। ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স দৃঢ়তর সাথে এ শাস্তি বরণ করে নিল। পুরো দু'দিন তারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলো এবং মাত্র পাঁচজন সৈন্য হারালো; কিন্তু আহত হল অনেক। ছুটে আসা ইটের আঘাতেও আহতরা রয়েছে এর মধ্যে। অবশেষে ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তাদেরকে গোলা-বারুদের সম্ভাব ধ্বংস করে সাদিপুর ফেরির দিকে সরে আসতে আদেশ দেয়া হল।

৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স সাদিপুর ফেরির উদ্দেশ্যে রওনা হলে ব্রিগেড সদর দফতর সেখানে থেকে সিলেটের দিকে সরে গেল। নিঃশেষিত এই ব্রিগেডটির কমান্ডার ছিলেন দু'জন। ব্রিগেডিয়ার রানা ছাড়াও ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে ঢাকা থেকে ব্রিগেডিয়ার হাসানকে পাঠানো হয়। কেননা, জেনারেল নিয়াজি এ আশংকা করেন যে, রানা সম্ভবত একা চাপ প্রতিষ্ঠত করতে পারবেন না। অথচ তিনি মনে হয় উপলব্ধি করতে পারেননি, দুর্বলতর অধিবায়কত্বের চেয়ে বৈত অধিবায়কত্ব অনেক খারাপ।

৭ ডিসেম্বরে ব্রিগেড সদর দফতরের ক্যাপ্টেন জাফর গাড়ি চালিয়ে তার ব্রিগেড কমান্ডারদের আগে আগে চলছিল। তরুণ এই অফিসার সন্ধ্যার দিকে সিলেট শহরে প্রবেশের মুখে দেখতে পেলো শক্র হেলিকপ্টার শহরের পুর বহির্ভাগে সৈন্য নামিয়ে দিচ্ছে। সে থেমে গেল এবং দম বন্ধ করে গুণলো। দশটি হেলিকপ্টার তাদের ভার নামিয়ে দিয়ে মাটি ছেড়ে শূন্য উঠে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার রানার জিপ তাকে ধরে ফেলে। হেলিকপ্টার থেকে শক্র সৈন্য অবতরণের সংবাদ তাকে জানানো হল। তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এই ভেবে, ইতিমধ্যে শহরটি শক্র দখলে চলে গেছে। তিনি বিশ্মিত হলেন নিরাপত্তা এলাকা সৃষ্টি ছাড়া তারা কীভাবে সৈন্য অবতরণ করাতে পারে।

এদিকে সাদিপুর ফেরির ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের নতুন রক্ষাব্যুহতে শক্র কোন আক্রমণ পরিচালনা করলো না। তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা মানে ব্যাটালিয়নকে সিলেটের দিকে

ঠেলে দেয়া, যা শক্তির স্বার্থের পক্ষে ছিল না। বক্ষা ব্যবস্থা যখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে তখন তারা সিলেটকে নিতে চাইছিল। সিলেটের শালুচিকচে ছিল বিমান ওঠা-নামার উপযোগী ব্যবস্থা এবং সম্পদশালী চা বাগান। এ সেটরে এ দুটি শক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল যথেষ্ট পরিমাণ।

ব্রিগেডিয়ার রানার আদেশে ৩০ ফ্রিটিয়ার ফোর্স এবং তাদের সহযোগী সৈন্যরা ৮-৯ ডিসেম্বর রাতে সাদিপুর থেকে সিলেটের দিকে যাত্রা করে। যে অফিসারটি এই সেনাদল পরিচালনা করছিল সে পরে আমাকে বলোছল ‘বাইরে থেকে সিলেটকে একটি ভৌতিক শহর মনে হচ্ছিল। সৃচিতভেদ্য অঙ্কুরাব শহরটিকে যেন গিলে নিয়েছে। স্তুতা এক ভয়াবহ রহস্যময়তা জন্ম দিয়েছিল। নিস্তুতাকে ভাঙ্গছিল শুধু বেওয়ারিশ কুকুরের হঠাত হঠাত যেউ যেউ চিত্কার কিংবা রাইফেলের শুলির শব্দ।’

এই ‘ভৌতিক শহর’-এ ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর ২০২ এডহক ব্রিগেড অবস্থান করছিল। সেটার ভাগ্যে কি ঘটেছে? ২০২ ব্রিগেডের সদর দফতর ছিল সিলেটে। মাত্র একটি নিয়মিত পদাতিক ব্যাটালিয়ন—৩১ পাঞ্জাব ছিল এর অধীনে। এর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের যুক্ত করে, যা গঠিত হয়েছিল ফ্রিটিয়ার কোর, রেঞ্জারস ও রাজাকারদের সমন্বয়ে। ব্রিগেডেকে ফিল্ড গান-এর একটি ব্যাটারিও (পূর্বে যেটা ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টের ছিল) দেয়া হয়। ব্রিগেডের দায়িত্বাধীন সম্মুখভাগ—পুর এবং উত্তরে ছিল দীর্ঘতর। এর এলাকা বিস্তৃত ছিল লাতু থেকে (৩০৩ ব্রিগেডের উত্তরাঞ্চলীয় প্রান্তসীমা) তাহিরপুর পর্যন্ত, যেখানে গিয়ে সিলেট জেলা ময়মনসিংহের সাথে যুক্ত হয়েছে। বিপরীতে ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর যুখোমুখি ছিল চতুর্থ কোর-এর একটি ভারতীয় মাউন্টেইন ডিভিশন।

সিলেটে প্রবেশের প্রধান দুটি পথ এসেছে পুর এবং উত্তর-পুর থেকে। পুরদিকের প্রবেশ পথে পর পর আঁট্রাম, জকিগঞ্জ এবং চরখাইতে আমাদের আত্মরক্ষামূলক অবস্থান ছিল। অন্যদিকে উত্তর-পুর দিকের অবস্থান ছিল জৈস্তিয়াপুর, হেমু এবং খাদিম নগরে। শহর ও ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশের অন্য পথটি এসেছে উত্তর-পশ্চিমে ছাতকের ভেতর দিয়ে এবং উত্তরে গোয়াইন থেকে এবং এসব পথে শক্ত কোন সমাবেশ ঘটায়নি। সুতরাং বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনার জন্য এ পথগুলোর ওপর তারা কোন অক্ষ রচনা করতে পারবে না। অতএব, ব্রিগেড তার প্রাথমিক মনোযোগ নিবন্ধ করে আঁট্রামের দিকে।

সবচেয়ে বেশি হুমকির আশংকা করা হয় যে অক্ষে সেখানে পুরো ৩১ পাঞ্জাবকে নিয়োগ করা যেতে পারে না। কেননা, মুক্তিবাহিনী পরিচালিত হয়ে শক্ত কম স্পর্শকাতর পথ অনুসরণ করে সিলেটের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। সুতরাং ব্যাটালিয়নকে আটটি ফ্রপে বিভক্ত করে পুরে আঁট্রাম থেকে পশ্চিমে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত বিভিন্ন সীমান্ত চৌকিতে ভাগ করে দেয়া হয়। নিয়মিত সৈনিকদের করা হলো ‘মেরুদণ্ড’। সাথে পাঁচমিশালী আধা-সামরিক বাহিনী মিশিয়ে তাদেরকে করা হয় ‘পেশীশক্তি সম্পন্ন’।

অন্যান্য স্থানের মতোই ১৫ অঞ্চোবর থেকে এ সীমান্তে শক্ত তৎপর হয়ে ওঠে। তখন থেকে ৮৫ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর ফিল্ড গান-এর একটি ব্যাটারি ও মুক্তিবাহিনীর এ

ব্যাটালিয়ন (৩ ইস্ট বেঙ্গল) সৈন্যের সমর্থন নিয়ে ছাতক আক্রমণ করে। স্পষ্টতই শহর এবং শহরটির সিমেন্ট ফাস্টের দখল করে নেবার লক্ষ্য ছিল তাদের। আধা-সামরিক বাহিনীর যেসব সৈন্য এ পথটির প্রহরায় ছিল তারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থান পরিত্যাগ করে চলে আসে, তবে শহরে গেড়ে বসে। অবস্থানকে শক্ত করার জন্য চারখাই থেকে এক কোম্পানি নিয়মিত সৈন্য ও দু'টি ফিল্ড কামান পাঠানো হয়। পরে পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্য এবং অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কাছ থেকে এক কোম্পানি সৈন্য ধার করা হয়। আক্রমণ করা হয় ২৩ অক্টোবর এবং সফল হয়।

আমাদের সাফল্য শক্র জন্য এই উপলক্ষি সৃষ্টিতে সহায়ক হয় যে, সে যদি আমাদের ভূখণ্ড দখল ও অধিকারে বাখতে চায় তাহলে তাকে বড়সড় বাহিনী নিয়োগ করতে হবে। অতএব, শক্র ২১ নভেম্বরে আটগ্রাম ও জকিগঞ্জ এলাকায় এক ব্রিগেড (৫৯ ভারতীয় ব্রিগেড) সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে। ৩১ পাঞ্চাবের নিয়মিত সৈন্যদেরসহ আমাদের সেনাদলকে সে পিছু হটিয়ে দেয়। আমরা অনুপ্রবেশকারীদেরকে স্থানচ্যুত করতে পারি না এবং আমাদের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করতে হলো। আমাদের নতুন রক্ষাবৃহ রচিত হয় চারখাইতে—সিলেট থেকে পুবে বত্রিশ কিলোমিটার দূরত্বে। ২০২ ব্রিগেড ১২ আজাদ কাশ্মীরের দুই কোম্পানি সৈন্য পেয়ে যায়। এরা নভেম্বরের শেষাশেষিতে পঞ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে পৌছে। এই নতুন সৈন্যরা স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে পরিচিত ছিল না বলে তাদেরকে শ্বতুভাবে সম্পাদনের জন্য কোন দায়িত্ব দেয়া হয় না। দু'টি কোম্পানির একটিকে চারখাই এবং অপরটিকে জেন্তিয়াপুরে নিয়োগ করা হলো।

কোম্পানি দু'টির সংযুক্তিতেও শক্রের লক্ষ্য ও কৌশল ক্ষতিগ্রস্ত হলো না। মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় আমাদের রাষ্ট্র সীমার মধ্যে অনবরত ঠোকর মেরে চলে। ৩ ডিসেম্বর সে আটগ্রাম থেকে তাহিরপুর পর্যন্ত সীমান্ত বরাবর কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ভেতরে শক্র প্রবেশ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ঘটলো: ছাতকে পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার অভ্যন্তরে; সুনামগঞ্জে তের থেকে পনের কিলোমিটার এবং জকিগঞ্জে ত্রিশ কিলোমিটার অভ্যন্তরে চলে আসে তারা। এ সেষ্টের শক্র দখলে চলে যায় কয়েকশ' বর্গকিলোমিটার এলাকা।

পঞ্চিম পাকিস্তানে যখন যুদ্ধ শুরু হয় সে সময় সিলেট অঞ্চলে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংকুচিত হয়ে আসে পুবে চারখাইতে, উত্তরে হেমু এবং উত্তর-পঞ্চিমে ছাতকে। সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রথম তিনিদিনে আমাদের ব্রিগেড এ প্রতিরক্ষা লাইনে আঁকড়ে থাকে। মূলত শক্র সিলেটের বিরুদ্ধে তার বাহিনীকে নিয়োগ করলো না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আখাউড়া-ব্রাক্কণবাড়িয়ার প্রধান অক্ষে পরিস্থিতি তাদের পক্ষে দানা বাধলো। ৭ ডিসেম্বরে শুধু ২৭ ব্রিগেডই মেঘনার দিকে পশ্চাদপসরণ করলো না—৩০৩ ব্রিগেডও (মৌলভীবাজার) স্থানান্তরে গেল। এখন এ শুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহরটির ভাগ্য নির্ধারণে শক্র একক অধিকার লাভ করলো।

সিলেটের মি. আজমল চৌধুরী ছিলেন একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি ৭ ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর সদর দফতরে আসেন। জানান, শহর থেকে দু' কিলোমিটার পুবে মিরনচকে হেলিকপ্টার থেকে শক্র সৈন্য অবতরণ করেছে। বললেন, তিনি নিজে তা

দেখেছেন (যুদ্ধের পর তিনি মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং নিষ্ঠুর হত্যার শিকার হন)। ঠিক একই সময়েই ব্রিগেডিয়ার রানার সদর দফতরের ক্যাটেন জাফর সাদিপুর ফেরির দিক থেকে সিলেট শহরে প্রবেশ করে। তার সঙ্গী ছিল মাত্র সাতজন।

স্থানীয় সামরিক আইন সদর দফতরে জাফরের সঙ্গে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরফরাজের দেখা হয়। জাফর তাকে হেলিকপ্টার অবতরণস্থলের দিকে নিয়ে গেল। তারা গণনা করলেন ন'টি হেলিকপ্টার তাদের ভেতরকার তার খালাস করে আকাশে উঠে গেল। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন তারা। ঘড়ির কাঁটা তখন ৪টা ৩০ মিনিটের ঘরে। তার শক্রুর শক্তির একটা আনন্দমানিক হিসেবে কথলেন। দেখলেন, মাত্র সাতজন সৈন্য নিয়ে দু' কোম্পানি সৈন্যকে বিতাড়ন করা অসম্ভব ব্যাপার।

ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ জৈতিয়াপুর অবস্থান থেকে ৩১ পাঞ্চাবের ২৬ জন সৈন্য বের করে এনে শক্রকে প্রতিহত করার জন্য ক্যাটেন বাসারাতের অধিনায়কত্বে ন্যস্ত করলেন। যখন তিনি এই এলাকার দিকে এগোলেন, দেখলেন আরো শক্র সৈন্য এবং কামানের নতুন চালান হেলিকপ্টার থেকে নামছে। তিনি ভাবলেন, তার প্লাটুনের পক্ষে একটি ব্যাটালিয়নকে (বিয়োগকৃত) বিতাড়ন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি নালার এ পাশ থেকে কয়েকটি শুলি ছুঁড়ে তৃণি লাভের চেষ্টা করলেন।

একই সময়ে ২২ বালুচের পঞ্চাশজন বিচ্ছিন্ন সৈন্য লাতু-কালোরার দিক থেকে ঝেঁটে সিলেটে এসে হাজির হলো। বাসারাতের শক্র বৃদ্ধির জন্য তাদের বাহিনীর সাথে সংযুক্তির জন্য পাঠানো হলো। এদিকে রাত পেরিয়ে তারিখ তখন ডিসেম্বরের ৮-এ পড়লো। আমাদের সৈন্যরা একবারের জন্যও দৃঢ়তর সাথে হেলিকপ্টারবাহী সৈন্যদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো না। শুধু অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখলো, শক্র তার বাহুর বিস্তার ত্রমশ উভর দিকে ঘটিয়ে চলেছে। স্পষ্টতই সে চারখাইকে সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। একই সময়ে দু'টো হেলিকপ্টার সম্মত প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সার্কিট হাউস এবং কায়েন সেতুর ওপর দিয়ে উড়ে গেল। হঠাত করেই একটি হেলিকপ্টার থেকে একটি বোমা ফেলা হলো—যা সার্কিট হাউসের চতুরের মধ্যে বিস্ফোরিত হলো। বোমাটি চারজনকে আহত করলো। এদের মধ্যে একজন ছিল গোয়েন্দা বিভাগের কেরানি এবং অপর তিনজন পুলিশ। অন্যান্য সৈন্যরা আহতদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতেই আরেকটি হেলিকপ্টার থেকে তাদের ওপর বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো। হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়লো।

৮ ডিসেম্বরের সক্রান্তি ২২ বালুচের আরো দু'টি কোম্পানি শহরে এসে পৌঁছে। এছাড়া ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ৫০ জন এবং ৩১ পাঞ্চাবের ৪৫ জন আগে থেকেই সেখানে ছিল। সবকে নিয়ে একটি ব্যাটালিয়ন (বিয়োগকৃত) হয়ে গেল। চারটি ফিল্ড কামান (৩১ পাঞ্চাবের দু'টো এবং ২২ বালুচের দু'টো) পাওয়া গেল। তখন ব্রিগেড সদর দফতরে তিনজন ব্রিগেডিয়ার বসে আছেন—হাসান, রানা এবং সলিমুল্লাহ, একটি কঙ্কালসার ব্রিগেডকে সেনাপতিত্ব প্রদানের জন্য।

এই মিশ্রিত ব্যাটালিয়ন এবং চারটি ফিল্ড কামান ২২ বালুচের কমাতিং অফিসারের অধীনে দেয়া হলো হেলিকপ্টারবাহী সৈন্যদের পর্যন্ত করতে। তিনি এ দায়িত্ব পালনে

অস্থীকার করেন। কেননা, তিনি যুক্তি দেখালেন, ‘ক্লান্ট-শ্রাউট সৈন্যরা নৃতন করে বাঁপিয়ে পড়ার অযোগ্য’ পরদিন (৯ ডিসেম্বর) ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসারকে এ দায়িত্ব দেয়া হলো। তিনিও একই কারণ দেখিয়ে মিশন পালনে অস্থীকৃতি জ্ঞাপন করলেন।

১০ ডিসেম্বর নতুন আরেকটি আক্রমণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলো। আক্রমণের জন্যে দুটি সুচালো শলাকাবিশিষ্ট টাক্স ফোর্স গঠিত হলো ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ৩১ পাঞ্জাবকে নিয়ে। প্রথমটি সম্মুখবর্তী অবস্থান থেকে প্রথমে গোলাগুলি করে ‘আক্রমণের ভান’ করবে এবং পরে অপরটি উভুর দিকে মুখ্য আক্রমণটি করবে। নির্ধারিত সময়ে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স সম্মুখ থেকে আক্রমণের ভান করে চিঠ্কার করে উঠলো, ‘চার্জ’। কিন্তু অন্য শলাকাটি বিদ্ধ করতে ব্যর্থ হলো।

এদিকে আমরা ভাবছি শক্রকে বিতাড়িত করা খুবই শক্ত ব্যাপার। অন্যদিকে সে তার অবস্থানে টিকে থাকার ক্ষমতা সম্পর্কে ছিল দ্বিধাপ্রস্ত। যুদ্ধ শেষে ৫ গুর্খা রাইফেলস-এর (হেলিকপ্টারবাহী বাহিনী) একজন ভারতীয় অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমার কাছে স্বীকার করেন, ৭/৮ ডিসেম্বর রাতে সর্বপ্রথম গুলিটি ঘৰ্ষন বৰ্ষিত হয় তখন তার কমান্ডিং অফিসার ‘পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে এড়ানো জন্য প্রত্যাহারের কথা ভাবছিলেন’। কিন্তু তার দ্বিধাপ্রস্ততা তাকে বাঁচায়। পাকিস্তান চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলে তিনি মনোবল ফিরে পান এবং অবস্থানে রয়ে যান।

ইতিমধ্যে শক্র পদাতিক সেনাদল জকিগঞ্জ অক্ষ দিয়ে এগিয়ে এলো হেলিকপ্টারবাহী সৈন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য। যে হেলিকপ্টারবাহী শক্র সৈন্যদের পর্যন্দন্ত করতে আমরা ব্যর্থ হই—তাদের সাথে পদাতিক সেনাদলের সংযোগ স্থাপিত হয় পাঁচদিন পর, ১২ ডিসেম্বর। ১৩ ডিসেম্বর আমরা নিজেদেরকে আরো সংকুচিত করে আনি এবং সিলেট শহরের কিছু অংশ এবং শালুকিচর বিমান অবতরণ ক্ষেত্রটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে সন্তোষিতে বসে থাকি। বাদ বাকি অংশ ভারতীয় এবং মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। ১৬ ডিসেম্বরে যুদ্ধ শেষ হওয়া সময় পর্যন্ত তিনি বিগেড়িয়ার তাদের সৈন্যদের নিয়ে সিলেটেই বসেছিলেন।

## চ্যালেঞ্জের মুখ্য চাঁদপুর (৩৯ এডহক ডিভিশন)

মধ্য নভেম্বরে জেনারেল হেড কোয়ার্টার ঢাকাকে ইঙ্গিত দেয় যে, মুখ্য আয়াতটি পুর দিক থেকে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অতঃপর জেনারেল নিয়াজি নতুন করে মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট করলেন। তাকে সহায়তা করেন উপসামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল রহিম খান। তিনি শক্ত অনুগ্রহবেশের সম্ভাব্য পথ হিসেবে কুমিল্লাৰ দক্ষিণ পার্শ্বভাগ চিহ্নিত করেন। তখনও এলাকাটি চতুর্দশ ডিভিশনের অধীনে ছিল। এলাকাটি প্রস্ত্রের দিক থেকে বেশ প্রসারিত নিয়াজি এই 'নরম তলপেট' এলাকাটির দায়িত্ব রহিমের ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঢাকা থেকে ৫৩ ব্রিগেড এবং ১১৭ ব্রিগেড (কুমিল্লা) তার অধীনে দেয়া হলো।

জেনারেল রহিমকে ইয়াহিয়া আমলের একজন অন্যতম সেরা দক্ষ জেনারেল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিছু স্টাফ অফিসার এবং কিছু অপারেশনাল মানচিত্র নিয়ে মেঘনার পুরপাড়ে চাঁদপুরে তিনি তার সদর দফতর স্থাপনের জন্য ২১ নভেম্বর রোববার ঢাকা ত্যাগ করলেন। চাঁদপুরে প্রধান সড়কের ওপর মুজাফফরগঞ্জে তিনি তার সদর দফতর স্থাপন করেন। তার দুইদিকে—কুমিল্লা এবং ফেনীতে একটি করে ব্রিগেড রাইল। রাচিত পরিকল্পনাটির লক্ষ্য ছিল এই—যদি শক্ত এই সড়ক দিয়ে আসার সাহস দেখায় তাহলে কাঁচির ফলার মত করে দুইদিকের দুটি ব্রিগেড শক্তকে কেটে-ছেঁটে নরকে পাঠাবে।

৩৯ ডিভিশনের দক্ষিণ সীমান্ত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত। এই এলাকা দিয়ে কোন বিরাট ধরনের সামরিক বিচলন সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেডের (৯৭) অধীনে দেয়া হল। অধিনায়কত্বে থাকলেন ব্রিগেডিয়ার আতাউর্রাহ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তার অধীনে একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন (২ কমান্ডো) ছিল কাঞ্চাইতে এবং ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ছিল চট্টগ্রামে। এছাড়া তার অধীনে কিছু মিশ্রিত সৈন্য ছিল। এরা ছিল ২১ আজাদ কাশ্মীরের দুই কোম্পানি সৈন্য ইপিসিএএফ, রাজাকার এবং পুলিশ বাহিনীর লোকজন। একমাত্র সমুদ্র থেকে অবতরণ ছাড়া অন্য কোন গুরুতর হুমকি এই এলাকার জন্য ধারণা করা হয়নি। যাকে বাধা দেয়া কার্যত অসম্ভব ছিল এর বিস্তৃত তটরেখার জন্যই।

মূল যুদ্ধটি লড়তে হবে কুমিল্লা ও বেলোনিয়ার উচ্চভূমি এলাকায়। পাকিস্তান হকি টিমের প্রখ্যাত ক্যাপ্টেন ব্রিগেডিয়ার আতিফের অধীন কুমিল্লা ব্রিগেড (১১৭)-এর জন্য পুরোমাত্রায় প্রস্তুত ছিল। ব্রিগেডিয়ার ক্যাটনমেন্টকে একটি দুর্গে পরিণত করে এবং এক মাস চলার উপযোগী খাদ্য ও যুদ্ধ সম্ভার জমা করে রাখে। পুর পার্শ্বভাগে ট্যাঙ্ক গতিরোধক পরিষ্কার খনন করা হয়। ব্রিগেডটি তার তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন—৩০ পাঞ্জাব, ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং ২৩ পাঞ্জাবকে কুমিল্লার উত্তর থেকে দক্ষিণে চৌক্ষণ্য পর্যন্ত নিয়োজিত

করে। ডিভিশনের সম্মুখভাগকে সমর্থনদানের জন্য ছিল একটি গোলন্দাজ ফিল্ড রেজিমেন্ট, একটি মার্টার ব্যাটারি ও দু'টি ট্যাংক।

ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজির (জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে কোন আত্মায়তার বন্ধন নেই) অধিনায়কত্বে ছিল ৫৩ ব্রিগেড। এই ব্রিগেডের ১৫ বালুচ ও ৩৯ বালুচ ফেনী ও বেলোনিয়ার, উচ্চভূমির প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধের আগেই উচ্চভূমির অর্ধাংশ শক্রের হস্তগত হয়ে যায়। এই দখল তাকে ফেনী-চট্টগ্রাম রোডে ওঠার সুযোগ এনে দেয়। এই সড়কটি সমৃদ্ধ বন্দর এবং প্রদেশের বাকি অংশের মধ্যে একমাত্র সংযোগসূত্র। শক্র দক্ষিণ দিক দিয়ে না এসে এই সড়ক ধরে এগিয়ে উত্তর দিক থেকে চট্টগ্রামে আয়ত্ত হানতে পারে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান জেনারেল নিয়াজির হাতে প্রস্তুত হল। তিনি ব্রিগেডিয়ার তাসকীনের অধিনায়কত্বে আরেকটি এড়ক ব্রিগেড সদর দফতর (১১) সৃষ্টি করলেন এবং এই আগমন পথটির দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করেন। তাসকীনের অধীনে অধিকাংশই ছিল ইপিসিএএফ-এর লোকজন। এছাড়া তিনি ২১ আজাদ কাশীরের ব্যাটালিয়ন সদর দফতরসহ আরো দু'টি কোম্পানি লাভ করেন। ২১ আজাদ কাশীর নভেম্বরের শেষ দিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসে।

যখন ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন প্রথম চাপাটি গিয়ে পড়ে কুমিল্লার দক্ষিণে অবস্থানরত ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ওপর। এর দু'টি কোম্পানি নিয়োজিত ছিল সীমান্তে পাবত্তীপুর নদীর পুব দিকে এবং অন্য দু'টি কোম্পানি ছিল লালমাই পাহাড়ের পশ্চাতে। ব্যাটালিয়ন সদর দফতর ছিল অগ্রবর্তী কোম্পানি দু'টির সাথে। ৩/৪ ডিসেম্বর রাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬১ মাউন্টেইন ব্রিগেড আক্রমণ করে অগ্রবর্তী কোম্পানি দুটিকে। এক রেজিমেন্ট মাঝারি পাঞ্চালির কামান ও এক ক্ষেয়াজ্বন ট্যাংক আক্রমণে সহায়তা দেয়। আত্মরক্ষাকারীয়া পদাতিক সেনা-উপযোগী অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করার আওশাণ চেষ্টা চালায় এবং তিনটি শক্র ট্যাংক ঘায়েন করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা শক্রের চাপকে কোনক্রমেই ছিল করতে পারে না। ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার পার্বতীপুর নদীপাড়ের দেশাভ্যন্তরে পচাদপসরণের অনুমতি চাইলো। কিন্তু তাকে দৃঢ়তর সাথে দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ দেয়া হলো। যখন সে সম্মুখভাগে ব্যস্ত ছিল তখন ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীর পরিচালনায় তাকে ঘিরে ফেলে এবং তার পশ্চাতে নদীর পূর্বপাড় দখল করে নেয়। তৎক্ষণাত্ম ব্যাটালিয়নটি ব্রিগেড সদর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে।

এ বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে ব্রিগেডিয়ার আতিক্রমে অস্বীকৃত ফেলে। তিনি দু'টো কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। প্রথমত ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ভাগ্যে কি ঘটলো? দ্বিতীয়ত, যদি ব্যাটালিয়নটির পতন ঘটে তাহলে শক্রের অগ্রপদক্ষেপের ধারাটি কি হবে? সে চাঁদপুর অভিমুখে এগিয়ে যাবে, না কুমিল্লা দখলের জন্য উত্তর দিকে ধাবিত হবে?

প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আতিক্রম ৩০ পাঞ্চালের একটি যোদ্ধা টহল দল পাঠালেন। টহল দল কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খোঁজ-খবর করলো এবং ফিরে এসে রিপোর্ট করলো যে, ওই এলাকায় শক্র সৈন্যর চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে কোথায় ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স? তারা কী দক্ষিণে পিছিয়ে এসেছে? এই ধারণার ওপর নির্ভর করে ঠিক তার দক্ষিণে অবস্থানরত ২৩ পাঞ্চালকে একটি বার্তা পাঠানো হলো—তারা যেন ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের

সৈন্যদের গ্রহণের জন্য তৈরি থাকে। কিন্তু সেখানেও কেউ হাজির হল না। রহস্যের জলে ছিঁড় করে ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একজন হাবিলিদার, সে ৪ ডিসেম্বর বেলা ১১ টার সময় কুমিল্লায় এসে পৌছে। তার আনীত খবরটি হল,— “দু’টি কোম্পানিসহ কমান্ডিং অফিসার শক্র কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তার সংবাদকে সত্যায়িত করলো অল ইন্ডিয়া রেডিওর এক গর্বিত ঘোষণা। বেলা হল, ছয়জন অফিসারসহ একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও দুইশ’ সৈন্যকে বন্দি করা হয়েছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে এটা ছিল একটি বড় রকমের বিপর্যয়। ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের পরিত্যক্ত ফাঁককে ভরার জন্য ২৩ পাঞ্চাবকে তার উত্তর বাহ্যিকে বিস্তারের আদেশ দেয়া হল। কিন্তু সে আদেশ পালনে ব্যর্থ হল। কেননা, তার ওপর ৩০২ ভারতীয় বিগেড ও এক রেজিমেন্ট ফিল্ড কামান ঝাপিয়ে পড়ে। ৩/৪ ডিসেম্বর রাতে প্রচণ্ড চাপের মুখে থেকে ২৩ পাঞ্চাব ডাকাতিয়া নদী পাড়ের দেশাভ্যন্তরে পশ্চাদপসরণের অনুমতি চাইলো। কিন্তু তাকে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানে সেঁটে থাকতে আদেশ দেয়া হলো। অনুমতি অবশ্য মিললো পরদিন সকালে। কিন্তু তখন পশ্চাদপসরণ অসম্ভব হয়ে গেল। কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশফাক আলী সৈয়দ সূর্যাস্তের পর পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু দিনের বেলায় তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর ইকবাল পুনঃসমাবেশ নিয়ে লাকসাম থেকে তাঁর কাছে পৌছানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ডাকাতিয়া নদীর পুর পাশ থেকে অনুপ্রবেশকারী শক্র তাকে আক্রমণ করে। এর অর্থ হল, ২৩ পাঞ্চাবের পশ্চাদপসরণের পথও কেটে দেয়া হয়েছে। মেজর জাফর বিগেড়িয়ার আসলাম নিয়াজির কাছে শক্র এই উপস্থিতির সংবাদ জানিয়ে দিল। কিন্তু এ তথ্যকে তিনি বিশ্বাস করতে অস্বীকৃত জানিয়ে বলেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি মুক্তিদের দেখেছে?’

যখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ জানতে পান শক্র তার পশ্চাতে হাজির হয়ে গেছে, তিনি তখন সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং চারটে তিরিশ মিনিটে তার ব্যাটালিয়ন সদর দফতর গুটিয়ে ফেললেন। আহতদের ডাকারের হাওলায় রেখে গ্রামের ভেতর দিয়ে লাকসামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আর কোম্পানিকে তার সাথে লাকসামে মিলিত হবার জন্য একটি বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। অন্যদিকে পার্শ্বভাগের কোম্পানিগুলো পশ্চাদপসরণে সক্ষম হল না। কেননা, তখনো সে শক্র সঙ্গে লিঙ্গ ছিল। অবশ্যে এই কোম্পানিটি রাতে পশ্চাদপসরণ করলো এবং ডাকাতিয়া নদীর অবস্থানে—পার্বতীপুরে,—যেখানে আমাদের কামুন পাতা আছে, সেদিকেই এগিয়ে যায় সে। অথচ উপলক্ষ করতে পারলো না এলাকাটি তখন শক্রের নিয়ন্ত্রণে। ফলে মেজর আকরাম নিজেই হেঁটে গেল শক্রের পকেটের ভেতর এবং তার অনেক লোকই কাঁচি কাটা হল। পেটে গোলার আঘাতে ধরাশায়ী হল। এবং মৃতবৎ অবস্থায় মাঠের মধ্যে পড়ে রইল। পরদিন সকালে ভারতীয়রা তাদের এই দখলকৃত এলাকা অনুসন্ধানে এসে দেখে মেজর আকরাম তখনও বেঁচে আছে এবং বেঁচে আছে আর কয়েকজন উৎসর্পীকৃতপ্রাণ সৈনিক। তাদের ভারতীয়রা নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। মেজর আকরাম (এখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল) এখনও সেই ভয়াবহ স্মৃতি এবং প্রত্যাহারের স্থায়ী ক্ষত চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে।

২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের আত্মসমর্পণ এবং ২৩ পাঞ্চাবের প্রত্যাহারে এমন একটি

উল্লেখযোগ্য ফাঁক সৃষ্টি হল—যা দিয়ে শক্র চাঁদপুর সড়ক বরাবর বড় রকমের বাহিনী বের কর আনতে পারে। ৫ ডিসেম্বর সকালে ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজি তার ব্রিগেড প্রত্যাহার এবং লাকসামে—যেখানে ২৩ পাঞ্জাবের পতন ঘটেছে, সেখানে তার ব্রিগেডের (১৫ বালুচ ও ৩৯ বালুচ) সমাবেশের আদেশ দেয়া হল। মুজাফফরগঞ্জ-চাঁদপুর সড়ক থেকে দক্ষিণে লাকসামের দূরত্ব দশ কিলোমিটার। এটাকে একটি দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ২১ আজাদ কাশীরের দু'টি কোম্পানির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জায়েদীকে এবং (অন্য দু'টি কোম্পানি, যারা চতুর্দশ ডিভিশনের সাথে যুক্ত ছিল) লাকসামে তাদেরকে অন্যান্যের সঙ্গে যুক্ত হবার নির্দেশ দেয়া হল। শক্র বিমান আক্রমণের ভয়ে ১৫ বালুচ, ৩৯ বালুচ ও ২১ আজাদ কাশীর ৫ ডিসেম্বর দিনের বেলায় অবস্থান থেকে সরলো না। রাতে তারা তাদের প্রত্যাহারের কাজ সম্পন্ন করলো। তাংকশিকভাবে তাদেরকে কোনভাবে ব্যবহার না করে আদেশ দেয়া হল—‘যে যেভাবে পারে’ সেভাবে যেন রাত কাটায়। পরদিন সকালে ব্রিগেডিয়ার নিয়াজি তাদের ব্রিফিং দেবেন। ৩৯ বালুচের কমান্ডিং অফিসার ডিভিশনাল সদর দফতরকে বেতার মারফত জানায়, সে দ্রুত বেলোনিয়া থেকে পিছু হটে এসেছে এবং আদেশের অপেক্ষায় আছে। তাকে বলা হল যে, নতুন দায়িত্ব অর্পণের জন্য আগামীকাল সকালে জিওসি লাকসাম যাচ্ছেন।

পরদিন, ৬ ডিসেম্বর, জেনারেল রহিম গাড়িতে করে লাকসামের পথে রওনা হলেন। মুজাফফরগঞ্জ থেকে কিছু দূরে গিয়ে তার পাইলট জিপ মর্টার ও হালকা অস্ত্রের গোলাগুলির মুখোযুথি হলে তিনি তার যাত্রা বাতিল করে চাঁদপুরে ফিরে এলেন। কেননা, গোলাগুলি নির্দেশ করছে যে, শক্র ইতিমধ্যে সড়ক অবরোধ করে ফেলেছে। এটা বাস্তবিকই চাঁদপুরের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করলো। এখন দৃঢ়তা এবং দক্ষতা দেখাবার সময় এসেছে। একটি ব্রিগেড আছে লাকসামে। অপরটি অপেক্ষা করছে কুমিল্লায়। এছাড়াও জেনারেল রহিম পেশাগত দক্ষতার উজ্জ্বল নিয়ে আছেন চাঁদপুরে, অভিজ্ঞতাকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য। ভারতীয়দের পুছ কাঁচি দিয়ে কাটতে এবং পশ্চাদপসরণের জন্য শক্র যাতে পেছনে ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়, সে লক্ষ্যে তিনি তার দু'টো ব্রিগেডকে নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী ছত্রিশ ঘটায় এসবের কিছুই ঘটলো না। ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজি লাকসামে রসে ‘দুর্গ প্রতিরক্ষা সংগঠন’-এ মনোযোগী ছিলেন। এদিকে শক্র চাঁদপুরের দিকে ত্রুটাগত এগিয়ে আসছিল। কুমিল্লা তার দেড় ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে স্থায়ী যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। দুর্গের নিরাপত্তাকে ত্যাগ করতে তারা মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। ভারতীয়রা এই নিয়ন্ত্রণ সময়কে মুজাফফরগঞ্জ-চাঁদপুর সড়ক বরাবর আরো সৈন্য বিচলনে ব্যবহার করলো।

আমাদের প্রথম সেনাদলটি ৭ ডিসেম্বরে লাকসাম থেকে বেরিয়ে আসে। ২১ আজাদ কাশীরের একটি কোম্পানি এবং ১৫ বালুচ ও ২৩ পাঞ্জাব থেকে একটি করে কোম্পানি নিয়ে দু'টো গ্রন্ট পঠন করা হল। প্রতিটির অধিনায়ক করা হয় একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে। মুজাফফরগঞ্জ থেকে শক্রকে বিতাড়নের দায়িত্ব এদের দেয়া হল। বাকি সৈন্যরা (৩৯ বালুচ) দুর্গ রক্ষায় রইল। ১৫ বালুচের সৈন্যদের সোজা মুজাফফরগঞ্জের দিকে যেতে হয় আর ২৩ পাঞ্জাব এবং ২১ আজাদ কাশীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে লক্ষ্যের প্রতি এগিয়ে যায়। প্রথম

দলটি মুজাফফরগঞ্জের বহির্ভাগে গোলাগুলির সম্মুখীন হলো। অন্যদিকে পথে মুক্তিবাহিনীর হয়রানির দরুণ বিতীয় দলটি কোন কাজই দেখাতে পারলো না। অবশ্যে মুজাফফরগঞ্জের ওপর ‘আক্রমণ’ ব্যার্থতায় পর্যবসিত হল।

মুজাফফরগঞ্জে শক্তি শক্তিশালী বলে মনে করায় ১৫ বালুচকে লাকসামে ডেকে আনা হয়। অন্য সেনাদল দু'টিকে (২৩ পাঞ্চাব ও ২১ আজাদ কাশীর) আরো পশ্চিমে চাঁদপুর সড়কে হাজীগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আদেশ দেয়া হল। এই বাহিনী দু'টির দু'জন ক্রমান্বার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশফাক সৈয়দ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল জায়েন্দি গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সড়কের ওপর শক্তির মুখোমুখি হওয়াকে এড়িয়ে পার্শ্বদেশ থেকে হাজিগঞ্জে আঘাত করতে চাইলেন। কিন্তু তারা ধারণাও করতে পারেননি যে, শক্তি পাকা সড়ক বেয়ে তাদের চেয়ে আগে হাজিগঞ্জ পৌছে যাবে।

হাজিগঞ্জের দলটি ৭ ডিসেম্বর (মুজাফফরগঞ্জের উদ্দেশ্যে) লাকসাম পরিত্যাগ করে। সঙ্গে জরুরি প্রয়োজনীয় সরবরাহ নেয় না। কেননা, তারা ধারণা করে অপারেশন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এখন সৈন্যদের খাবার টান পড়লো। তারা দিন-রাত সমানে শক্তিভাবাপন্ন গ্রামাঞ্চলের ভেতর দিয়ে হেঁটে চললো। যেখানে পেল খাবার সংগ্রহ করলো পয়সার বিনিময়ে, পানি পান করলো পকুরের। তাদের সঙ্গে রান্না-বান্না করার কোন উপকরণ ছিল না। লাকসাম থেকে রান্না করা খাবারও সরবরাহ করা গেল না। কেননা, তারা পুর নির্ধারিত পথ ধরে যাচ্ছিল না-যাচ্ছিল মাঠ এবং খাল-বিলের মধ্যদিয়ে একেবেঁকে, মুক্তিবাহিনীর সন্দেজনক পকেটগুলি এড়িয়ে।

এইভাবে তারা ৩৬ ঘন্টা ধরে হাঁটলো এবং পথে ভারি বেতার যন্ত্র, হালকা মেশিন গানের অতিরিক্ত গোলাবারুদ এবং ছেঁড়া বুট জুতা পরিত্যাগ করে। তাদের যন্ত্রণা এতই তীব্রতর হয়ে ওঠে যে, রাতে গ্রামের বাড়ির বাতির কাঁপন তাদের চলাচল সম্পর্কে শক্তির সংকেত বলে মনে হতে থাকে। এই পদযাত্রা ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত সৈন্যদের কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশফাক সৈয়দ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল জায়েন্দি ৯ ডিসেম্বর মাঠের মধ্যে এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন এবং তাদের খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের গ্রন্থকে (সৈয়দের অধীনে ২৩ পাঞ্চাব এবং জায়েন্দির অধীনে ২১ আজাদ কাশীরকে) বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরদিন (১০ ডিসেম্বর) দু'জনেই আলাদা আলাদাভাবে শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। এটা ছিল ৩৯ ডিভিশনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

মেজর জেনারেল রহিম অনুধাবন করেন যে, চাঁদপুর রোড ধরে এগিয়ে আসা শক্তি দ্রুত তার সদর দফতরে আঘাত হানবে। তিনি আনুমতি চাইলেন। ৮ ডিসেম্বরের রাতে তার অনুরোধ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরে এসে পৌছলো। জেনারেল নিয়াজিকে তার সেরা জেনারেলের সংকটময় অবস্থার কথা জানানো হলো। সিঙ্কের ওপর লাল প্রিটের ড্রেসিং গাউন পরে তিনি তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। যখন তিনি অপারেশন কর্মে প্রবেশ করলেন, সে সময় আমি এবং কয়েকজন জুনিয়র অফিসার যুদ্ধ সম্পর্কিত নিজেদের

চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আলাপ করছিলাম। জেনারেল নিয়াজি সোজা অপারেশনাল মানচিত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মানচিত্রে ৩৯ ডিভিশন এলাকাধীন যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতির চিত্র রয়েছে। তিনি চাঁদপুর সংখ্যার ওপর ডান হাতের আঙুল স্থাপন করলেন এবং খুব জোরে মানচিত্রের ওপর চেপে ধরে তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিলেন: 'রহিমকে ঢাকায় চলে আসতে বল। পশ্চাতে নদী রেখে কীভাবে সে চাঁদপুরকে রক্ষা করবে? নিজের সদর দফতরকে রক্ষার জন্য তার মাত্র একটি কোম্পানিই আছে।'

শুধুমাত্র নদীপথেই জেনারেল রহিম পশ্চাদপসরণ করতে পারেন। তার বহরের প্রহরার জন্য নৌবাহিনীর গানবোট চাইলেন। তখন তার ডিভিশনাল সদর দফতরের দায়িত্বাধীনে ছিল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দু'টি প্লাটুন, ২৩ পাঞ্জাবের একটি প্লাটুন, কমান্ডো ব্যাটালিয়নের পঞ্চান্নজন সৈন্য এবং অর্ডন্যাপ, সিগন্যাল এবং সরবরাহ বিভাগের মিশ্র লোকজন। ওইদিনেই রহিম স্থানীয়ভাবে প্রাণ প্রয়োজনীয় জলযান যোগাড় করলেন ৯ ডিসেম্বর রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্য।

মধ্যরাতে নৌবাহিনীর গানবোট নারায়ণগঞ্জ থেকে (ঢাকার উপকল্পে) চাঁদপুরে পৌছলো। কিন্তু ১০ ডিসেম্বর ভোর সাড়ে চারটোর আগে রহিমের সদর দফতর চাঁদপুর জেটি পরিত্যাগে সক্ষম হল না। একটি ভাল জলযান চাঁদপুর থেকে ঢাকা পৌছাতে সাধারণত চার ঘন্টা সময় নেয়। কিন্তু ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য একটি বহর পাঁচ ঘণ্টায় দূরত্ব অতিক্রমের আশা পোষণ করলো। এর অর্থ হল, সকাল বেলায় বহরটি ঢাকার মাঝপথে থাকবে। সুতরাং জেনারেল রহিম পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে সংকেত পাঠান যে, তার সফরের শেষাংশে যেন বিমানবাহিনীর ছদ্রায়া দেয়া হয়। তিনি সম্ভবত জানতেন না, ৬ ডিসেম্বর থেকে আমাদের বিমান বাহিনী ভূমিতে শয়া নিয়ে পড়ে আছে। এর বিকল্প হিসেবে তিনি আরেকটি গানবোট (বিমান বিদ্রঃসী কামান সজ্জিত) চাইলেন। কিন্তু ঢাকার বিশেষজ্ঞরা এই অনুরোধকে নাকচ করে দেন, এই যুক্তিতে—গানবোট একটি থেকে দু'টি হলেও বিমান আক্রমণে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না। সুতরাং দ্বিতীয় আরেকটিকে ঝুঁকির মধ্যে নেয়া কেন।

সাকালে নাশতার সময় ভারতীয় জেটি সাধারণত সফরে আসতো। এই সময় দু'টো মিগ-২১ এস রহিমের কনভয়ের ওপর আঘাত হানলো। জেটগুলোর পালাক্রম এবং সংকল্পবদ্ধ আক্রমণে নিঃসঙ্গ গানবোটের বিমান বিদ্রঃসী কামান অকার্যকর প্রমাণিত হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমান থেকে ফেলা বোমায় বোটের ছাদ চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হয়ে গেল। যখন বোটের সবাই লাফিয়ে বাইরে চলে আসার চেষ্টা করছে তখনও ক্যাপ্টেন গানবোটটির সাথে আঠার মত লেগে থাকেন এবং দক্ষ হাতে চালিয়ে তাকে নদীর পাড়ে নিয়ে আসেন। যে সময় সবাই আঁচড়ে পাঁচড়ে লঞ্চ এবং গানবোট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে তখন জেটগুলো তাদের হতভাগী শিকারগুলোকে অনবরত শাস্তি দিয়ে চলেছে। মেজর বিল্লাহ (২ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন)—যে ২৫ মার্চ মুজিবের বাড়িতে আঘাত হেনেছিল,—সে এবং আরো তিনজন অফিসার মারা গেল। 'আহত'দের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল রহিম। তিনি পায়ে আঘাত পান। তবে মারাত্মক নয়। তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হল।

এদিকে লাকসামে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলো। ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজি

দেখলেন, মাত্র পাঁচটি কোম্পানি নিয়ে দুর্গ ধরে রাখা সম্ভব নয়। যখন শক্র রহিমকে ঢাকা পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যাবে তখন লাকসামকে ধরে রাখায় কোন গুরুত্ব বহন করে কী? অতএব ৯ ডিসেম্বর ব্রিগেডকে পিছু হটে কুমিল্লায় ১১৭ ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত হতে আদেশ দেয়া হল।

লাকসাম বেসামরিক হাসপাতালে অঘৰতী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সেখানে ১২৮ জন আহত সৈন্য ছিল। ৮ ডিসেম্বর তাদেরকে চাঁদপুরগামী রেল গাড়িতে তোলা হলো। চাঁদপুরের ভাগ্য তখন শুন্যে দোলায়মান। আহতরা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় শুয়ে সেই অন্ধকার রাতটি পার করলো। তাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা ছিল গুরুতর। প্রয়োজন ছিল তাৎক্ষণিক চিকিৎসার কিংবা অঙ্গোপচারের। ডাঙ্কারো সবার দিকে নজর দিতে পারলেন না। ক্যাপ্টেন হশমী একটি কেতলি ভর্তি বেদনানাশক মিকশার নিয়ে ট্রেনে উঠলেন এবং যন্ত্রণাকার সৈন্যদের অর্ধ-উন্মুক্ত মুখের ভেতর পরিমাণ মত তরল পদার্থ ঢেলে দেন। পরদিন তাদেরকে আবার ট্রেন থেকে নামনো হল এবং অঘৰতী চিকিৎসা কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা হল। এখন প্রশ্ন হল তাদেরকে কী কুমিল্লায় নিয়ে যাওয়া হবে?

৫৩ ব্রিগেড তার পরবর্তী গতিবিধির বিষয়টি ডাঙ্কার এবং আহতদের অন্ধকারের মধ্যে রাখে। বাদাবাকি শক্তিকে সে দু'টি সেনাদলে বিভক্ত করে। প্রথম দলটির অধিকাংশই ছিল ইপিসিএফ, মুজাহিদ ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা। তারা ১০ ডিসেম্বর মধ্যরাতে লাকসাম ত্যাগ করলো। ২৩ পাঞ্চাবের মেজর রাইসেমকে এই দলটির অধিনায়ক করা হলো। দ্বিতীয় দলটি আধ ঘটা পরে রওনা হলো। অধিনায়কত্ব অপৃত হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল নঙ্গের ওপর। তার অধীনে প্রধানত তার নিজের ৩৯ বাল্চের সৈন্যরাই ছিল।

লাকসাম থেকে কুমিল্লার দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার। হাঁটা পথে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সাধারণত কয়েক ঘটার বেশি সময় নেয়ার কথা নয়। কিন্তু এখন তাদেরকে গো-শকটের গতিতে চলতে হবে; সময় নেবে তিনগুণ। কেননা, পথে ভারতীয় কিংবা মুক্তিবাহিনীর মুখোমুখি হওয়া থেকে এড়িয়ে যেতে হবে। লাকসাম ত্যাগের আগে ৫৩ ব্রিগেড তাদের অধিকাংশ ভারি যুদ্ধ উপকরণ ধ্বন্স অথবা বিনষ্ট করলো; গোলা-বারুদের পেটি পানিতে ফেললো এবং খাদ্য সম্ভার পুড়িয়ে দিল। সঙ্গে নিল ব্যক্তিগত অস্ত্র এবং শরীরের সঙ্গে যুক্ত গুলির থলি। পরদিন সকালে ব্রিগেডিয়ার নিয়াজি কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রবেশ করেন। মেজর রাইসেমের দলটি সেনানিবাসে পৌছলো। লেফটেন্যান্ট কর্নেল নঙ্গে এবং তার সেনাদল পড়লো বিপাকে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নঙ্গে শক্রকে এড়ানোর জন্য অনির্ধারিত আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোন। মুক্তিবাহিনী হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা এড়াবার জন্য গ্রামের বাড়ি-ঘর পাশ কাটিয়ে গেলেন। পরের রাতে তিনি পৌছেন জাঙ্গালিয়ার কাছাকাছি। কুমিল্লা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় এগার কিলোমিটার দূরত্বে জাঙ্গালিয়ার অবস্থান। তিনি সেখানে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নেন। পরের দিন সকালে কুমিল্লা যাওয়ার জন্য এগোতেই তিনি জাসপুরে শক্রের অবস্থানের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। ফলে একটি ছেটখাট লড়াই ক্ষেত্রে পরিগত হয়ে গেল এবং অপরাহ্ন পর্যন্ত অবিরাম গোলাগুলি বিনিময় হতে থাকলো। এই সংঘর্ষে আমরা কোম্পানি কমাত্তার

মেজের তৈমুরসহ কয়েকটি মূল্যবান জীবন হারালাম। রাতের জন্য নইম তার সৈন্যদের জাঙ্গালিয়ায় ফিরিয়ে আনলেন পরদিন। সকালে ডিন পথে কুমিল্লায় যাওয়ার চিত্তা-ভাবনা করলেন।

১২ ডিসেম্বর শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নইম তার অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাদের কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে, ঢাকার দিকে তাদের যাওয়া উচিত। কেননা, কুমিল্লা দুর্গে পৌছানোর চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়েছে। অন্যরা বললো, আদেশ অনুযায়ী ১১৭ বিগেডের সাথে সংযুক্তির আরেকটি চেষ্টা নেয়া উচিত। সুতরাং প্রত্যুষে তারা জাঙ্গালিয়া পরিত্যাগ করে কুমিল্লা-ঢাকা সড়কে ওঠার জন্য উত্তর দিকে হাঁটা শুরু করলো। তারা বড়জোর কয়েক কিলোমিটার এগিয়েছে এমন সময় দলের অগ্রবর্তী সৈন্যরা রামমোহন ও কুমিল্লার মধ্যবর্তী জায়গায় ভারতীয় সৈন্যদের দেখতে পেল। তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং পকেট থেকে সাদা ঝুমাল বের করলো। তারপর শক্রের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ন সময়ের মধ্যে দলের আর সবাই ধরা পড়লো এবং ১২ ডিসেম্বর সকাল দশটায় তারা আত্মসমর্পণ করলো। জেনারেল রহিমের ডিভিশনে এটাই তৃতীয় বৃহত্তম আত্মসমর্পণ।

কুমিল্লা দুর্গ তখনও নিজের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছিল। দুর্গের ছিল দু'টি বিগেড, দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ও দু'টি ট্যাংক। তারা কুমিল্লা শহর পরিত্যাগ করে নিজেদের সেনানি-নবাসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। শহরটি ছেয়ে ছিল বাংলাদেশের পতাকায়। বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষামূলক কোন সতর্কতাও পালিত হচ্ছিল না। আলোকমালায় ঝলমল করছিল। অন্যদিকে সেনানিবাসটি মূলত অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকার পতন ঘটলেও কুমিল্লা গ্যারিসন তখনও আপন অস্তিত্ব ধরে রেখেছিল।

## চূড়ান্ত পচাদশসরণ

(৩৬ এডহক ডিভিশন)

মেজর জেনারেল জামশেদ তার ধীরস্থির বুদ্ধি এবং ন্যূন স্বভাবের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি মিলিটারি ক্রস লাভ করেন। ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের (ইপিসিএএফ) ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন তিনি। ইপিসিএএফ, রেঞ্জারস, রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীকে জেনারেল নিয়াজি তার অপারেশনাল কমান্ডের অধীনে এনে তাদের তার অধীনস্থ কমান্ডারদের ওপর ন্যস্ত করেন। সে কারণে জেনারেল জামশেদের অধীনে বেশিসংখ্যক লোক ছিল না। অতএব, তাকে আরেকটা টুপি পরতে দেয়া হয়। তাকে ৩৬ এডহক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং করা হল। টাঙ্গাইল ও মনমনসিংহ জেলাসহ ঢাকা এবং এর উত্তর এলাকা তাকে দেখাশোনার ভার দেয়া হল।

১৮৫ কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত ছিল ডিভিশনের সম্মুখভাগ যমুনার (প্রথম ব্রহ্মপুত্র) পুর পাড় থেকে সিলেট জেলার পশ্চিম প্রান্তসীমা পর্যন্ত। এ অঞ্চলে দু'টি প্রবেশপথ ছিল। শক্র উত্তর থেকে দক্ষিণগামী পথটি ব্যবহার করে ঢাকায় আসতে পারতো। পুবদিকে হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ প্রবেশ পথ আর পশ্চিম দিকে কামালপুর-জামালপুর অক্ষ। ডিভিশনের মাত্র দু'টি নিয়মিত পদাতিক ব্যাটালিয়ন ছিল। একটি ৩৩ পাঞ্চাব এবং অপরটি ৩১ বালুচ। তাদেরকে ৯৩ ব্রিগেডের অধীনে একত্রিত করা হল এবং অধিনায়ক করা হলো ব্রিগেডিয়ার কাদিরকে। কাদির ছিলেন একজন বৃদ্ধ সৈনিক এবং অবসর নেবার সময় হয়ে এসেছিল তার। ব্রিগেডিয়ার কাদির পূর্ব প্রবেশমুখে ৩৩ পাঞ্চাবকে এবং পশ্চিমে ৩১ বালুচকে নিয়োগ করলেন। তিনি তার সদর দফতর স্থাপন করেন ময়মনসিংহে।

শক্রকে সীমান্তে যত দীর্ঘ সময় সম্ভব বিলম্ব করিয়ে রাখার দায়িত্ব দেয়া হল ব্যাটালিয়ন দুটিকে, তারপর 'সময় হাতিয়ে নিয়ে' তারা ময়মনসিংহ ও জামালপুর দুর্গে প্রবেশ করবে। ছোট ব্রহ্মপুত্রের এ পাড়ের এই ছোট শহর দু'টিকে 'প্রবেশ নিষিদ্ধ রেখা' হিসেবে তৈরি করতে হবে।

যুদ্ধের সময় এই সেন্টারে তিনটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। কালামপুর সীমান্ত চৌকির অদ্য রক্ষাব্যুহের ঘটনা, বেচ্ছা পরাজিত ৯৩ ব্রিগেডের প্রত্যাহার এবং টাঙ্গাইলে ভারতীয় প্যারাসুট বাহিনীর অবতরণ। পরে এ সম্পর্কে আসবো।

আমাদের ৯৩ ব্রিগেডের বিপরীতে ছিল ভারতীয় ১০১ কমিউনিকেশন জোন—নামকরণের দিক দিয়ে প্রয়োগটা ছিল ভ্রান্তিমূলক। যুদ্ধ করার উপযোগী ছিল একটি স্থাপনা। একজন মেজর জেনারেল ছিলেন এই জোনের অধিনায়ক। যুদ্ধের আগে এই কমিউনিকেশন জোনের সাথে শক্র তার ১৮৫ ব্রিগেডের সমাবেশ ঘটায়। তাদের সঙ্গে প্রচলিত যুদ্ধ উপযোগী ফিল্ড ও মাঝারি কামান ছিল। অন্যদিকে এই দু'টো কুঠারকে মোকাবেলার জন্য আমাদের ছিল ১২০ এম এম-এর একটি মাত্র মর্টার ব্যাটারি।

উল্লেখিত দু'টি কৃতারের মধ্যে কামালপুর-জামালপুর প্রবেশপথ দিয়ে শক্তির প্রধান আঘাতটি আসতে পারে বলে ধারণা করা হয়, যা তার জন্য টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকার পথ উন্মুক্ত করে দেবে। পূর্বাঞ্চলীয় প্রবেশ পথ হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ ছিল তুলনামূলকভাবে অনুন্নত এবং আঘাতটি এ পথে আসার সম্ভাবনা কম ছিল। মানচিত্রে কামালপুরের অবস্থান একটি বিন্দুর চেয়ে বড় ছিল না। অথচ পক্ষিম অক্ষে এটা শক্তির জন্য ছিল হোঁচত খাবার মত প্রতিবন্ধকতা। এই সীমান্ত চৌকিটি পর্যন্ত না করে সে বক্ষীগঞ্জ, শেরপুর এবং জামালপুরে আসতে পারবে না। অতএব, প্রথমে যা আশা করা গিয়েছিল তার চেয়েও অধিকতর মনোযোগী হয় সে এটার ব্যাপারে।

শক্তি সর্বপ্রথম ১৯৭১ সালের ১২ জুনে লঘু পদক্ষেপে এগোয়। ওই সময় বিদ্রোহাত্মক তৎপরতাকে সমর্থনের জন্য সে কয়েকটি মাত্র গোলা নিষ্কেপ করে। আবার ৩১ জুনাই তার কার্যক্রম নৃতন মাত্রায় শুরু করে। এবার সে চৌকি 'আক্রমণ' করার উদ্দেশ্যে কিছু বিদ্রোহী পাঠালো। আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং বিদ্রোহী বাহিনী,—যাদের মধ্যে ছিল ষ্পেসক্যাটার্গী ইন্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইন্ট পার্কিস্তান রাইফেলস-এর লোকজন। তারা কিছু মৃতদেহসহ একটি ভারি মেশিনগান, ১২টি হালকা মেশিনগান, চারটে স্টেনগান, ৩০টি রাইফেল এবং একটি রকেট ল্যাঙ্গার ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের দু'মাসের ওপর নীরব করে রাখে।

২২ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলে ভারতীয় নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যরা সীমান্ত চৌকিটি আক্রমণ করে। একজন অফিসারসহ তাদের দশজন হতাহত হয় এবং সীমাত্তের অপর পারে চলে যায়। আরো শক্তি বৃদ্ধি করে ১৪ নভেম্বর তারা আবার আসে। ভারতীয় ১৩ গার্ড বাহিনী মূল আক্রমণটি পরিচালনা করলো। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে অনুসরণ করে। চৌকিটিকে সামনে থেকে ব্যস্ত রেখে তারা পার্শ্বদেশ দিয়ে অনুপ্রবেশ করে বক্ষীগঞ্জ-জামালপুর সড়কে অবরোধ অবস্থান প্রতিষ্ঠা করে। শক্তি কামান বেলা বারটা থেকে তিনটা পর্যন্ত থেমে থেমে ওই এলাকায় গোলাবর্ষণ করে চলে। আর পদাতিক সৈন্যরা কৃতিম আক্রমণের আশ্রয় নেয়। মনে হয় এই প্রচেষ্টিটি ছিল সীমান্ত চৌকিটিকে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে হীনবল করার একটি প্রক্রিয়া মাত্র; চৌকিটিকে দখল বা আঘাত করার উদ্দেশ্য ছিল না।

কামালপুরে আমাদের নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল সত্তর। এছাড়া ছিল রাজাকার ও রেঞ্জারসদের একটি প্লাটুন। তরুণ ও তাগড়া দেহের অধিকারী ক্যাপ্টেন আহসান মালিক ছিল তাদের অধিনায়ক। ৮১ এম এম ক্যালিবারের তিনটি মর্টার ছিল তার কাছে। যখন সীমান্ত চৌকিটিকে বিছিন্ন করা হয় তখন পক্ষাংভাগে অবস্থানরত ব্যাটালিয়ন সদর দফতর একজন অফিসারের অধিনায়কত্বে একটি সংযোগ বাহিনী পাঠায়। যদি প্রয়োজন পড়ে, সমর্থনদানের জন্য প্রায় চার কিলোমিটার দূরত্বের পথ বক্ষীগঞ্জ থেকে একরকম ঝাগড়াঝাটি করেই দু'টো ১২০ এম এম মর্টার আনা হয়। মর্টার নিয়োগ অথবা গাড়ি থেকে সংযোগ বাহিনী অবতরণের আগেই শক্তি সড়কের দুই পাশ দিয়ে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে। সৈন্যরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলো এবং পাল্টা জবাব দিল কিন্তু শক্তি ছিল সুবিধাজনক অবস্থানে। একজন অফিসারসহ

আমাদের সাতজন আহত হন এবং দশজন মারা গেল। আমরা চারটে যান এবং মর্টার দুটিও হারালাম। শক্র আমাদের একটি মেশিনগানও নিয়ে গেল। ভাগ্যদেবতা এবার প্রতিপক্ষের হয়ে হাসলো।

এই ব্যবহৃত সংযোগ প্রচেষ্টার পর আমাদের হাতে দু'টো বিকল্প খোলা রইলো। হয় কামালপুর চৌকির সৈন্যদের আমরা পিছিয়ে আসতে বলতে পারি এবং বক্ষীগঞ্জের প্রধান বাহিনীর সাথে সংযুক্ত হতে আদেশ দিতে পারি নতুবা যে কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে সরবরাহ অঙ্কুণ্ড রাখার চেষ্টা করতে পারি। ‘অগ্রবর্তী অবস্থানের রক্ষাব্যুহকে ধরে রাখা’—এই হল অফিসিয়াল নীতি। ফলে প্রথম বিকল্পটি বাতিল হয়ে গেল। অতএব, দ্বিতীয়টিকে অনুসরণ করতে হবে।

বস্তুত কামালপুর চৌকির প্রত্যাহার স্বাভাবিক কারণেই আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, ইতিমধ্যে সীমান্তের অন্যান্য চৌকিগুলো (নাকশী ও বারোমারি) গুটিয়ে আনা হয়েছিল। ৩১ বালুচের এই তিনটি চৌকি খালি হয়ে গেলে ৩৩ পাঞ্চাবের পশ্চিম পার্শ্বভাগ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অন্য কথায়, একটি চৌকি পরিত্যাগ করার অর্থ পুরো ব্রিগেড রক্ষাব্যুহকে গুটিয়ে আনা।

মধ্য নভেম্বরে কামালপুর চৌকিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পরও শক্র এটাকে দখল করে নেয়ার প্রচেষ্টা নিল না। যতদিন এর মজুদ খাদ্য ও গোলাবারুদের সম্ভাব রইল ততদিন পর্যন্ত টিকে রইল। ২৩ নভেম্বর ক্যাপ্টেন আহ্সান একদল রাজাকারকে টহল ডিউটিতে পাঠায়। তারা আর চৌকিতে ফিরে আসে না। নিয়মিত সৈন্যদের আরেকটি দলকে তাদের খোঁজে পাঠানো হল। এরাও ফিরলো না। সংকেতটি এখন পরিষ্কার হয়ে গেল। শক্র যখন সবদিক দিয়েই শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে এবং তার রক্ষাব্যুহের বাইরে যে কোন ভিন্নতর ব্যক্তিকে গিলে ফেলার জন্য বসে আছে। একই পরীক্ষার জন্য তৃতীয় আরেকটি দল পাঠানো পাগলামির শামিল। হারিয়ে যাওয়া টহল দলের সন্ধানে সাহায্য করতে ব্যটালিয়ন সদর দফতরকে বেতারের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হলো।

ব্যটালিয়ন সদর দফতর একটি অতিরিক্ত গাড়িসহ একদল সৈন্য পাঠায় সীমান্ত চৌকিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও হারিয়ে যাওয়া সৈন্যদের খুঁজে বের করতে এবং যদি কোন হতাহতের ঘটনা ঘটে থাকে, তাদেরকে তুলে আনার জন্য। এই ছোট সেনাদলটি পথে অর্থকিত আক্রমণের মুখোমুখি হলো। হতাহতদের তুলে আনার জন্য প্রেরিত গাড়িটি হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু দলের অন্যান্য সদস্যরা কোন রকমে বক্ষীগঞ্জ ফিরে আসতে সক্ষম হলো। পরবর্তী তিন দিনও একই রকমের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু কোন সাফল্য এলো না। অবশেষে ৩১ বালুচের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান ২৭ নভেম্বর সীমান্ত চৌকিটির বেষ্টনি ভঙ্গ এবং তাকে নবজীবন দানের জন্য এক দ্রুটি প্রচেষ্টা নেন। নিজেদের মধ্যে দ্রুত বজায় রেখে তিনটি দলকে সীমান্ত চৌকিতে গিয়ে মিশে যাওয়ার লক্ষ্যে বক্ষীগঞ্জ-কামালপুর সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। একই সঙ্গে অনুপ্রবেশ কারীদের সম্ভাব্য পালিয়ে যাবার পথ অবরোধ করার জন্য কামালপুর থেকে কয়েকটি ছোট দল প্রেরিত হল—যাতে অপারেশনকালে সবাইকে গুড়ে গুড়ে করে দেয়া যায়।

ইতিমধ্যে শক্র অবকৃত্ব সৈন্যদের চারদিকে আরো সৈন্যের সমাবেশ ঘটালো এবং কিছু অতিরিক্ত কামান বসালো । একজন গোলন্দাজ পর্যবেক্ষক সীমান্ত চৌকির প্রবেশ পথে সর্তক দৃষ্টি রাখলো ।

যে মুহূর্তে আমাদের তিনটি কাঁটা সামনের দিকে এগোলো তখনি শক্রের পর্যবেক্ষক তাদের কামানের দিক পরিবর্তন করে দলটির ওপর মুশলধারে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলো । তৎক্ষণাত্ অগ্রবর্তী দলটি ভূমিতে অবস্থান নিল শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় অঙ্গের খোরাক হতে । ইতিমধ্যে শক্রের হাটার বিমান সীমান্ত বরাবর উড়ে এল এই ধারণা দেয়ার জন্য যে, যদি প্রয়োজন পড়ে কামানের গোলাবর্ষণকে সহায়তাদান করা হবে বিমান থেকে আঘাত হেনে । অবশেষে সংযোগ । প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল । পরের রাতে (২৭/২৮ নভেম্বর) বিছিন্ন সীমান্ত চৌকিটি দখলের জন্য শক্র একটি আক্রমণ পরিচালনা করে । আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে । নেতৃত্ব দেয় ভারতীয় ১৩ গার্ডস-এর ‘সি’ কোম্পানি । কিন্তু ধন্যবাদ জানাতে হয় কংক্রিট বাংকারকে; এর চেয়ে বেশি সাধুবাদ পাবার যোগ্য সেই সব লোকদের দার্জের, যারা যেখানে বসেছিল । যতক্ষণ শক্র তাদের হালকা অঙ্গের কার্যকর পাহার মধ্যে না এলো ততক্ষণ তাদেরকে কাছাকাছি হবার সুযোগ দেয়া হয় । বুলেট বৃষ্টির মুখে শক্র দাঁড়াতে পারলো না এবং শেষ পর্যন্ত পিছু হটে গেল । পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন আহসানের সৈন্যরা তাদের পরিশ্রমের ফসল গণনা করে । গোলন্দাজ বাহিনীর একজন পর্যবেক্ষকসহ কুড়িটি মৃতদেহ পেল তারা । একজন সৈনিক বুকে হেঁটে নিঃসাড় পর্যবেক্ষকটির কাছে গেল এবং তার পকেট থেকে গোলাবর্ষণের নকশাটি উদ্ধার করে নিয়ে এল ।

দু'দিনের লড়াই দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করে । একদিকে সীমান্ত চৌকিটিতে পুনঃসমাবেশের আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা শক্র ব্যর্থ করে দিল, অন্যদিকে এই বিছিন্ন চৌকিটি দখলের শক্রের সকল চেষ্টা আমরা নস্যাত করে দিলাম । এই কঠিন সময়ের ভেতর বাস করেও সৈন্যরা উৎফুল্ল মেজাজেই ছিল । তেজস্বিতার তুলনায় সরবরাহ ছিল নিম্নতর পর্যায়ে । খাদ্য সম্ভার ও গোলা-বারুদ নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত চলবে বলে মনে করা হয় কিন্তু তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে চললো । আহসান মূল্যবান সরবরাহের ব্যাপারে মিতব্যযী হলেন । এ ব্যাপারে তিনি কড়াকড়ি আরোপ করেন । একটা চাপাতি চিবিয়ে টিকে থাকা সম্ভব কিন্তু শক্রের আক্রমণের মুখে বুলেট বাঁচানো অসম্ভব ব্যাপার । সৈন্যদের কেউ কেউ এত বেশি শৃঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, পাতার খস খস শব্দে কিংবা ব্যাঙের ডাকে অথবা শৃগালের খক খক কাশির শব্দ শুনেই রাইফেলের ট্রিগার চেপে ধরতো ।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছিল পাঁচজন আহত সৈনিক । তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না । বলবর্ধক খাদ্যও ছিল না । চৌকির একমাত্র নাসিং সহকারি ক্ষতস্থানের ব্যাডেজ খুলে আবার নতুন ব্যাডেজ পরিয়ে দিতো । আর সময় সময় আহতদের মুখে বেদনানাশক ওষুধ ঢেলে দিতো । পথের ব্যাপারটিও ছিল একই রকমের হতাশাব্যঙ্গক । প্রথম দিকে ঘৃঘৃ ও বন্য পায়রা শিকার করে সুপ বানিয়ে দেয়া হতো । কিন্তু গোলাশুলি বিনময় যখন নিয়মিত বিষয়ে পরিগত হয়ে যায় তখন সেগুলোও ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় । তথাপি অহাহ্যের অজ্ঞেয় প্রতীক হয়ে চৌকিটি শক্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাইল ।

মেজর আইয়ুব ছিলেন একজন দীপ্তিমান কোম্পানি কমান্ডার। ২৯ নভেম্বর তিনি একটি পরিপূর্ণ মিশনের দায়িত্ব নিলেন। কিছু নিয়মিত সৈন্য ও রাজাকারদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাদের মাথায় চাপানো হলো গোলা-বারুদের পেটি ও খাদ্যের বস্তা। তারা সড়ক এড়িয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘুরপথে এগিয়ে গেলেন। মেজর আইয়ুব চৌকিতে পৌছে যান কিন্তু তার অনুসুরারী কামালপুরের কিছু দূরে শক্র গুলির মুখে পড়ে। গোলা-বারুদের পেটি ও খাদ্যের বস্তা ফেলে দিয়ে তারা বুকে হেঁটে বক্ষীগঞ্জে ফিরে আসে। আইয়ুবের উপস্থিতি সৈন্যদের মনোবল অতিশয় চাঙ্গা করে তোলে। যদিও তাদের কাছে মাত্র ২০০ রাউণ্ড হালকা মেশিনগানের গুলি ছিল। ১২টি ছিল তিনি ইঞ্জি ও ১২টি ছিল দুই ইঞ্জি মর্টারের গোলা। এ ছাড়া প্রতি রাইফেলের জন্য ছিল মাত্র ৭৫টি বুলেট। মেজর আইয়ুব প্রাথমিক রিপোর্ট প্রদানের জন্য পরদিনই ব্যাটালিয়নে ফিরে আসেন।

আইয়ুবের পৌছানোর পরও কোন খাদ্য সরবরাহ কিংবা পুনঃসমাবেশ চৌকিতে পৌছলো না। নিজেদের যা ছিল তা-ই নিয়ে তারা ও ডিসেম্বর পর্যন্ত টিকে থাকে। এদিকে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বিরুদ্ধাচারণের বিস্তৃত ঘটাতে মনে হল শক্র ক্রেতে উন্নত হয়ে উঠেছে। এবার সে হোঁচট খাওয়া এই প্রতিবন্ধকটিকে আঘাত হানার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করলো না। ৪ ডিসেম্বর ২টি অ্যালিট হেলিকপ্টার কামালপুরের ওপর এসে হাজির হল। পরিষ্কার মধ্যে অবস্থানরত ক্লান্ট পরিশ্রান্ত মুখগুলো শেষ মিনিটটি পর্যন্ত ঢাকা থেকে সাহায্য পাবার উজ্জ্বল আশা নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। মূলত সেগুলো ছিল শক্র মনোভাবাপন্ন চিল; শিকারের ওজন পরীক্ষা করছিল। আর ভূমিতে শক্র সকল দিক দিয়ে এগিয়ে আসছিল বেষ্টনীর পরিসর ছেট করার জন্য।

একই দিনে চৌকিতে পৌছানোর জন্য মেজর আইয়ুব একটি বেপরোয়া প্রচেষ্টা নেন। এই বীরতপূর্ণ প্রচেষ্টায় তিনি আত্মান করলেন। এটা একটি বড় রকমের ক্ষতি ছিল এবং চৌকির জন্য সাহায্য প্রদানের যাবতীয় আশা বিলুপ্ত হল। অপরাহ্নে এক বাঙালি একটি সাদা পতাকা উঁচিয়ে ধরে ভারতীয় কমান্ডারের বার্তা নিয়ে এল ক্যাপ্টেন আহসানের কাছে। অথবা রক্তপাত পরিহারের জন্য তাকে আত্মসমর্পণ করার কথা বলা হলো। কেবলমাত্র বেপরোয়া সংকলনই এই সাহসী জবাবদানে তাকে উজ্জীবিত করে। কিন্তু এর সমর্থনে আহসানের ভাষারে কিছুই ছিল না। পরের রাতেই শক্র হাতে কামালপুর চৌকির পতন ঘটে।

প্রায় একই সময়ে নাকশী ও বারোমারি চৌকির সৈন্যদের প্রত্যাহার করে আনা হল। ব্রহ্মপুরের উত্তরে শেরপুরকে ধিরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান তার নতুন রক্ষাব্যুহ গঠন করেন। নতুন রক্ষাব্যুহ রেখা জানাইগাতি, কুরিয়া, শেরপুর ও জগনচরের মধ্যে দিয়ে গেল। ৩১ বালুচের প্রত্যাহারে প্রতিবেশী ৩০ পাঞ্চাব অবিচল থাকতে পারলো না। তাকেও প্রায় শেরপুর রেখার সমান্তরাল শুরু ফেরিয়াটে প্রত্যাহার করে আনা হল। দু'টোকেই 'শক্তিশালী কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

৫ ডিসেম্বর শেরপুর রক্ষাব্যুহের বামপার্শ্ব ভাগ চাপের মুখে পড়লো। প্রবল চাপটি পড়লো জগনচর অবস্থানের ওপর। সেখানকার অফিসার বার্তা পাঠালো যে, গোলা-বারুদের অভাবে অবস্থানটির বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিয়ে একটি ট্রাক

তৎক্ষণাত বেরিয়ে গেল। শেরপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ট্রেন স্টেশনে ট্রাকটি কেবল পৌছেছে সেই সময় তার সাথে জগনচর রক্ষায় নিয়োজিত পশ্চাদপসরণত সৈন্যদের দেখা হলো। নতুন সমাবেশ নিয়ে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর ফজলে আকবর রেল স্টেশনের আগে নতুন রক্ষাব্যুহ তৈরির জন্য দ্রুত ধাবিত হলেন। তখন সক্ষ্য নেমে গেছে। নুতন পরিখা খনন করতে গিয়ে সৈন্যরা দেখে তাদের কাছে মাটি খননের কোন উপকরণ নেই। অনুরোধে আশেপাশের বাড়ি থেকে দেশপ্রেমিক বাঙালিরা খনন উপযোগী যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এলো এবং পাকিস্তানকে উদ্ধারের জন্য পরিখা খননের সাহায্যে লেগে গেল।

বিগেডিয়ার কাদির ৩১ বালুচের পিছু হটে আসায় খুশি হননি। এমন কী বিনা যুদ্ধে বক্ষীগঞ্জ পরিত্যাগ করে সীমান্ত থেকে এতদূর এসে শেরপুরে রক্ষাব্যুহ রচনা করাকেও তিনি অনুমোদন করেননি। এখন জগনচর থেকে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার তিনি অসম্ভৃত হলেন। অতএব, তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতানকে কুরিয়ার দিক থেকে আক্রমণ করে চর দখলের আদেশ দিলেন। কিন্তু সুলতান এই আদেশ পালনে সক্ষম হলেন না এবং ৬ ডিসেম্বর তিনি জামালপুরে পিছিয়ে এলেন। এ ঘটনা বিগেডিয়ার কাদিরকে আদেশ দিতে বাধ্য করলো ৩৩ পাঞ্জাবকে ময়মনসিংহে পিছু হটে আসতে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই সেষ্টেরে জামালপুর-ময়মনসিংহই ছিল আমাদের সর্বশেষ আত্মরক্ষামূলক ব্যর্থ।

জামালপুর দুর্গে ৭ ডিসেম্বরে শক্তি বিমান বোমাবর্ষণ করলো, কামান দাগলো। কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি করতে পারলো না। একই দিনে শক্তি সৈন্য নদীর উত্তর পার্শ্বে পৌছে গেল। এ ঘটনায় অগ্রবর্তী জলবাধা অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হলাম। নদীর অপর পাড় থেকে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার করা হলো। প্রায় দুপুরের দিকে জামালপুরের বিপরীতে শক্তি কমান্ডারকে তার ‘ও’ ফ্রপের (সিনিয়র অফিসাররা) সঙ্গে দেখা গেল কিন্তু তিনি আমাদের অঙ্গের পান্তির বাইরে ছিলেন। পরে, একই এলাকায় ১০১ কমিউনিকেশন জোনের কমাণ্ডার একটি মাইনের ওপর পা ফেলেন। ফলে তার জায়গায় মেজর জেনারেল নাগরাকে দায়িত্ব দেয়া হল।

এই প্রতিরক্ষা রেখার দুটি শক্তিশালী স্বৰূপ জামালপুর ও ময়মনসিংহকে আমরা তিনি দিন ধরে রাখি। দুর্গ দুটিকে পর্যন্ত করা ছাড়া শক্তি দক্ষিণে ঢাকার দিকে আগ বাড়তে পারবে না। তাকে জামালপুর ও ময়মনসিংহ অবরোধ করতে হলে প্রত্যেকটির জন্য একেকটি বিগেড নিয়োগ করতে হবে। ফলে ঢাকার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তার তেমন অতিরিক্ত সৈন্য থাকবে না। যতক্ষণ এই দুর্গ দুটি শক্তি করে ধরে রাখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাবা যায় যে, উত্তর দিকে থেকে ঢাকা নিরাপদ।

এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিগেডিয়ার ক্রেয়ার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতানের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। প্রতি-উত্তরে সুলতান সেনিকোচিত জবাব দিলেন তার চিঠির মধ্যে একটি বুলেট ভরে দিয়ে। তিনি বলেন, ‘কলম ছেড়ে স্টেন উঠিয়ে নিন এবং যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিন।’ এই দৃঢ় আঙ্গুসূচক জবাব বলে দেয় যে, জামালপুরে দুর্গে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। কিন্তু ঢাকায় গোলমাল দেখা দিল এবং ৯৩ বিগেডকে ‘প্রবেশ নিষেধ রেখা’ পরিত্যাগ করে ঢাকা রক্ষাব্যুহের বাইরে কালিয়াকৈরে

পুনঃনিয়োজিত হতে মেজর জেনারেল জামশেদ আদেশ দিতে বাধ্য হলেন। জেনারেল জামশেদের এই বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে আসবো।

১০ ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার কাদির প্রত্যাহারের আদেশ পেলেন। তিনি এর জন্য তৈরি ছিলেন না। এই আদেশ বাতিলের অনুরোধ জানাবার জন্য তার জিওসি'র সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু পাননি। যে ক'বারই তিনি ঢাকায় টেলিফোন করেছেন সে ক'বারই একজন স্টাফ অফিসার তাকে বলেছেন, 'জেনারেল জামশেদ জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে বৈঠকে আছেন।' অন্যদিকে প্রতি ঘটায় ঢাকা থেকে টেলিফোন করে পরীক্ষা করা হচ্ছে—ব্রিগেড তার প্রত্যাহার শুরু করেছে কি-না।

১০ ডিসেম্বর শেষ রাতে ব্রিগেডিয়ার কাদির প্রত্যাহার আদেশ বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে জানিয়ে দেন। তাদের জামালপুরের দক্ষিণে মধুপুর রোড জংশনে জমায়েত হতে বলা হলো।  
৩৩ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানি সেখানে ঘাঁটি তৈরি করার জন্য আগে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ময়মনসিংহ গ্যারিসনে—যেখানে এক বিরাটসংখ্যক ইপিসিএএফ-এর লোকজন, রাজাকার, রেঞ্জারস, পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরিবারবর্গ এবং দেশপ্রেমিক বাঙালিরা অবস্থান করছিল,—তারা নটায় দুর্গ পরিত্যাগ করলো। প্রত্যেকেই আগে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠার জন্য উদ্ঘাস্ত ছিল। কিন্তু বেসামরিক লোকজন ছরুক দখলকৃত গাড়িগুলোতে বিছানাপত্র, টিনের বাল্ক, দোলনা এমনকি ছাগলও ওঠালো। প্রাইভেট গাড়িগুলোর বাঙালি ড্রাইভাররা নিরাপদ এলাকায় এ সমস্ত মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি এড়ানোর জন্য নানারকম বানোয়াট অজুহাতে দেখাতে শুরু করে। নিরাপদ এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও কী ছিল।

৩৩ পাঞ্জাব শত শত পলায়নপর নারী-পুরুষ সঙ্গে নিয়ে মধুপুর জংশনে এসে পৌছলো। পথে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হল না। কিন্তু ৩১ বালুচের কাহিনী ভিন্নতর। যখন জামালপুর গ্যারিসন পেছনে হটে আসার প্রস্তুতি নিল তখন আবিষ্কার করে যে, শক্র সবদিক দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান যুদ্ধ করে পথ বের করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তার অধীনস্থ কমান্ডোকে দুটি ফ্রপে ভাগ করলেন। প্রথম দলটি গঠিত হল দুটি কোম্পানি নিয়ে। এদেরকে বেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলতে হবে। দ্বিতীয় দলটি পশ্চাত্য প্রহরার সৈন্যসহ হতাহত ও প্রশাসনিক ধানবাহনকে অনুসরণ করবে।

প্রথম দলটির নেতৃত্বে রইলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান নিজে। তিনি ১১ টায় জামালপুর ত্যাগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে এরা শক্রের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং ক্ষতিটা আমাদের দিকেই বেশি হল। কেননা, আমরা খোলা জায়গায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। প্রায় তিরিশ জন সৈন্য মারা যায়। পঁচিশ জন আহত হয়। শক্র হতাহতের সংখ্যা নিরূপণ করা গেল না। কর্নেল সুলতানের বাহিনীর সংশ্কতি বিনষ্ট হয়ে গেল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পশ্চাদপসরণ করলো। দ্বিতীয় দলটিও বেষ্টনী ভাঙতে ব্যর্থ হল। তথাপি কিছু সৈন্য ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল। বাদবাকিরা পরদিন শক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ওদিকে দুর্গে ডাঙ্গাররা অসুস্থ ও আহতদের নিয়ে বন্দি হবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সুতরাং পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মধ্যপুর জংশনে দু'টি ব্যাটালিয়ন পুনঃসংযুক্তি ঘটাতে ব্যর্থ হল। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সৈন্যদের একত্র করে বিগেড় সদর দফতর টিকে থাকার মত একটি বাহিনী সংগঠিত করতে পারলো না। নির্ধারিত জংশনে ৩১ বালুচের অনুর্পস্থিতি দখে বিগেডিয়ার কাদির এবং তার স্টাফেরা টাঙ্গাইলের পথে বওনা হলেন। পিছু হটে আসা সৈন্যদের গ্রহণের জন্য মেজর সারওয়ারের পদাতিক বাহিনী ও মেজর ই.জি. শাহর মর্টার ব্যাটারিকে রেখে আসা হল।

বিগেডিয়ার কাদির ও তার সহচররা ১১ ডিসেম্বর সকালে টাঙ্গাইল পৌছেন।

বিগেডিয়ার কাদির যখন টাঙ্গাইলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেই সময় ইপিসিএএফ-এর লেফটেন্যান্ট কর্নেল আকবর ঢাকার পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বড়জোর দুই কিংবা তিনি কিলোমিটার পথ এগিয়েছেন মাত্র—এ সময় মাইন বিক্ষোরণজনিত একটি ঘটনা তার চোখে পড়ে। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আকবর আমার কাছে সে দৃশ্যটির বর্ণনা দেন এই রকম রাস্তার ঢালে একটি গাড়ি উল্টে পড়ে আছে। আর বজাঞ্জ অবস্থায় ধুলোয় পড়ে আছে আহত ভ্রাইভার। তার হৃদস্পন্দন তখনও টিকটিক করছিল। একটু দূরে বসে আছেন দু'দু'বার তকমা ভূষিত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান। সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। তেজস্বিতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ৩১ বালুচের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক সৈন্য হেঁটে আসছিল। জামালপুরের দুর্ঘটনার পর নিজের কমান্ডিং অফিসারকে এই প্রথম দেখতে পেল সে এবং উজ্জ্বল আশায় দীপ্ত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি চৌকস স্যালুট টুকলো। সুলতান আবেগাপূর্ত কঠে চিংকার করে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি চৌকস স্যালুট টুকলো। সুলতান আবেগাপ্লাত কঠে চিংকার করে ওঠেন, ‘আমার সৈন্যরা কোথায়? আমার ব্যাটালিয়ন কোথায়?’ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সৈন্যটির দেবার মত কোন জবাব ছিল না। সুতরাং সে আর একটি চৌকস স্যালুট টুকে হাঁটা ধরলো। আমি সুলতানকে টাঙ্গাইলে ফেরত আনলাম। সড়ক মাইনে কঠকিত—এই দুর্ঘটনাকে তারই ইঙ্গিত বলে ধরে নেয়া হল। বস্তুত তা ছিল না। কেননা, অনেক বিচ্ছিন্ন সৈন্য এবং ভারতীয়রা এরপরও এই সড়ক দিয়ে চলাচল করেছে। বিগেডিয়ার কাদির নানা সম্ভাব্যতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করলেন। মাইন কী পরিষ্কার করা হবে? তিনি কী টাঙ্গাইলে থেকে যাবেন?

সময় গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলো। বিগেডিয়ার কাদির এবং তার অনুচররা টাঙ্গাইলের সাদা রংয়ের সার্কিট হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন যাতে কোন উজ্জ্বল চিন্তা মন্তিক্ষে প্রবিষ্ট হয়। চিন্তার বদলে এলো শক্র.বিমান। কালিহাতি এলাকায় তাদের লোকজন ও সমর উপকরণ নামাতে শুরু করলো সেগুলো। জায়গাটি টাঙ্গাইলের উত্তরে,— নয় কিলোমিটার দূরে। তারা দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি ফেরান। দেখেন, আরো পরিবহণ বিমান পরিত্যক্ত বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে সাধারণ জায়গায় তাদের ভার নামিয়ে দিচ্ছে। যখন যুক্তান্ত নামানো হচ্ছিল তখন প্যারাসুটের নীচ দিয়ে একটি যন্ত্রের অংশবিশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হলো। একজন অফিসার বিশ্বিত কঠে বলে ওঠেন, ইয়া আল্লাহ! ওটাকে তো ৩.৭ ইঞ্চি কামানের মত দেখাচ্ছে।’

অবস্থার এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে বিগেডিয়ার কাদিরকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। তিনি

বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। স্টেনগান তুলে প্যারাসুট অবতরণ স্থলের দিকে লক্ষ্য করে একটি ম্যাগাজিন খালি করে ফেললেন। এভাবে তিনি তার ক্রোধের প্রকাশ ঘটালেন। তিনি মেজের সারওয়ারকে তার কোম্পানি (বিয়োগকৃত) নিয়ে শক্রকে করায়ত করার আদেশ দিলেন। সারওয়ার আদেশ মান্য করে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ফিরে এলেন আধ ঘন্টার মধ্যেই। বললেন, ‘স্যার স্থানীয়রা বলছে, যে ওরা চীন সৈনিক।’

যদিও পাকিস্তানি সৈন্যদের উদ্ধীর ভাবনার সাথে খবরটি মিলে যাচ্ছে, তথাপি এত ভাল খবর যে বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না। পাকিস্তানি কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগের আগেই তারা কেমন করে নামতে পারে? প্রাথমিক আশাৰ ঝলক মিলিয়ে যেতেই বিগেডিয়ার কাদিৰ বস্তাবতায় ফিরে এলেন। তিনি জানতেন, টাঙ্গাইলে কোন রক্ষা ব্যবস্থা নেই। তিনি আরো জানতেন, তার বিগেড সংযোগ ও পরিচিতি হারিয়ে ফেলেছে। ভাবলেন, ‘আমার মিশন কালিয়াকৈরে পৌছানো—টাঙ্গাইলের রক্ষাব্যুহ তৈরি করা নয়। প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন তিনি। তার সঙ্গে ছিল এক কোম্পানি নিয়মিত ও রেঞ্জারস, ছ’শ,’ ইপিসিএএফ ও পুলিশের লোকজন এবং এক ডজন অফিসার। তারা ৫টা ৪৫ মিনিটে সবাই চিরকালের মত টাঙ্গাইল পরিত্যাগ করলো। পেছনে রেখে এলো সাকিঁট হাউসে একাকী উড়োয়ামান পাকিস্তানি পতাকাকে, টেনে নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকাকে জায়গা করে দেবার জন্য।

ইতিমধ্যে ৯৩ বিগেডের আর একদল সৈন্য, যারা মধুপুর থেকে পশ্চাদপসরণ করে টাঙ্গাইলের দিকে আসছিল, তারা সম্ভবত ভারতীয় প্যারাসুট বাহিনী এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীদের হালকা গোলাগুলির মুখোমুখি হয়েছিল। আক্রমণটি হয় কালিহাতিৰ কাছাকাছি। এই অস্থায়ী প্রতিরোধকে নিশ্চিহ্ন করার পরিবর্তে আমাদের সৈন্যরা সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কিছু পিছু হটে আসে এবং অন্যরা সড়ক ছেড়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

যখন বিগেডিয়ার কাদিৰ এবং তার দলটি পূর্বোক্ত মাইন বিক্ষেপিত স্থানে হাজিৰ হন, কিছু রাইফেলের গুলির শব্দ তারাও শুনতে পেলেন। ফলে সড়ক ছেড়ে ফসল ক্ষেত্ৰের ভেতর দিয়ে একশ’ পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ দূৰেৰ পথ কালিয়াকৈর-এ হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু পথে মুক্তিবাহিনী পক্ষে এই বিৱাটসংখ্যক মনুষ্য দলটিকে খুঁজে পাওয়াৰ সম্ভাৰনা রয়েছে সে কারণে দলটিকে তিন ভাগে বিভক্ত কৰা হল। বিগেডিয়াৰ কাদিৰ নিজেৰ সঙ্গে আটজন অফিসার ও আঠারো জন সৈন্য রাখলেন। লেফটেন্যান্ট কৰ্নেল সুলতান নিলেন কিছু বেশি। যারা দেখলো কারোৱাই সঙ্গে নেই তারা,—নিজেদেৰ মত কৰেই ঢাকাৰ পথ ধৰলো তারা।

কালিয়াকৈর-এ পৌছতে বিগেডিয়াৰ কাদিৰ ও তার আঠাৰ জনেৰ লাগলো তিনদিন ও তিন রাত। সন্তাসীদেৱ তৰফেৰ বিপদ ও বিস্তৃত ভূখণ্ডেৰ বিপদ এড়ানোৰ জন্য তারা কাদামাটিৰ মধ্যদিয়ে হেঁটেছেন। রাতে শীতে কাঁপন ধৰেছে। দিনে না খেয়ে থেকেছেন। তাদেৱ কাছে অৰ্থ ছিল কিন্তু কেউই তাদেৱ কাছে কিছু বিক্ৰি কৰবে না। এই ক্রান্তিকাসেৱ মধ্যে মাত্ৰ একবাৱেৰ জন্য এক খোদাতীকু ব্যক্তি তাৰ মাটিৰ কলস থেকে তাদেৱকে পানি পান কৰাৰ সুযোগ দিয়েছিল। নইলে তাদেৱকে ক্ষেত্ৰ থেকে চুৰি কৰা শাক-সবজি খেয়ে এবং

পুরুরের নোংরা পানি পান করে বেঁচে থাকতে হতো। এ সফরের এক সংকটময় মুহূর্তে জীবনী শক্তি আহরণের জন্য তাদেরকে বন্য লতাপাতা চিবাতে হয় এবং জিহবাকে আর্দ্র রাখার জন্য গাছের পাতায় জমে থাকা শিশির বিন্দু চাটিতে হয়েছিল। তৃতীয় দিনে তারা তখন ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় ডেজা স্যাঁতসেঁতে এক জঙ্গলের মধ্যে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, ‘সে সময় একজন অফিসার একটি পত্রবহুল গাছের ডাল ভেঙ্গে এনে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ‘স্যার ধীরে ধীরে এটা চিবান। তৃষ্ণা নিবারণ করবে। আমি চিবিয়েছি।’

১৪ ডিসেম্বর সকালে তারা আবার কালিয়াকৈর-এর উত্তরে টাঙ্গাইলে সড়কে ওঠেন। যে সময়টায় তারা ক্ষুধা, ত্যুষ এবং স্থানীয় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন সে সময়ের মধ্যে শক্র ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডের একটি বড়সড় অংশ দখল করে ফেলে। এ সড়কের কতদূর পর্যন্ত শক্র গেছে, জানা গেল না। সুতরাং ব্রিগেডিয়ার কাদির এবং অন্যান্যরা সড়ক থেকে দূরে ঝোপঝাড়ে ভরা গাছপালার নীচে অপেক্ষা করার জন্য বসলেন। এবং আমাদের যে সব সৈন্যদের কালিয়াকৈর এলাকায় থাকার কথা ছিল, তাদেরকে খৌজার জন্য একজন মেজর সামনে এগিয়ে গেলেন। সে কাউকে পেল না। বদলে সে শক্রের মাঝ বরাবর হেঁটে গেল এবং তারা তাকে বন্দি করলো। অন্যদের খুঁজে বের করার জন্য শক্র তাকে ব্যবহার করলো। অল্পক্ষণের মধ্যে তারা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এবং ব্রিগেডিয়ার কাদির ও তার সহচরদের দায়িত্বভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। শক্রের জন্য এটা ছিল একটি বড়সড় পাওয়া।

বিশ্বজ্ঞাল ৯৩ ব্রিগেড কালিয়াকৈর-এ থামলো না। সৈন্যরা মূলত নেতৃত্বাত্মক হয়ে পড়ে এবং নতুন প্রতিরক্ষা লাইন সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তারা ভাবলো, নিরাপত্তা ঢাকাতেই আছে। যত তাড়াতাড়ি পৌছানো যায়, নিরাপত্তা তত দ্রুত নিশ্চিত হবে। এদের অনেকে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ১৩ এবং ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় পৌছে। তাদের আসাটা আমি নিজে চোখেই দেখেছি। গোসল করেনি, দাঢ়ি কামায়নি এমনকি পায়ে বুটও নেই। ক্ষুধাত্তুর চেহারা, চোখে নির্দ্বাহিনতা এবং পায়ের গোছা গেছে ফুলে। তাদেরকে প্রাদেশিক রাজধানী রক্ষায় সক্ষম করে তুলতে হলে কমপক্ষে চবিশ ঘন্টা বিশ্রামের প্রয়োজন তাদের।

মনে হল, ঢাকার মানসিক দার্জ্য আর সীমান্তের কায়িক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একে অপরের ওপর দোলায়মান। একের ওঠা-নামায অন্যটির ভাগ্য প্রভাবিত করছে। যদি কোন একটি উপাদান তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবে ফেলতে পারতো তবে স্টো ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টের যুদ্ধের অগ্রগতি। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে লাহোর ফ্রন্টের ভূয়া সাফল্যের সংবাদে যে জেনারেল নিয়াজি আক্ষরিক অর্থেই একজন কুষ্টিগীরের মত মাংসেশী সঞ্চালন শুরু করেন, ৭ ডিসেম্বরের মধ্যেই ধীরে তার মোহন্তি ঘটে। একই সময়ে ভারতীয়রা নবম ডিত্তশন এলাকাধীন যশোর ও ঝিনাইদহ দখল করে নেয়; মোড়শ ডিত্তশনের মুখ্য যোগাযোগ রেখার ওপর জিওসিকে অ্যামবুশ করে। এবং কুমিল্লা ও ফেনীর মধ্যবর্তী ৩৯ এডহক ডিত্তশনের নরম তলপেট বরাবর চাকু বসিয়ে দেয়।

একই দিন সন্ধ্যায় জেনারেল নিয়াজিকে গভর্নর হাউসে ডেকে পাঠানো হয় ডাক্তার এম এ মালিককে যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি জ্ঞাত করার জন্য। কেননা, তিনি পরম্পরাগত-বিবোধী সংবাদ পাচ্ছিলেন। একদিকে জেনারেল নিয়াজিকে চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী রিপোর্ট দিচ্ছেন যে, সকল সীমান্তে বীরত্বব্যঙ্গক প্রতিরোধ চলছে। অন্যদিকে বিভাগীয় ও জেলা সদর দফতরের আতঙ্কহস্ত বেসামরিক কর্মকর্তাদের টেলিফোন গভর্নরকে জানাচ্ছে যে, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সাথে সাথে বেসামরিক জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসংবিত্ত হচ্ছে। গভর্নর ভাবলেন, সত্য আবিক্ষারের জন্য সর্বোত্তম পথ হল জেনারেল নিয়াজির সাথে আলাপ করা।

৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গভর্নর মালিকের সঙ্গে জেনারেল নিয়াজির বৈঠকটি ছিল তার জন্য একটি অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। সরকারিভাবে এবং প্রকাশ্যে জেনারেল নিয়াজি এমন ভাবতঙ্গি ধরে রাখতেন যার পেছনে কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। সর্বাত্মক যুদ্ধের চতুর্থ দিনেই তিনি কী তার বিপর্যয়ের খবর একজন বেসামরিক গভর্নরের কাছে স্বীকার করবেন? অথবা তিনি কী প্রতিরোধের তুচ্ছতা এবং বীরত্বব্যঙ্গক সহিষ্ণুতার একটা বাহ্যিক চেহারা দেখবেন? যদি তিনি দ্বিতীয় ধারাটি বেছে নেন তাহলে কতদিন পর্যন্ত তিনি গভর্নর, সরকার এবং জনগণকে বোকা বানাতে পারবেন?

গভর্নর মালিক, জেনারেল নিয়াজি এবং দু'জন সিনিয়র অফিসার গভর্নমেন্ট হাউসের একটি বিলাসবহুল কক্ষে বসেছিলেন। তারা কথা বেশি বলছিলেন না। কয়েক মিনিট অন্তর অস্তর নীরবতা আলাপচারিতাকে গ্রাস করছিল। গভর্নরই বললেন বেশি এবং বললেন সাধারণ ধারাতেই। তার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল কোন বিষয়ই কখনো একই রকম থাকে না। ভাল পরিস্থিতি মন্দের জন্য পথ করে দেয় এবং উল্টোটাও হয়। একইভাবে একজন জেনারেলের জীবনে উঠানামা আছে। যশ এক সময় তাকে আচ্ছাদিত করে, আরেক সময় পরাজয় তার মর্যাদাকে ধূলিসাং করে। যে মুহূর্তে ডাক্তার মালিক তার বক্তব্যের শেষাংশ উচ্চরণ করেন

মেই মুহূর্তে জেনারেল নিয়াজির স্থূলকায় শরীর কেঁপে ওঠে। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন এবং শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। গভর্নর তার স্নেহসিক্ত প্রোট হস্ত জেনারেল নিয়াজির দেহে প্রসারিত করলেন এবং সান্ত্বনা দেয়ার কঠে বলেন, ‘আমি জানি জেনারেল সাহেব, একজন কমান্ডারের জীবনে কঠিন দিন আসে কিন্তু মনোবল হারাবেন না। আগ্নাহ মহান।’

যখন জেনারেল নিয়াজি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন সে সময় একজন বাঙালি ওয়েটার কফি আর শুকনো খাবারের ট্রে নিয়ে ওই কক্ষে প্রবেশ করে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে বের করে দেয়া হয়। অনেকটা এই রকম—সে কক্ষ অপবিত্র করে দিয়েছে। বাইরে এসে তার বাঙালি সহকর্মীদের সামনে ঘোষণা করলো, ‘সাহেবো, ভেতরে কান্নাকাটি করছে।’ তার এই মন্তব্যটি গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি শুনে ফেলে। সে তাদেরকে মুখে কুলুপ আঁটতে আদেশ করে।

এভাবেই গভর্নর মালিক পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের সবচেয়ে সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য অপারেশনাল ব্রিফিং লাভ করলেন। কান্নাকাটি থামার পর তিনি জেনারেল নিয়াজিকে বললেন, ‘যখন অবস্থা খারাপই, আমি ভাবছি, অন্ত সংবরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রেসিডেন্টকে খবর পাঠানো উচিত।’ জেনারেল নিয়াজি কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ থাকেন। তারপর মাথা নীচু করে শ্বীণ কঠে বলেন, ‘আমি মানবো।’ সেইমতে গভর্নর ইয়াহিয়া খানকে একটি বার্তা পাঠালেন। যা হোক, এ প্রস্তাবের ওপর কোন ব্যবস্থা গৃহীত হলো না।

জেনারেল নিয়াজি নিজের সদর দফতরে ফিরে এলেন এবং নিজেকে নিজের কক্ষে আবদ্ধ করে রাখলেন। মূলত পরবর্তী তিনটি রাত তিনি নিক্রিয় থাকেন। এ সময়ে ৮/৯ ডিসেম্বর রাতে আমি তার কক্ষে প্রবেশ করি। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি গভর্নমেন্ট হাউসের বৈঠকের কথা জানতে পারিনি। আমি দেখলাম, দু'হাতের কনুই বিস্তৃত করে তার ওপর মাথা ঠেকিয়ে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। প্রবেশকারীর দিকে তার মুখ পুরোপুরি ঢাকা ছিল। আমি বলতে পারবো না তিনি কাঁদছিলেন কি-না। সংক্ষিপ্ত আলাপের সময় তার একটি মাত্র মন্তব্য আমার স্মরণে আছে। তিনি বলেন, ‘সালিক, তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে, তুমি আজকে একজন জেনারেল নও।’ এ কথাতেই তার যন্ত্রণা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমি তার ঘর ছেড়ে চলে এলাম বটে; কিন্তু সারা রাত ধরে আমার কানে তার কথাটি বাজতে থাকলো। তার জন্য আমার করণ্ণ হলো।

তিনটি দিন—৭, ৮ এবং ৯ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজির জন্য বড় ভারি হয়ে চাপে। এ সময়ের মধ্যে সকল ডিভিশন তাদের সংশ্কৃতি হারিয়ে ফেলে। এদের মধ্যে অনেকেকই তথাকথিতি ‘প্রবেশ নিষেধ রেখা’ থেকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে যে ক্ষতিসাধিত হলো তা পূর্ণে পচিম পাকিস্তান ফ্রন্টে কোন সাফল্য লাভ করা গেল না। এটা অবস্থার আরো অবনতি ঘটালো। জেনারেলের ফৃত্তি ফৃত্তি ভাব নিঃশেষিত হয়ে গেল। যে কৌতুক প্রবণতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন, সেই কৌতুক করা থেকে তিনি বিরত হয়ে গেলেন। তিনি খুব কম লোকের সঙ্গেই দেখা করতেন। তাকে উত্তেজিত দেখাতো—মনে হত, গুটিয়ে নিয়েছেন। তার চোখে নিদ্রাহীনতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দায়িত্বের চাপ

স্পষ্টতই ভাবি হয়ে চেপে বসে তার ওপর।

ইতিমধ্যে—বিশেষ করে অল ইন্ডিয়া রেডিওসহ অন্যান্য বিদেশী বেতার কেন্দ্রগুলো আমাদের বিপরীতে অতিরিজ্জিত খবর প্রচার করতে শুরু করে। রেডিও পাকিস্তান তাদেরকে টেক্কা দেবার জন্য আমাদের সাফল্য সম্পর্কে একই ধরনের অতিরিজ্জিত খবর প্রচার করে যেতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শ্রোতারা, বিশেষ করে বাঙালি শ্রোতারা, অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করতো রেডিও পাকিস্তানের চেয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং অন্যান্য বেতার কেন্দ্রের ওপর।

একই সময়ে বৃটিশ ব্রিডকাস্টিং করপোরেশন ঘোষণা করে যে, জেনারেল নিয়াজি তার সৈন্যদের বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ফেলে আকাশ পথে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছেন। এটা সাধারণের কাছে তার ভাবমূর্তিকে সরাসরি আঘাত হানে এবং বিষয়টি নিয়াজিকে তীব্রভাবে ধাক্কা দেয়। ১০ ডিসেম্বর তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হোটেল ইন্টারকন পরিদর্শনে গেলেন। লাউঞ্জে প্রথম যে ব্যক্তিটিকে পেলেন তাকে বলেন, ‘বিবিসি’র লোকটি কোথায়? আমি তাকে বলতে চাই যে, সর্বশক্তিমান আঞ্চাহার কৃপায় এখনও আমি পূর্ব পাকিস্তানে আছি। আমার সৈন্যদের আমি কখনও পরিত্যাগ করি না।’ এই ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি সদর দফতরে ফিরে এলেন।

দাকায় জেনারেল নিয়াজির উপস্থিতি বিদেশীদের মনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তার সক্ষমতা সম্পর্কে আংশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হল। ডুর্বল জাহাজ থেকে লাফ মেরে বাইরে আসার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জাতিসংঘ তাদের জন্য ৮ ডিসেম্বর একটি আকাশ পরিবহণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু রানওয়েতে তখনও গর্ত ছিল এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী দিনে কমপক্ষে তিনবার বোমাবর্ষণ করে চলছিল। ভারতীয় ও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যবস্থা সাপেক্ষে তারা কয়েকদিন পর পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতে সক্ষম হয়।

অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি শুধুমাত্র পলায়নরত বিদেশী কিংবা অবরুদ্ধ বেসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারের মনের মধ্যে এই অনুভূতির প্রবেশ ঘটে। এসব অফিসারের মধ্যে দু'জন কাঁধে প্রচুর পরিমাণ তকমা ঝুলিয়ে আমার কাছে এলেন এবং বলেন, ‘জেনারেল নিয়াজির কাছে যাতায়াত আছে তোমার। কেন তাকে বলছো না বাস্তববাদী হতে? নইলে কুকুরের মত মৃত্যু ঘটবে আমাদের।’ আমি পরামর্শটি এড়িয়ে গিয়ে বললাম যে, যুদ্ধের মত একটি সংবেদনশীল ব্যাপারে একজন কোর কমান্ডারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা আমার মত একজন প্রেস অফিসারের জন্য একটি অতিশয় অতিরিক্ত বিষয়। আমি জেনারেল নিয়াজিকে বলতে পারি না।

৮/৯ ডিসেম্বর রাতে জেনারেল নিয়াজির কৌশলগত সদর দফতরের কাছে মেজের জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে আমার দেখা হয়। আমি এ সমস্ত অফিসারের মনোভাব তাকে জানালাম। তিনি বললেন, ‘ঠিকই, গভর্নরও উদ্বিগ্ন। কিন্তু ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়কের নিজস্ব চিত্তাধারা আছে। যা হোক, এ বিষয়ে আমরা কিছু করবো।’

পরদিন গভর্নর প্রেসিডেন্টের কাছে একটি বার্তা পাঠালেন। বার্তায় অন্যান্য বিষয়ের

সাথে তিনি বলেন ‘আরেকবার’ (আমি) অন্ত সংবরণ ও রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি জরুরিভাবে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।’ ইয়াহিয়া খান আবার একে উপেক্ষা করলেন। কেননা, তার নিজস্ব লোক জেনারেল নিয়াজি রয়েছেন ঘটনাস্থলের সঠিক সামরিক রিপোর্ট প্রদানের জন্য। যতক্ষণ তিনি আস্থাবান রয়েছেন ততক্ষণ রাজনৈতিক ত্রাচ খোজার দরকার নেই। একমাত্র ৯ ডিসেম্বর সকাল ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দফতর প্রথমবারের মত স্থীকার করলো যে, পরিস্থিতি ‘দারুণ সংকটপূর্ণ।’ এ বিষয়ে একটি সংকেত বাণী পাঠানো হল

এক আকাশে শক্রের প্রভৃতের কারণে পুনঃসংবন্ধকরণ এবং পুনঃবিন্যাসকরণ সম্ভব নয়। জনসাধারণ আরো বেশি শক্রভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। শক্রকে সব রকমের সাহায্য করছে। বিদ্রোহীদের তীব্র অতর্কিত হামলার কারণে রাতে সৈন্য পরিচালনা সম্ভব নয়। বিদ্রোহীরা শক্রকে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে এবং পশ্চাতে পথ দেখিয়ে পরিচালনা করছে। বিমান ঘাঁটি ব্যাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত তিন দিনে কোন মিশন পরিচালিত হয়নি, তবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। এমনকি বিমান ঘাঁটি উদ্ধার করাও সাংঘাতিক রকমের সমস্যাজনক। দুই : শক্রের বিমান হামলায় ভারি অস্ত্রপাতি এবং উপকরণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত ২০ দিন যাবৎ তারা স্থুত্যায়নি। বিমান ও ট্যাংকের গোলার মুখে রয়েছে সর্বক্ষণ। তিনি পরিস্থিতি মারাত্মক রকমের সংকটপূর্ণ। আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব এবং সর্বোত্তম পর্যায়ে চালিয়ে যাব। চার এই মঞ্চের সকল শক্র বিমান ঘাঁটিগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে বিমান আক্রমণের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ঢাকা রক্ষার জন্য যদি সম্ভব হয় বিমানবাহী সৈনিকের পুনঃসমাবেশ ঘটানো হোক।

জেনারেল নিয়াজির টেলিগ্রামটি গভর্নর মালিকের আশংকাকেই নিশ্চিত করলো। সুতরাং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতির নিকাশ নিলেন। এবং তার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রাদেশিক গভর্নরের হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন। একই রাতে গভর্নর ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়কের কাছে প্রেরিত প্রেসিডেন্টের টেলিগ্রামটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ

‘প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গভর্নরের প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রতি পুনরুক্ত। আপনার দ্রুত প্রেরিত বার্তাটি পেয়েছি এবং পুরোপুরি উপলব্ধি করা গেছে। আমার কাছে প্রেরিত আপনার প্রস্তাব মতে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি আপনাকে দেয়া গেল। আন্তর্জাতিকভাবে যাবতীয় ব্যবস্থা আমি নিয়েছি এবং এখনও নিছি। কিন্তু আমাদের একে অপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারটি আমি আপনার সুবৃদ্ধি ও বিচারশক্তির ওপর পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি যে সিদ্ধান্তই নেবেন তা আমি অনুমোদন করবো এবং আমি জেনারেল নিয়াজিকে নির্দেশ দিচ্ছি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য এবং সবকিছু সেমতে ব্যবস্থা করতে।’

এ সংকেত বার্তাটিকে অনুসরণ করে আরেকটি সংকেত বার্তা আসে জেনারেল নিয়াজির কাছে। প্রেরণ করেন সেনাবাহিনীর টিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান। বার্তাটিতে প্রেসিডেন্টের টেলিগ্রামের মুখ্য বিষয়গুলোর পুনরুক্তি করা হয় এবং জেনারেল

নিয়াজিকে বলা হলো গভর্নরকে অপারেশনাল পরিস্থিতি সম্পর্কে খোলাখুলি নিকাশ দিতে—যাতে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। হামিদ তাকে আরো উপদেশ দেন যে, তিনি যেন 'সর্বোচ্চ পর্যায়ে যুদ্ধোপকরণ ধ্বংস করে ফেলেন, যাতে সেগুলো শক্র হাতে না পড়ে। জেনারেল হামিদের টেলিগ্রামটি ১০ ডিসেম্বরের প্রত্যুষে পৌছে। বার্তায় নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু জানিয়ে দেয়া হয়

কমান্ডারের জন্য—সেনাবাহিনী সিওএস থেকে। গভর্নরের কাছে প্রেসিডেন্টের সংকেত বার্তার অনুলিপি আপনার কাছে উল্লেখ করা হলো। আপনার একান্ত পরামর্শ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি প্রেসিডেন্ট গভর্নরের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেহেতু কোন সংকেতেই পরিস্থিতির গভীরতা সম্পর্কে কোন জানানই দিতে পারে না; আমি ঘটনাস্থলে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি আপনার ওপরই ছেড়ে দিতে পারি। যা হোক, এটা স্পষ্ট যে, শক্রের জন্য এখন সময়ের ব্যাপার—কখন সে তার সংখ্যা ও উপকরণের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এবং বিদ্রোহীদের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করবে। ইতিমধ্যে বেসামরিক জনগণ প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং সেনাবাহিনীকে বড় রকমের হতাহতের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। আপনাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অর্থ নিরূপণ করতে হবে—যদি আপনি যুদ্ধ করতে পারেন। এর ওপর ভিত্তি করে আপনি আপনার খোলাখুলি পরামর্শ দেবেন গভর্নরকে—যিনি তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন, যাঁর ওপর এ ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন প্রেসিডেন্ট। যখনই আপনি প্রয়োজন মনে করবেন, তখনই সর্বোচ্চ পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ ধ্বংস করবেন, যাতে ওগুলো শক্র হাতে না পড়ে। আমাকে অবহিত রাখবেন। খোদা আপনার ভাল করুন।'

এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত গভর্নর এ এম মালিকের কাছে অর্পণ করা হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য তিনি কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন? তার কাছে খুব বেশি বিকল্প ছিল না। যদি জেনারেল নিয়াজি যুদ্ধ করতে সক্ষম হতেন তাহলে উপরোক্ত টেলিগ্রাম বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়তো না। যদি নিয়াজির তেজস্বিতা মিহিয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার নৈতিক মনোবলকে চাঙ্গা করার ব্যাপারে গভর্নরের খুব অল্পই করণীয় ছিল। অতএব, রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ডাঙ্কার এ এম মালিক যুদ্ধবিরতি অর্জনের কথা ভাবলেন; যে যুদ্ধবিরতিতে থাকবে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতীয় ও পাকিস্তানি বাহিনীর প্রত্যাহার। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মধ্যস্থ হিসেবে বেছে নেয়া হয় ওই সময় ঢাকায় অবস্থানরত জাতিসংঘের সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মি. পল মার্ক হেনরীকে।

যখন গভর্নর মি. হেনরীর হাতে যুদ্ধবিরতির নোটটি তুলে দেন, সে সময় গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ফরমান আলী, চিফ সেক্রেটারি মি. মুজাফফর হোসেন তার সঙ্গে ছিলেন। ডাঙ্কার মালিকের পক্ষে একটি সংকেত বার্তার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে এ সম্পর্কে জানানো হলো। সংকেত বার্তাটি প্রেরিত হয় ১০ ডিসেম্বর

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য। যেহেতু সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আমরা ওপর অর্পিত হয়েছে তাই আমি নিম্নলিখিত লিপিটি আপনার অনুমোদন সাপেক্ষে

সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মি. পল হেনরীর হাতে তুলে দিচ্ছি। লিপির শুরু পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা কখনোই পাকিস্তান বাহিনীর ছিল না। যা হোক এমন একটি পরিস্থিতির উভ্র হয়েছে যা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক কার্যক্রম নিতে বাধ্য করেছে। সর্বদাই পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং এর জন্য আলোচনা ও চলছে। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখে সশস্ত্র বাহিনী বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখনও লড়ে যেতে পারে। কিন্তু আরো রক্তপাত ও নিরপোরাধ মানুষের জীবনহানি এড়ানোর জন্য আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলি রাখছি। যেহেতু রাজনৈতিক কারণেই সংঘর্ষের সৃষ্টি, এর সমাপ্তিও হতে হবে রাজনৈতিক সমাধানের মধ্যদিয়ে। অতএব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে আমি পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঢাকায় সরকার গঠনের ব্যবস্থা করতে। এ প্রস্তাব রাখার সাথে সাথে কর্তব্যের তাগিদেই আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে হচ্ছে। ভারতীয় বাহিনীর কবল থেকে তাদের ভূখণ্ডের আশু মৃত্যুরণও তাদের আকাঙ্ক্ষিত দাবি। অতএব, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করার জন্য আমি জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি,—এক অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি; দুই সম্মানের সাথে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তান প্রত্যাগমন; তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত যেতে ইচ্ছুক সকল পশ্চিম পাকিস্তানি লোকজনের প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা; চার ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসতি স্থাপনকারী সকল ব্যক্তির নিরাপত্তা; পাঁচ পূর্ব পাকিস্তানের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ না করা হয়; সে বিষয়ে নিশ্চয়তা। এ প্রস্তাব রাখার সাথে সাথে আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে এটি একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব। সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাবে না এবং প্রশ্নও ওঠে না। যদি এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করা না হয় তাহলে সশস্ত্র বাহিনীর শেষ ব্যক্তিটি যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। লিপি শেষ হচ্ছে। জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। তিনি নিজেকে আপনার অধিনায়কত্বে সমর্পণ করছেন।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব জাতিসংঘের কাছে যেতেই তা আর বিশ্বের কাছে গোপন রাখা গেল না। কয়েকটি প্রধান বিদেশী বেতার কেন্দ্র এর বিষয়বস্তু প্রকাশ করে দিল। এটা সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘে পাকিস্তানের মামলা দুর্বল করে দিল। সেখানে ডেপুটি প্রধান প্রধানমন্ত্রী (মনোনীত) মি. জেড এ ভুট্টো আমাদের পক্ষে অনুকূল সিদ্ধান্ত লাভের চেষ্টা করছিলেন। এর ফলস্বরূপ ১৩ ডিসেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একজন সরকারি মুখ্যপাত্র এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের কথা সরাসরি অবীকার করেন। তিনি বলেন, ‘আমি যে কাউকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তেমন দলিল বা বিবৃতি হাজির করার জন্য—যাতে এমন কী আত্মসমর্পণের ধারণাও পর্যন্ত দেয়া হয়েছে।’ ঢাকাকেও জানানো হয়, ‘তোমাদের প্রস্তাবে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে’ এবং ‘আশা করা গিয়েছিল যে, সংযুক্ত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই তোমরা সিদ্ধান্ত নেবে।’

১. দি পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিণ্ডি, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সাধারণভাবে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে এ প্রস্তাবের প্রগতা বলে মনে করা হয়। তিনি পরে আমাকে বলেন, ‘একটি যুদ্ধবিরতি অর্জন ছাড়া এ পদক্ষেপের আর কোন লক্ষ্য ছিল না।’ তিনি বলেন, ‘এতে আমাদের কমান্ডাররা তাদের বাহিনীর পুনর্গঠন ও ভারসাম্য বিধানের সুযোগ পেত। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সরকার বলতে আমরা সেই সব পাকিস্তানপন্থী বাঙালি এমএনএ ও এমপিএদের কথা বোঝাতে চেয়েছিলাম,—যারা ১৯৭০ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন অথবা পরবর্তী উপনির্বাচনে নির্বাচিত হন। তাদেরকেই ক্ষমতায় বসানো হবে। যদি ভারত এটাকে বিশ্বাসাত্মকতা বলে ধরে নিয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করতো; আমরা নবশক্তিতে বলিয়ান হয়ে তার মুখোমুখি হতাম।’

অন্তর্নিহিত মর্ম উপলক্ষি ছাড়াই রাওয়ালপিণ্ডিতে সরকারি মুখ্যপাত্রের খণ্ডনে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি ঠাণ্ডা ঘরে ছলে গেল। সম্ভবত ইয়াহিয়া খান বিশ্বসভায় মি. ভুট্টোকে তার কূটনৈতিক দক্ষতা দেখাতে আরো কিছু সময় দিতে চাইছিলেন।

নিয়াজির নৈতিক মনোবলকে চাঙ্গা করতে এবং যুদ্ধবিরতি থেকে তার দৃষ্টি ফেরানোর জন্য রাওয়ালপিণ্ডি এক অভিনব পথ আবিক্ষার করে। তাকে বলা হয়, নৈতিক ও বস্তুগত সহায়তা’ পাওয়া গেছে বাইরে থেকে, বিশেষ করে ‘উত্তর থেকে পীতরা এবং দক্ষিণ থেকে শ্বেত’রা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে। ঢাকা একে ভারতের পক্ষে সোভিয়েত সমর্থন প্রশংসনে চৈনিক ও আমেরিকার সাহায্যের পরিষ্কার ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করলো। এই ‘সুখবর’টি সেই সব সৈন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার অনুমতি দান করা হয়— যারা তখন বিভিন্ন সেক্টরে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল। সৈন্যদের নড়বড়ে মনোবলকে চাঙ্গা করার লক্ষ্য ছিল এই খবর পাচারের মধ্যদিয়ে। টাঙ্গাইলে ভারতীয় প্যারাট্রুপারদের নামতে দেখে একই রকমের বিভিন্নের মধ্যে পড়ে আশ্঵ারিত হয়ে উঠে পশ্চাদপসরণরত ৯৩ (ব্রিগেডিয়ার কান্দিরের অধীনে) ব্রিগেড। প্রায় একই সময়ে ঢাকার কৌশলগত সদর দফতরে একজন ব্যাটম্যানকে তার দুই ব্যান্ডের রেডিও ট্রানজিস্টরটি শিরিশ দিয়ে জোড়া লাগাতে দেখলাম। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উঠে দাঁড়ালো সে এবং তার ভাঁজ করা টুপিটি ঠিকঠাক করে স্যালুট টুকলো। ‘কোন খবর আছে কী?’ আমি এমনি জিজ্ঞেস করলাম। ‘চীনা বা আমেরিকার সাহায্যের কোন খবর নেই’ সে ঠাণ্ডা কঠে জবাব দিল।

রাওয়ালপিণ্ডি প্রতারণার কিছু অস্থায়ী ফলোৎপাদন করে। সৈন্যরা আকাশের দিকে তাকাতে শুরু করলো (চৈনিকদের জন্য); সাগরের দিকে চোখ রাখলো (আমেরিকানদের জন্য) এবং বন্ধুদের পৌছানো পর্যন্ত সময় ক্ষেপণ করতে লাগলো। কিন্তু কেউই এলো না।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর আধৈর্য হয়ে রাওয়ালপিণ্ডির গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলোতে টেলিফোন করতে থাকে বন্ধুদের হস্তক্ষেপের সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য। সবাই বললো ‘দ্রুত’ সেটা ঘটতে যাচ্ছে। অবস্থার প্রকৃত কোন উন্নতি ছাড়াই সংকটপূর্ণ আটচল্লিশ ঘটা পেরিয়ে গেল। তথাপি রাওয়ালপিণ্ডিতে আরেকবার ফোন করা হলো। সদর দফতর আবারও ‘দ্রুত’ বলে জবাব দেয়ার দায় সারলো। একজন ক্ষুদ্র স্টাফ অফিসার অলক্ষ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে বললেন, ‘জিজ্ঞেস কর তাদের দ্রুতটা কেমন দ্রুত?’ ঢাকায় চীনা ও আমেরিকান কূটনৈতিক প্রধানদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে যোগাযোগ করা হলো। তারা তাদের

নিজস্ব সরকার গৃহীত এ ধরনের কোন তথ্য সম্পর্কে অঙ্গতা প্রকাশ করলো। জেনারেল নিয়াজি এ গুজব সম্পর্কে জেনারেল ইয়াহিয়া কিংবা জেনারেল হামিদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে বিত্ত্ব ছিলেন। অবশেষে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড রাওয়ালপিণ্ডিকে জিজেস করলো, ‘আমাদেরকে পরিষ্কার করে জানাও কত সময় ধরে ‘বঙ্গ’দের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। জবাব ছিল ‘আরো ৩৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।’ এখন ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন সীমারেখা টানা হলো।

ইতিমধ্যে অপারেশনাল পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলো। নবম ডিভিশনের ৫৭ ব্রিগেড ইতিমধ্যে হার্ডিং ব্রিজ অতিক্রম করে গেছে। ষ্টোশ ডিভিশনকে চূড়ান্তভাবে দু’ভাগে কেটে ফেলা হয়েছে। চতুর্দশ ডিভিশন ভৈরববাজার ও সিলেটে আটকা পড়ে গেছে। ৩৯ এডহক ডিভিশনের সদর দফতর বিলুপ্ত হবার মুখে। ঢাকা অভিযুক্তে প্রত্যাহারকালে নিঃসঙ্গ ৩৬ এডহক ডিভিশন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সমস্ত ডিভিশনাল সেক্টরগুলো সাব-সেক্টরে খণ্ডিত হয়ে গেছে, যা ঢাকা দখলের জন্য নতুন শক্ত সৈন্য প্রবেশের পক্ষে প্রচুর ফাঁক সৃষ্টি করেছে।

যাহোক উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে শক্ত তখনও ‘ঢাকা বৌল’-এর বাইরে ছিল: তার হেলিকপ্টারবাহী একটি কোম্পানি তখন নরসিংডীতে এবং একটি প্যারা ব্যাটালিয়ন টাঙ্গাইল এলাকায় ছিল। এ দু’টি বিচ্ছিন্ন বাহিনী প্রাদেশিক রাজধানীর জন্য তেমন কোন মারাত্মক হৃষকি সৃষ্টি করতে পারবে না—যতক্ষণ না মেঘনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ (যমুনা) কিংবা গঙ্গা অতিক্রম করে পদাতিক দল তাদের সাথে মিলিত হচ্ছে। ভারতকে তার অভ্যন্তর ভাগ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য আনতে হবে, নদীগুলির ওপর সেতু তৈরি করতে হবে অথবা বিপুল সংখ্যক জলযান যোগাড় করতে হবে ট্যাংক, গোলন্দাজ বহর এবং ভারি সরঞ্জাম ঢাকার দিকে বয়ে আনার জন্য। এ জলবাধাকে আয়তে আনা ছাড়াও তাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গকে পর্যুদ্ধ করতে হবে,—যেগুলো এখনো আমাদের দখলে। সবচেয়ে রক্ষণশীল হিসেবে মতে, শেষ পোঁচ দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সমাবেশ করতে ভারতের কমপক্ষে এক সঙ্গাহ সময় লাগবে।

ঢাকার চারদিকে শক্ত সৈন্য কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণেই যে পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড তার স্থায়ীক শক্তি হারিয়ে ফেললো, তা নয়। তেতরে কম্পন ধরে যখন উপলক্ষি করলো যে, ‘হত্যা’ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাকায় কোন নিয়মিত সৈন্য নেই। বিভিন্ন স্থাপনার সাথে এক রকম অনুনয়-বিনয় করতে দেখেছি ব্রিগেডিয়ার বকরকে, যাতে ঢাকা রক্ষার জন্য একটি ব্রিগেড নির্দেশনপক্ষে একটি ব্যাটালিয়নও পাওয়া যায়। তিনি ব্রিগেডিয়ার আতিফকে কুমিল্লা দুর্গ পরিত্যাগ করে ঢাকার পুব দিকে সমাবেশ ঘটাতে বলেন। কিন্তু স্যাত্তে প্রস্তুত রক্ষাব্যুহের নিরাপদ আশ্রয় পরিত্যাগ করে পিছু হটে আসাকে আতিফ অবিজ্ঞেচিত বলে মনে করেন। মেজর জেনারেল কাজীকে ভৈরববাজার থেকে প্রত্যাহার করতে বলা হয়, কিন্তু ‘পর্যাপ্ত জল পরিবহণের অভাবে’ তিনি পারলেন না। মেজর জেনারেল নজর হসের শাহকে ৫৭ ব্রিগেড (মূলত নবম ডিভিশন থেকে নেয়া) পাঠাতে বলা হয়। তিনি তা করলেন না। মাত্র একটি ব্যাটালিয়ন পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা যমুনা পার হতে পারলো না।

এ অসহায় অবস্থার প্রেক্ষাপটে মেজর জেনারেল জামশেদ জামালপুর-ময়মনসিংহ অক্ষ

থেকে ৯৩ ব্রিগেডকে তুলে এনে ঢাকার উত্তর বহিসীমায় নিয়োগের আদেশ দিলেন। তিনি ব্রিগেডিয়ার কাদিরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলেন,— পাছে তিনি (ব্রিগেডিয়ার কাদির) আদেশ অমান্য করার জন্য কোন অজুহাত খুঁজে বের করেন, এই আশংকায়। ব্রিগেডিয়ার কাদির কমান্ডারদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার উর্কর্তনের ইচ্ছানুযায়ী সাড়া দেন; কিন্তু তার বাহিনী ছিল-বিছিল হয়ে যায়।

যদিও ভূমিতে পরিষ্কৃতির দ্রুত অবনতি ঘটেছিলো তথাপি বিদেশী সাহায্যের অঙ্গীকারে আস্থাবান হয়ে জেলারেল নিয়াজি বলিষ্ঠ ভাবভঙ্গি বজায় রাখছিলেন। স্থানীয় সম্প্রদাই সামরিক হাসপাতাল ও ঢাকা বিমান বন্দরের বিমান বিধ্বংসী রক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য ১১ ডিসেম্বর তিনি তার সদর দফতর থেকে বেরিয়ে আসেন। আমি তার সঙ্গে ছিলাম। হাসপাতালে তার সামনে এক ডজন পঞ্চম পাকিস্তানি নার্সের একটি দলকে হার্জিং করা হয়। 'বর্বর মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে তাদের নিরাপত্তার জন্য তারা অনুনয় জানায়। তিনি তাদের উদ্বিঘ্ন হতে মানা করেন। কেননা, বড় রকমের সাহায্য আসছে। যদি সাহায্য না আসে সেক্ষেত্রে তিনি বললেন, 'মুক্তিদের হাতে পড়ার আগে আমরাই তোমাদের হত্যা করবো।'

সেখান থেকে গাড়িতে চেপে তিনি বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে গেলেন এবং কয়েকটি কামানের অবস্থান দেখলেন। সেখানকার বালকদের প্রফুল্লকরণের জন্য কিছু বাক্য উচ্চারণ করলেন। বললেন, 'তোমাদের অবস্থানের সামনের নিশ্চল ভূমি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। ব্যক্তিগত অস্ত্র প্রস্তুত রাখবে।' ক্যাটনমেন্টের দিকে ফিরতেই বিমান বন্দরের বাইরে বিদেশী লোকজনের বড়সড় ভিড় তার নজরে এলো। তারা উড়োজাহাজে করে ব্যাংকক যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। নিজের পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগের শুভবের প্রতিবাদ জ্ঞাপনে তিনি এটাকে একটি উপযুক্ত প্রদর্শনী বলে ভাবলেন। ভিড়ের মধ্যকার সাংবাদিকরা অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নের বোমা ছুঁড়ে মারতে শুরু করলো। তার জবাব ছিল রুক্ষ মেজাজির মত, তিক্ত এবং চাতুর্যপূর্ণ। কয়েকটি প্রশ্ন এবং উত্তর এরকম ছিল

প্রশ্ন ভারত দাবি করছে যে, তার বাহিনী এখন ঢাকার দোরগোড়ায়। তারা কতদূর আছে?  
উত্তর নিজেরাই গিয়ে দেখে আসুন।

প্রশ্ন আপনার পরবর্তী পরিকল্পনা কী?

উত্তর আমি সর্বশেষ মানুষটি নিয়ে এবং সর্বশেষ গুলিটি নিয়ে লড়াই করবো।

প্রশ্ন ভারতীয়দের ঢাকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মত পর্যাপ্ত শক্তি কী আপনার আছে?  
উত্তর ঢাকার পতন একমাত্র আমার মৃতদেহের ওপরই ঘটবে। তাদেরকে ট্যাঙ্ক চালাতে হবে এর ওপর (নিজের বুক দেখিয়ে) দিয়ে।

প্রশ্নবাণ থামলো না। কোনটার উত্তর দিলেন। কোনটা গেলেন এড়িয়ে এবং দ্রুত স্থান ত্যাগ করে নিজের ভূগর্ভস্থ সদর দফতরে গিয়ে ঢুকলেন।

১০ থেকে ১৩ ডিসেম্বরের আশাব্যঙ্গক সময়কালে নিয়াজির মন-মেজাজে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনি তখনও উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েননি। তার কৌতুক বন্ধ হয়ে গেছে। কান্নাও গেছে থেমে। তথাপি তিনি সাহসিকতার সাথে নিজের শ্বলনের প্রতি দৃকপাত করলেন এবং নিজের ওপর চমৎকার নিয়ন্ত্রণ আনলেন।

বিদেশী সাহায্যের আশ্বাস—যদিও তা ভিত্তিহীন—ছিল স্পষ্ট ফলদায়ক।

নিয়াজির মন-মেজাজের পরিবর্তনে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কোন ফল উৎপাদনে সক্ষম হলো না। পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকলো। ১০ ডিসেম্বরে দেয়ালের লিখন এমনই পরিকার হয়ে গেল যে, মেজর জেনারেল জামশেদকে ঢাকার রক্ষক হিসেবে কার্যক্রম হাতে নিন্তে হলো এবং আরো অন্তরালে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে গেলেন নিয়াজি।

ঢাকা এবং এর বহিসীমার একটি অপারেশনাল মানচিত্র অপারেশন কক্ষের পিচ্ছম দেয়ালে সঁটা ছিল। জামশেদ সেখানে একটি বৈঠক করলেন ঢাকার জন্য দুষ্টরবিশিষ্ট একটি রক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য। তার সহকারি ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ নতুন ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করলেন ঢাকাকে ঘিরে ডিস্ক্রিপ্ট রেখা টেনে। মানচিত্রে নির্দেশনাগুলো দারুণ চিত্তাকর্ষক দেখাচ্ছিল। সেগুলোকে একটি কুণ্ডলী পাকানো কেউটের মতা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, যদি শক্ত তাকে স্পর্শ করার স্পর্ধা দেখায়, তবে সে তাকে ছোবল মেরে পরপারে পাঠিয়ে দেবে।

কাণ্ডজে ব্যবস্থানুযায়ী ঢাকার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগীয় রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বিত হলো। বহিসীমার স্তর অথবা থাম হিসেবে মোকাবেলার জন্য সৈন্যরা উত্তর-পশ্চিমে মানিকগঞ্জ রেখা বরাবর অবস্থান নেবে। উত্তরে থাকবে কালিয়াকৈরে; উত্তর পুরে নারায়ণগঞ্জে, পুরে দাউকান্দিতে এবং দক্ষিণ-পুরে মুঙ্গীগঞ্জে। আশা করা হয়, ৯৩ ব্রিগেড (ময়মনসিংহ), ২৭ বিপ্রেড (ভেরবাজার), ১১৭ ব্রিগেড (কুমিল্লা), ৩৯ এডহক ডিভিশন (চাঁদপুর) যথাক্রমে কালিয়াকৈরে, নরসিংহদী, দাউদকান্দি এবং মুঙ্গীগঞ্জ এসে অবস্থান নেবে। এ আশা আর বাস্তবায়নি। অভ্যন্তরীণ রক্ষা ব্যবস্থা শীরপুর সেতু, টঙ্গী, ডেমরা এবং নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। কর্নেল ফজলে হামিদ, ব্রিগেডিয়ার কাসিম ও ব্রিগেডিয়ার মনসুরকে যথাক্রমে পশ্চিমাঞ্চলীয়, উত্তরাঞ্চলীয় এবং পুরবদিকের প্রবেশ পথ রক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার বশীর মূল ঢাকা শহরকে দেখবেন।

যেহেতু ঢাকায় কোন সংগঠিত বাহিনী ছিল না, সে কারণে ঢাকার মানচিত্রে চিহ্নিত স্থানগুলো পূরণ করার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে থাকা সৈন্য ও অন্যদের সংগ্রহের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। আরেকটি বৈঠকে বিভিন্ন শশস্ত্র বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীকে তাদের সৈন্য সংখ্যার প্রাপ্যতা অবহিতকরণের নির্দেশ দেয়া হয়। পদাতিক, প্রকৌশলী, অর্ডন্যাস, সিগন্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সেনাবাহিনী সার্ভিস কোর দিয়ে এ জনশক্তির মোট সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় বারো কোম্পানি। এছাড়া প্রায়, ১,৫০০ ইপিসিএএফ, ১,৮০০ পুলিশ এবং ৩০০ অনুগত রাজাকারকে (আল-বদর) এদের সাথে সংযুক্ত করা হয়। সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি। বিভিন্ন অফিস থেকে অতিরিক্ত স্টাফ অফিসারদের তুলে আনা হলো এই জগাখিচুড়ির অধিনায়কত্বের জন্য।

এসব লোকের অধিকাংশের কাছে ছিল ৩০৩ রাইফেল। এদেরকে অতিরিক্ত গোলাবর্ষণের জন্য এক ক্ষোয়াড়ন ট্যাঙ্ক, তিনটি মর্টার (তিন ইঞ্জি), চারটি রিকয়েললেস রাইফেল, দুটি ছয় পাউন্ডার কামান এবং কিছু হালকা মেশিনগান দেয়া হলো, যা বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং বিভিন্ন কূঠারে ভাগ করে দেয়া হলো। এই ভারি যুদ্ধ উপকরণ

কালিয়াকৈর-টঙ্গী অক্ষে নিয়োগ করা হলো। কেননা, ভারতীয় পারা ব্রিগেডের আক্রমণটি এই পথেই আসতে পারে বলে মনে করা হলো। সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বহর ছাড়া অন্য কোন উপকরণের জন্য গোলা-বারুদের অভাব ছিল না।

কাগজের ওপর জনবল ও যুদ্ধাঞ্চের হিসেব চিত্তাকর্ষক দেখাতে পারে, কিন্তু ভূমিতে পরিস্থিতি ছিল দারুণ বিবর্ণ। সৈন্যরা ছিল নেতৃত্বিক মনোবলহীন; অন্ত ছিল সেকেলে- লক্ষ্য নির্ভুল নয় অথবা অকার্যকর। সব থেকে মন্দ যোটা ছিল তা হলো যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না। তারা বোবার মত তাদের জায়গায় দাঁড়িয়েছিল এবং ছোট একটি চাপেই ভেঙ্গে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।

১৩ ডিসেম্বর উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টরের দায়িত্বশাখাণ্ড একজন বিশ্বেতিয়ার আমাকে টঙ্গীর দিকে নিয়ে গেলেন তার দুর্ভেদ্য ব্যবস্থাবলি দেখাবার জন্য। বললেন ‘দেখ পাকা রাস্তা’ এই যে এখানে কাটা হয়েছে, এটা মাইনের জন্য ‘ওখানে যে নলটি নীচে চলে গেছে, ওখানে আমাদের কামান বসবে। আমাদের আরআরগুলো ওখানে আছে—ঢাকা-টঙ্গী রোডের এ পাশে। ট্যাঙ্কগুলো আছে আরো আগে; যৌপ ঝাড়ের আড়ালে।’ এরপর আমরা জিপ থেকে নামলাম কাছে গিয়ে দেখার জন্য। রিকয়েলেলস রাইফেল বসানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি অন্তের গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়েছে। মর্টারের জন্য গোলা দেয়া হয়েছে; কিন্তু লক্ষ্য স্থাপক দেয়া হয়নি। শক্ত বিমানের আঘাতে একটি কামান অকেজো হয়ে গেছে। আরেকটি একই ধরনের পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে। শুধু মেশিনগানগুলোর জন্য মানুষ এবং রসদ রয়েছে যথাযথভাবে।

‘কেমন মনে করছো?’ কুর্হিটোলা বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের কাছে ব্রিগেডিয়ার একজন মেজরকে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি। কিন্তু মাত্র একটি মর্টার ও দু’টি মেশিনগান দিয়ে বড় রকমের ভারতীয় আক্রমণ ঠেকাতে পারবে বলে সৈন্যরা নিজেদেরকে তেমন আস্থাবান মরে করছে না।’

‘বোকার মত কথা বোলো না। সবাইকে উৎসাহ যোগাও। অন্ত দিয়ে কখনো যুদ্ধ জেতা যায় না।’

এদিকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরের বকর সিদ্ধিকী ঢাকায় পথ-যুদ্ধ সংগঠনের কথা বললেন। কিন্তু কোন একজন বলে উঠলো, ‘যে শহরের বাসিন্দারা শক্রভাবাপন্ন সেখানে আপনি কীভাবে পথ-যুদ্ধ সংগঠন করবেন? আপনাকে একদিক থেকে ভারতীয়রা এবং অন্যদিকে থেকে যুক্তিবাহিনী পথহারা কুকুরের মত তাড়িয়ে তাড়িয়ে শিকার করবে।’ অতএব, পরিকল্পনাটি বাতিল হলো।

শক্রের শক্তি এবং আমাদের সম্পদ সম্ভারের দিকে তাকিয়ে ঢাকার প্রতিরক্ষাকে তাসের ঘরেই মতই মনে হল। পথ-যুদ্ধের বিষয়টি সামগ্রিক অপারেশনাল রণকৌশলের অঙ্গীভূত ছিল না। মন্তিষ্ঠে আন্দোলিত ডেউয়ের ঝাপটার মতই এসেছিল এবং কোন তাৎপর্যই বহন করে না। দুর্বত্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

## আত্মসমর্পণ

চাঁদপুর থেকে পলায়নের সময় মেজর জেনারেল রহিম সামান্য আহত হয়েছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি জেনারেল ফরমানের বাসভবনে ছিলেন এবং ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। বাসভবনের একটি নির্জন অংশে তার দিন কাটছিল। দিনটি ছিল ১২ ডিসেম্বর। সর্বাঙ্গিক যুদ্ধের নবম দিন। সেদিন ফরমান তার সঙ্গে ছিলেন। তাদের সমগ্র চেতনা স্বাভাবিকভাবেই সংকটময় দিনের ঘটনার প্রতি নিবিষ্ট ছিল। ঢাকাকে কী রক্ষা করা যাবে? তাদের মধ্যে খোলাখুলি মত বিনিয়ম হলো। রহিম নিশ্চিত হন যে, যুদ্ধবিরতিই হচ্ছে এর একমাত্র জবাব রাহিমের কাছ থেকে এ পরামর্শ শুনে ফরমান বিশ্বিত হলেন। অথচ তিনিই সর্বান্ব ভারতের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের ওকালতি করে এসেছেন। তিনি ব্যঙ্গাত্মক কঠে বললেন, ‘বাছ দানে মুক গ্যায়ি—ইতনি জলদি।’ (এত দ্রুত ঘাবড়ে গেছো)। রহিম জোর দিয়ে বললেন যে, ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এ সময়ে আহত জেনারেলকে দেখার জন্য ফেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি ও মেজর জেনারেল জামশেদ কক্ষে প্রবেশ করেন। রহিম তার প্রস্তাব নিয়াজিকেও শোনালেন। এতে তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তখনো পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের আশা চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়নি। আলোচনার বিষয়কে এড়ানোর জন্য ফরমান লাগোয়া কক্ষে সরে পড়েন।

রহিমের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে জেনারেল নিয়াজি পায়ে পায়ে ফরমানের কক্ষে ঢুকলেন। বললেন, ‘তাহলে রাওয়ালপিণ্ডিতে সিগন্যাল পাঠিয়ে দাও।’ মনে হল, তিনি জেনারেল রহিমের উপদেশ মেনে নিয়েছেন, যা তিনি শান্তিকালে সর্বক্ষণ করতেন। জেনারেল নিয়াজি চাইলেন গভর্নমেন্ট হাউস প্রেসিডেন্টের কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি পাঠাক। কিন্তু ফরমান অত্যন্ত নম্রভাবে বলেন যে, প্রয়োজনীয় সংকেত পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর থেকেই যাওয়া উচিত। কিন্তু জেনারেল নিয়াজি চাপাচাপি শুরু করলেন। বললেন, ‘সিগন্যাল এখান থেকে যাক বা সেখান থেকে,— তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। অন্যখানে আমার কিছু শুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। তোমরা এখান থেকে পাঠিয়ে দাও।’ ফরমানের ‘না’ বলার আগেই চিফ সেক্রেটারি মুজাফফর হোসেন রংমে প্রবেশ করলেন এবং অলক্ষ্যেই কথাবার্তা শুনে ফেলেন এবং নিয়াজিকে বললেন, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন। বার্তা এখান থেকেও পাঠানো যেতে পারে।’ বাক-বিত্তার অবসান ঘটলো।

জেনারেল ফরমান যে বিষয়টি বিরোধিতা করেছিলেন, তা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সম্পর্কে নয়,— এর কর্তৃত্বের জামিনদার কে হবে, তা নিয়ে। একই বিষয়ের ওপর তার আগেরকার বার্তাটি রাওয়ালপিণ্ডি প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রথমবার তিনি দংশিত হয়েছেন, দ্বিতীয়বারের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছেন। জেনারেল নিয়াজি তার জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য হাওয়া হয়ে গেলেন এবং ঐতিহাসিক লিপিটির খসড়া তৈরি করলেন মুজাফফর হোসেন। ফরমানকে

দেখিয়ে গভর্নরের কাছে পেশ করা হল। তিনি খসড়া অনুমোদন করেন এবং একই সক্রান্ত  
(১২ ডিসেম্বর) প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লিপিতে ‘নিরাপরাধ মানুষের জীবন  
রক্ষায় জন্য সম্ভাব্য সরকিছু করতে ইয়াহিয়া খানের প্রতি সন্মর্বদ্ধ অনুরোধ জানালো হলো।’

পরদিন গভর্নর ও তার মুখ্য পরামর্শকরা প্রেসিডেন্টের আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে  
থাকেন। কিন্তু মনে হল, ব্যত্ততার কারণেই প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। পরদিন  
(১৪ ডিসেম্বর) এবিষয়ের ওপর একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।  
এদিন সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে তিনটি ভারতীয় মিগ হামলায় গভর্নমেন্ট হাউসে প্রধান হলের  
ভারি ছাদ ভেঙ্গে পড়লো। গভর্নর দ্রুত বিমান আক্রমণ নিরোধক আশ্রয়ে ঢুকে পড়লেন এবং  
তাড়াহুড়ো করে কোন রকমে পদত্যাগপত্র লিখে ফেললেন। ক্ষমতার এই কেন্দ্রবিন্দুর  
অধিকাংশ বাসিন্দার জীবনই হামলা থেকে বেঁচে যায়। চমৎকার করে সজ্জিত একটি  
একুইরিয়ামের মৎস্যকূল মারা যায়। ফ্রোরের উন্নত পাথর খণ্ডের ওপর লাফালাফি করতে  
করতে সেগুলো এক সময় নিঃসাড় হয়ে পড়ে।

গভর্নর, তার মন্ত্রিসভা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক কর্মচারীরা ১৪ ডিসেম্বরে  
হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রস হোটেলটিকে ‘নিরপেক্ষ  
জোন’-এ পরিণত করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি ভিডাইপিদের মধ্যে যারা ছিলেন, তারা হলেন  
চিফ সেক্রেটারি, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার, প্রাদেশিক  
সেক্রেটারি এবং অন্যান্য কয়েকজন ‘নিরপেক্ষ জোন’-এ স্থান পাবার জন্য লিখিতভাবে  
পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচূড়ি ঘটালেন। কেননা, যুদ্ধের দেশগুলির কোন ব্যক্তিই  
রেডক্রসের আশ্রয় লাভের অধিকারী হতে পারে না।

১৪ ডিসেম্বর ছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বশেষ দিন। সরকারের এবং গভর্নমেন্ট  
হাউসের জঙ্গল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এখন শুরুকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে  
বাংলাদেশের জন্মকে সম্পন্ন করার জন্য নিয়াজি এবং তার বিশ্বাল বাহিনীকে কবজ্ঞ করতে  
হবে মাত্র। ইতিমধ্যে জেনারেল নিয়াজি ও বিদেশী সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করেছেন। তিনি  
আবার তার সেই বিষণ্ণতার মাঝে ঢুবে গেলেন এবং তার সুরক্ষিত ঘরের বাইরে কদাচিং  
এলেন। গতি এবং লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছাড়াই তিনি সময়ের রথে চেপে বসেছেন।

অতএব, তিনি পরিস্থিতির মর্ম প্রেসিডেন্টকে জানালেন (তিনি সর্বাধিনায়কও বটে) এবং  
তার নির্দেশের আশায় উদগ্রীব অপেক্ষায় রইলেন। আমার উপস্থিতিতে (১৩/১৪ ডিসেম্বর)  
রাতে তিনি জেনারেল হামিদকে টেলিফোন করলেন। বললেন, ‘স্যার, আমি প্রেসিডেন্টের  
কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে কী দেখবেন সেগুলোর ওপর দ্রুত  
কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় কীনা।’

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তার বহুবিধ কাজের ভেতর  
থেকে সময় বের করলেন এবং গভর্নর ও জেনারেল নিয়াজিকে ‘যুদ্ধ বন্ধ ও জীবনহানি’  
রোধের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাবলি গ্রহণের আদেশ দিলেন। জেনারেল নিয়াজীর কাছে প্রেরিত  
সংকেত বার্তায় তিনি বলেন

গভর্নরের দ্রুত প্রেরিত বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রচণ্ড রকমের প্রতিকূলতার মধ্যে

থেকেও আপনি একটি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ লড়েছেন। জাতি আপনার জন্য গর্বিত এবং সারা বিশ্ব আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবান। সমস্যার একটি গহণযোগ্য সমাধানের জন্য একজন মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য যা কিছু করার, আমি তার সবই করেছি। আপনি এখন এমন একপর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া মনুষ্য ক্ষমতায় সম্ভব নয়। অথবা উদ্দেশ্য সাধনে তা ফলপ্রসূ হবে না। এ শুধু আরো জীবনহানি ঘটাবে এবং ধর্মসের কারণ হবে। আপনি এখন যুদ্ধ বন্ধসহ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য, সকল পঞ্চিম পাকিস্তানি এবং সকল অনুগত ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করতে পারেন। ইতিমধ্যে আমি জাতিসংঘে অঙ্গসর হয়েছি এবং অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধ এবং সশস্ত্র বাহিনীসহ অন্যান্য সকলের,—যারা দৃঢ়ত্বাদের লক্ষ্য হতে পারে—তাদের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে ভারতকে অনুরোধ জানাবার জন্য জাতিসংঘকে বলেছি।

এই শুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রামটি রাওয়ালপিণ্ডিতে তৈরি হয় ১৪ ডিসেম্বর দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে এবং ঢাকায় পৌছে (পূর্ব পাকিস্তান স্থানীয় সময়) বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে।

প্রেসিডেন্টের টেলিগ্রামটি কী তাৎপর্য বহন করে? এটা কি জেনারেল নিয়াজির জন্য আত্মসমর্পণের আদেশ? অথবা তিনি যদি চান তাহলে কি যুদ্ধে চালিয়ে যেতে পারেন। আমি টেলিগ্রামটির ঘর্মার্থ উক্তারের ব্যাপারটি পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিতে চাই এবং পাঠক নিজেই এ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন।

একই সন্ধ্যায় যুদ্ধবিবরিতি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলেন জেনারেল নিয়াজি। মধ্যস্থ হিসেবে তিনি চৈনিক ও রুশ কূটনীতিকদের কথা ভাবলেন। কিন্তু অবশেষে ঢাকায় মার্কিন কঙ্গাল জেনারেল মি. স্পিভাককে বেছে নিলেন। মি. স্পিভাকের কাছে যাওয়ার জন্য জেনারেল নিয়াজি মেজর জেনারেল ফরমানকে তার সঙ্গী হতে বললেন। কেনবা, গভর্নরের উপদেষ্টা হিসেবে বিদেশী কূটনীতিকদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। মি. স্পিভাকের অফিসে পৌছে ফরমান পাশের কক্ষে গিয়ে বসলেন আর মি. নিয়াজি ভেতরে চলে গেলেন। জেনারেল নিয়াজি স্পিভাকের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছিলেন উচ্চকক্ষে সরল প্রস্তাব প্রদানের মাধ্যমে। ফরমান তার কঠস্বর শুনতে পাইলেন; যখন ভাবলেন, ‘বন্ধুত্ব’ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখনই তিনি আমেরিকান কঙ্গালকে ভারতীয়দের সাথে যুদ্ধবিবরিতির শর্তসমূহ নিয়ে তার হয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য বললেন। জনাবে মি. স্পিভাক আবেগশূন্য কঠে প্রচলিত রীতি বজায় রেখে বলেন, ‘আমি তাপনার হয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারি না। আপনি যদি চান, আমি মাত্র একটি বার্তা তৈরি করে পাঠাতে পারি।’

জেনারেল ফরমানকে ভেতরে ডেকে আনা হল ভারতীয় চিফ অফ স্টাফ (সেনাবাহিনী) জেনারেল শ্যাম মানেকশ'র জন্য বার্তা তৈরি করতে। পূর্ণ পৃষ্ঠা অভিলিপি প্রদান করে তিনি অবিলম্বে যুদ্ধবিবরিতির আহ্বান জানালেন। এবং লিপিতে এই বিষয়গুলোর নিচয়তা প্রদান করতে বলা হল পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা, মুক্তিবাহি-নীর প্রতিশেধপ্রয়াণতা থেকে অনুগত বেসামরিক জনগণকে রক্ষা, অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসা এবং নিরাপত্তার বিধানকরণ।

খসড়া তৈরি হতেই মি. স্পিভাক বললেন, ‘কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এটা পাঠিয়ে দেয়া হবে।’ জেনারেল নিয়াজি এবং ফরমান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে ফিরে এলেন। উত্তরের অপেক্ষায় এইড ড্যাকাং ক্যাপ্টেন নিয়াজিকে বিসিয়ে রেখে এলেন তিনি সেখানে রাত ১০টা পর্যন্ত বসে থাকেন কিন্তু কিছুই ঘটে না। ঘুমাবার আগে আরেকবার তাকে খোঁজ নিতে বলা হলো। রাতে কোন জবাব পাওয়া গেল না।

বঙ্গত মি. স্পিভাক বার্তাটি জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল হন) মানেকশকে পাঠাননি। তিনি সেটা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেন,— যেখানে মার্কিন সরকার কোন কার্যক্রম গ্রহণের আগে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খানকে পাওয়া যায়নি। তিনি অন্য কোথাও ডুবেছিলেন তার বেদনা অপনোদনের জন্য। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তিনি ও ডিসেম্বরেই যুদ্ধ সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সাধারণত তার সামরিক সচিব একটি মানচিত্র নিয়ে যেতেন তার কাছে। সেখানে যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি চিহ্নিত করা থাকতো। তিনি একবার মানচিত্রের দিকে দৃকপাত করে মন্তব্য করেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমি কী করতে পারি?’

মানেকশ ১৫ ডিসেম্বর লিপির জবাব দেন। বলেন, যুদ্ধবিরতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং লিপিতে উল্লেখিত লোকজনদের নিরাপত্তা দেয়া যেতে পারে—শর্ত এই যে, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে ‘আমার অগ্রবর্তী সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর কলকাতার বেতার তরঙ্গেও জানিয়ে দিলেন তিনি—যাতে তাদের সাথে বিশদ আলোচনার জন্য যোগাযোগ করা যায়।

মানেকশ’র বার্তা রাওয়ালপিণ্ডিতে পাঠানো হল। ১৫ ডিসেম্বর সকায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জবাবে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, ‘শর্ত গুলি যদি আপনাদের প্রয়োজন মেটায় সেক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি গ্রহণের পরামর্শ দিছিল... যা হোক ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ হবে স্থানীয়ভাবে,— দুই কমান্ডারের মধ্যে। জাতিসংঘে যে সমাধান কামনা করা হয়েছে তার সাথে এর যদি বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে এটাকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে।’

১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা থেকে পরদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত অঙ্গীয়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলো দু’পক্ষ। পরে ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হল যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থাবলি চূড়ান্ত করা জন্য। জেনারেল হামিদ নিয়াজিকে ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি যুদ্ধবিরতির শর্ত গ্রহণ করছেন এবং নিয়াজি ইঙ্গিতকে অনুমোদন হিসেবে ধরে নিলেন। অতএব, তিনি তার চিফ অফ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকীকে বিভিন্ন স্থাপনায় প্রয়োজনীয় আদেশ পাঠিয়ে দেয়ার জন্য বললেন। পূর্ণ পৃষ্ঠা বার্তায় সৈন্যদের ‘বীরতৃপূর্ণ লড়াই’য়ের প্রশংসা করে স্থানীয় কমান্ডারদের তাদের ভারতীয় প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে বলা হলো। বার্তায় ‘আত্মসমর্পণ’ শব্দটি উল্লেখ করা হল না। মাত্র এই বাক্যটি উদ্বৃত্ত করা হল, ‘দুর্ভাগ্যবশত এর সাথে অন্ত সংবরণও জড়িত।’

বার্তাটি প্রেরণ করতে রাত্রি মধ্য প্রহর (১৫/১৬ ডিসেম্বর) হয়ে গেল। একই সময়ে চতুর্থ এভিয়েশন ক্ষেয়াত্তনের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল লিয়াকত বোখারীকে ডেকে পাঠানো হল সর্বশেষ ব্রিফিং দেয়ার জন্য। সেই রাতেই তাকে আটজন পচিম পাকিস্ত

নান নার্স এবং আটাশটি পরিবার নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে আকিয়াবে (বার্মা) যেতে বলা হল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল লিয়াকত তার স্বভাবসূলভ ধীর-স্থিরতার সাথে আদেশটি ইহণ করলেন,—যেমন তাকে গ্রহণ করতে দেখা গেছে সমগ্র যুদ্ধের মধ্যে। সর্বাত্মক যুদ্ধের বারো দিনে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জন্য তার হেলিকপ্টারগুলোই ছিল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সেনা, গোলা-বারুদ এবং অন্তর্শস্ত্র পরিবহণের একমাত্র অবলম্বন। তাদের শৌর্যগাথা এত বেশি উদ্দীপনামূলক, যার সংক্ষিপ্তসারও এখানে করা যাবে না।

১৬ ডিসেম্বর ভোর হবার আগেই হেলিকপ্টার দুটো আকাশে উড়লো, ত্তীয়টি পাখা মেললো দিনের বেলায়। মেজর জেনারেল রহিম খানসহ আরো কয়েকজন হেলিকপ্টারে উঠলেন। কিন্তু নার্সদের ফেলে রাখা হল। কেননা, তাদেরকে সময়মত তাদের হোস্টেল থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।’ হেলিকপ্টারগুলো নিরাপদে বার্মায় অবতরণ করে এবং অবশেষে তারা করাচি পৌছে যান।

এদিকে ঢাকায় চূড়ান্ত সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। টাঙাইলের দিক থেকে অগ্রসরমান শক্রসেন্য টঙ্গীর কাছাকাছি এলে আমাদের ট্যাংকের গোলার মুখোমুখি হয়। ফলে তারা ধরে নেয়, টঙ্গী-ঢাকা সড়ক দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। অতএব, ভারতীয়রা মানিকগঞ্জ অভিযুক্তী একটি অবহেলিত সড়কে নেমে গেল। এই সড়ক দিয়েই কর্নেল ফজলে হামিদ দ্রুত পশ্চাদপসরণ করেছিলেন—যেমন তিনি করেন ৬ ডিসেম্বর খুলনা থেকে পিছু হটে আসার সময়ে। কর্নেল ফজলে হামিদের সৈন্যদের অনুপস্থিতি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শক্রকে ঢাকা শহরের দিকে এগিয়ে আসার অবাধ সুযোগ করে দিল।

বিগেডিয়ার বশীরের ওপর প্রাদেশিক বাজধানী রক্ষার (ক্যান্টনমেন্ট বাদে) দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তিনি ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জানতে পান যে, মানিকগঞ্জ-ঢাকা সড়ক সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। ইপিসিএএফ-এর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকজন একত্র করতে তিনি রাতের প্রথম অর্ধাংশ ব্যয় করেন এবং জোগাড় হল প্রায় এক কোম্পানির মতো লোকজন। তাদেরকে মেজর সালামাতের অধিনায়কত্বে দিয়ে শহরের উপকণ্ঠে মিরপুর সেতুর কাছে পাঠালেন। মিরপুর সেতুটি প্রহরবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে—খবরটি মুক্তিবাহিনী ভারতীয় কমান্ডো সৈন্যদের জানিয়ে দেয়। এই খবর পেয়ে তারা ১৬ ডিসেম্বর সকাল হবার কিছু আগেই ঢাকা শহরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। কিন্তু মেজর সালামাতের লোকজন ততক্ষণে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। এবং তারা অদ্দের মত অগ্রসরমান সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। কয়েকজন শক্র সৈন্য হত্যা করতে পেরেছে এবং দু'টো ভারতীয় জিপ গাড়ি দখল করেছে বলে তারা দাবি করে।

১০১ কমিউনিকেশন জোন-এর মেজর জেনারেল নাগরা অগ্রবর্তী কমান্ডো সৈন্যদের অনুসরণ করে এগিয়ে আসছিলেন। সেতু থেকে বেশ দূরে তিনি অবস্থান নিলেন এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজির জন্য একটি চিরকুট পাঠালেন। চিরকুটে তিনি লেখেন ‘প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর সেতুর কাছে। আপনার-প্রতিনিধি পাঠান।’

জেনারেল নিয়াজি সকাল নটায় চিরকুটি পেলেন। সে সময় তার পাশে ছিলেন মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল ফরমান ও রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ। ফরমান,—যিনি তখনো ‘যুদ্ধ বিরতি আলোচনা’ বার্টাটির সাথে সেঁটে আছেন, বললেন, ‘তিনি কী (নাগরা) আলোচক দল?’ জেনারেল নিয়াজি কোন মন্তব্য করলেন না। স্পষ্ট প্রশ্ন এখন এটাই—তাকে অভ্যর্থনা জানানো হবে, না মোকাবেলা করা হবে। ইতিমধ্যে নাগরা ঢাকার দোরগোড়ায় এসে গেছেন।

মেজর জেনারেল ফরমান জেনারেল নিয়াজিকে জিজেস করলেন, ‘আপনার কোন রিঝার্ভ বাহিনী আছে?’ জেনারেল নিয়াজি এবারও কিছু বললেন না। রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ পাঞ্জাবিতে কথাটি অনুবাদ করে বললেন, ‘কুণ্ঠ পাল্লে হ্যায়?’ (খলেতে কিছু কি আছে?) নিয়াজি ঢাকার রক্ষক জামশেদের দিকে তাকালেন। জামশেদ এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন,—যার অর্থ হল, ‘কিউই নেই শৃণ্য।’ ‘যদি এই-ই হয় তাহলে যান—যা সে (নাগরা) বলে, করেন গিয়ে।’ প্রায় একই সাথে ফরমান ও শরীফ বলে ওঠেন।

জেনারেল নিয়াজি নাগরাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠালেন। তিনি মিরপুর সেতুতে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধ বিরতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নাগরার নির্বিঘ্ন আগমনের সুযোগ প্রদানের আদেশ দিলেন। ভারতীয় জেনারেল কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু ঢুকলেন গৌবেরে শিরোপা ধারণ করে। এবং বস্তুত সেটাই ছিল ঢাকার পতন। পতন ঘটলো নীরবে,—একজন হৃদয়োগীর মত। কোন অঙ্গচ্ছেদন হলো না। কিংবা দেহ দ্বিখণ্ডিতও হলো না। একটি স্বাধীন নগরীর সত্তা বিলুপ্ত হল মাত্র। সিঙ্গাপুর, প্যারিস অথবা বার্লিনের পতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হলো না এখানে।

ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় কামান্ডের কৌশলগত সদর দফতরকে নিশ্চহ করা হয়। সমস্ত অপারেশনাল মানচিত্র সরিয়ে ফেলা হলো। প্রধান সদর দফতরটিকে ধূলি-ধূসরিত করা হলো। ভারতীয়দের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কেননা, ব্রিগেডিয়ার বকর বললেন, ‘এটা বেশি রকমের সুসজ্জিত।’ লাগোয়া অফিসার্স মেসকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল ‘অতিথি’দের জন্য অতিরিক্ত খাবার তৈরি করতে। প্রশাসনে বকরের দারুণ দক্ষতা।

মধ্যহের একটু পরেই বকর বিমান বন্দরে গেলেন তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ মেজর জেনারেল জ্যাকবকে অভ্যর্থনা জানাতে। ইতিমধ্যে নিয়াজি নাগরাকে তার কৌতুক পরিবেশন করে আমোদিত করতে শুরু করলেন। সেগুলো তুলে ধরতে পারলাম না বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কেননা তা ছাপাবার যোগ্য নয়।

মেজর জেনারেল জ্যাকব ‘আত্মসমর্পণের দলিল’ নিয়ে এলেন। জেনারেল নিয়াজি এবং চিফ অব স্টাফ সেটাকে ‘যুদ্ধ বিরতি চুক্তির খসড়া’ বলতেই-অধিকতর পছন্দ করলেন। জ্যাকব কাগজপত্র বকরের হাতে তুলে দিলেন। তিনি সেটা মেজর জেনারেল ফরমানের সামনে পেশ করলেন। জেনারেল ফরমান ‘ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড’ সম্বলিত ধারাটির ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। জ্যাকব জানালেন, ‘কিন্তু এভাবেই বিষয়টি দিয়ে থেকে এসেছে।’ ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল খেরা এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

বললেন, ‘ওফ, এটা তো ভারত আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আপনারা তো শুধুমাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করছেন।’ দলিলটি নিয়াজির সামনে দেয়া হল। তিনি নজর বেলালেন কিন্তু মন্তব্য করলেন না। তিনি আবার সেটা টেবিলের অপর পাশে ফরমানের দিকে ঠেলে দিলেন। ফরমান বললেন, ‘এটা অধিনায়কেরই বিষয়—তিনি গ্রহণ অথবা বাতিল করতে পারেন। নিয়াজি কিছুই বললেন না। এই নীরবতাকে তার সম্মতি হিসেবেই গ্রহণ করা হল।

বিকেলের শুরু হতেই জেনারেল নিয়াজি গাড়ি করে ঢাকা বিমান বন্দরে গেলেন ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। তিনি পঞ্চাকে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে এলন। এক বিপুল সংখ্যক বাঙালি ছুটে গেল তাদের ‘মুক্তিদাতা’ ও তার পঞ্চাকে মাল্যভূষিত করতে। নিয়াজি তাকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিলেন এবং কর্মদণ্ড করলেন। সে ছিল একটি হৃদয়স্পৰ্শী দৃশ্য। বিজয়ী এবং বিজিত দাঁড়িয়ে আছে প্রকাশ্যে বাঙালির সামনে। আর বাঙালিরা অরোরার জন্য তাদের গভীর ভালবাসা এবং নিয়াজির জন্য তৈরি ঘৃণা প্রকাশে কোনরূপ গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে না।

উচ্চকাষ্ঠে চি�ৎকার ও শ্লোগামের মধ্য দিয়ে তাদের গাড়ি রঘনা রেসকোর্স-এ (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এলো। সেখানে আত্মসমর্পণের জন্য মঝে তৈরি করা হয়। বিশাল ময়দানটি বাঙালি জনতার উদ্বেগ আবেগে ভাসছিল। তারা প্রকাশ্যে একজন পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলের অবমাননার দৃশ্য দেখবার জন্য উদ্ধৃতি হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনা বাংলাদেশের জন্মের বিন্যাস ঘটালো।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি সুসজ্ঞত দলকে হাজির করা হলো বিজয়ীকে গার্ড অব অনার দেয়ার জন্য। অন্যদিকে একটি ভারতীয় সেনাদল বিজিতের প্রহরায় নিযুক্ত হল। প্রায় দশ লাখ বাঙালি এবং কয়েক কুড়ি বিদেশী সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। ঢাকা দখলের নির্দশনস্বরূপ জেনারেল নিয়াজি তার রিভলভার বের করে অরোরার হাতে তুলে দিলেন। রিভলভারের সাথে তিনি পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন।

যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণভাবের গ্রহণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ভারতীয় সৈন্য না পাওয়া গেল ততক্ষণ পর্যন্ত ঢাকা গ্যারিসনকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তিগত অস্ত্র রাখতে অনুমতি দেয়া হল। গ্যারিসন অনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ ডিসেম্বর বেলা ১১ টায় ক্যান্টনমেন্টের গলফ ময়দানে আত্মসমর্পণ করলো। ঢাকার বাইরের সৈন্যরা স্থানীয় কমান্ডারদের সুবিধা মতো ব্যবহানুযায়ী ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণ করলো।

অল ইন্ডিয়া রেডিও আসন্ন আত্মসমর্পণের সংবাদ ১৪ ডিসেম্বরের সকাল থেকেই প্রচার করতে থাকে। এই প্রচার ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানের আবাঙালিদের আতঙ্কস্থ করে তোলে। তাদের অধিকাংশই নিজেদের বাড়িয়ের ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটতে শুরু করে পাকিস্তানি সৈন্যদের ভাগ্যের সাথে নিজেদের ভাগ্যকে এক সূত্রে গ্রাহিত করার জন্য। পথে তারা

মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং হত্যা করা হয়। সে নৃশংসতার কাহিনী লোমকৃপকে শিখরিত করে। রক্ত শীতল করে দেয়। আর সে কাহিনীর সংখ্যা এত বেশি যে, তার তালিকা প্রণয়নও অসম্ভব।

এই নিরপরাধ মানুষদের জীবনরক্ষার সময় ছিল না ভারতীয়দের। বিজয় অর্জিত লুঠিত দ্রব্য তারা ভারতে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ছিল ব্যস্ত। সামরিক উপকরণ, খাদ্যবস্তু, শিল্প উৎপাদন, বাড়িঘরের মালমাত্রাসহ রেফ্রিজারেটর, কার্পেট এমন কী টেলিভিশন সেটও পাচার করা হয় রেল ও ট্রাকের বহরে করে। বাংলাদেশের রক্ত প্রোপুরিভাবে ছুবে নেয়া হয়। ‘সাধীনতা’র উষাকে আবাহন করার জন্য পড়ে রইল মাত্র একটি কংকাল। এক বছর পর বাঙালিদের মধ্যে এই উলঙ্কির প্রকাশ ঘটতে শুরু করে।

ভারতীয়রা যা পারলো,—বাংলাদেশের সম্পদ তাদের দেশে নিয়ে গেল। এরপর তারা পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতীয় যুদ্ধবন্দি ক্যাম্পে (পিওডব্লিউ) নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়া ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত চললো। লেটটেন্যাট জেনারেল নিয়াজি, মেজর জেনারেল ফরমান, রিয়ার অ্যাডিমিরাল শরীফ ও এয়ার কমোডোর ইনাম-উল-হকসহ অন্যান্য ভিআইপিরা ২০ ডিসেম্বর কলকাতার উদ্দেশ্যে আকাশে উড়লেন। আমাকেও তাদের সঙ্গে নেয়া হল।

২০ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমি শেষবারের মত ঢাকা তাগ করলাম। কিন্তু কী তফাও ছিল সেই সময়ের সাথে—যখন ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে আমি প্রথম বারের মত এখানে আসি! পাকিস্তানি সৈন্যদের খাকির জায়গায় এসেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবুজ ইউনিফরম। বাঙালিরা তখনে বসে আছে বেড়ার ওপরে। হতভের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পটের পরিবর্তন। সম্ভবত তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এই পরিবর্তন দেখে যে, হয়তো আরেকটি নতুন এবং সবচেয়ে খারাপ আধিপত্যের সূচনা হতে পারে। তারা কি জোয়ালই বদলালো শুধু?

কলকাতার ফৌর্ট উইলিয়মে পৌছানোর সাথে সাথে জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে পেছনে ফেলে আসা যুদ্ধ সম্পর্কে নিজের বক্তব্য তৈরি আগেই তার সাথে আমি আলাপ করতে চাইলাম। তিনি খোলা মন নিয়ে বললেন কিন্তু কথায় তিক্ততা ছিল। বিবেকের কোন তাড়মা কিংবা দোদুল্যমানতা দেখা গেল না। পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছদনের কোন দায়িত্ব নিতে তিনি অস্বীকার করলেন এবং এর জন্য সরাসরি দায়ী করলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে। আমাদের আলাপচারিতার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি : ‘আপনি কী কখনো ইয়াহিয়া খান কিংবা হামিদকে বলেছিলেন, যে সমর সম্ভাব আপনাকে দেয়া হয়েছে তা আপনার ওপর অর্পিত মিশন সম্পন্নের জন্য যথেষ্ট নয়?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম। ‘তারা কি বেসামরিক ব্যক্তি? তারা কী জানতেন না, মাত্র তিনটি পদাতিক ডিভিশন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত বিপদ মোকাবেলা সম্ভব কী না?’ ‘ব্যাপারটি যা-ই হোক, রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসাবে ঢাকা রক্ষায় আপনার অক্ষমতা একটি লাল কালির দাগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যদিও পরিস্থিতির প্রেক্ষপটে দুর্গ রক্ষাবৃহৎ কৌশল সাধ্যায়ন্ত ছিল তথাপি ঢাকাকে আপনি দূর্গ হিসাবে গড়ে তোলেননি। সেখানে সৈন্যও ছিল না।’ ‘এর জন্য

রাওয়ালপিণ্ডি দায়ী। তারা আমাকে মধ্য নতুনেরে আটটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন দেবার প্রতিশ্রূতি দেয় কিন্তু পাঠায় মাত্র পাঁচটি বাকি তিনটি তখনে আসেনি অথচ পূর্বাহে আমাকে না জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্ট খুলে দেয়া হয়।'

আমি বাকি তিনটি ব্যাটালিয়ন ঢাকায় রাখতে চেয়েছিলাম। 'কিন্তু ৩ ডিসেম্বরের পর আপনি যখন জানলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কিছুই আসতে পারবে না তখন নিজস্ব সম্পদ থেকে রিজার্ভ বাহিনী সৃষ্টি করলেন না কেন?' 'কেননা, একই সাথে সকল সেস্ট্রে চাপ সৃষ্টি হয়। সৈন্যদের সবখানেই নিয়োজিত রাখতে হচ্ছিল। কাউকে ছাড়া যাচ্ছিল না।' 'আগনার কাছে ঢাকায় অল্প পরিমাণ যা-ই ছিল, তা দিয়েই আপনি আরো কয়েক দিনের জন্য যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে পারতেন।' আমি বললাম। 'কী জন্য' তিনি জবাব দিলেন, 'সেটা আরে মৃত্যু আর ধৰংসকেই তেকে আনতো। ঢাকার নর্দমা রুদ্ধ যেতো। রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের স্তুপ সৃষ্টি হতো। নাগরিক জীবন ভেঙ্গে পড়তো। প্রেগ এবং অন্যান্য রোগের বিস্তার ঘটতো। তথাপি ফলাফল একই হতো। ৯০ হাজার বিধবা এবং পাঁচ লাখ অনাথের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বরং ৯০ হাজার জীবিত যুদ্ধ বন্দিকে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবো। আত্মাগতি এর চেয়ে মূল্যবান নয়।' 'শেষটা একই রকমের হতো। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাস ভিন্নতর হতো। সামরিক অপারেশনের ইতিহাসে সেটা একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী অধ্যায় হিসাবে লেখা থাকতো।' জেনারেল নিয়াজি জবাব দিলেন না।

## পরিশিষ্ট : ১

### ছয় দফা

প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে সংশোধিত ছয়-দফার বিষয়বস্তু।

#### প্রথম দফা

মূল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সঠিক অর্থে পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন গঠনের বিষয় শাসনতন্ত্রে অন্যমোদিত হতে হবে। এবং সরাসরি সার্বজনীন প্রাণ-বয়ক্ষদের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পত্তি আইন পরিষদ সঞ্চালিত সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) সরকার গঠনের বিষয় থাকতে হবে।

সংশোধিত সরকারের চারিত্র হবে (যুক্তরাষ্ট্রীয়) ফেডারেল ও সংসদীয়, যেখানে ফেডারেল আইন পরিষদ এবং অঙ্গ-রাষ্ট্রসমূহের আইন পরিষদসমূহকে সরাসরি সার্বজনীন প্রাণ-বয়ক্ষদের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতে হবে। ফেডারেল আইন পরিষদ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

#### দ্বিতীয় দফা

মূল ফেডারেল সরকারের আওতাভুক্ত থাকবে দু'টি বিষয়—প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ক। অবশিষ্ট সকল বিষয়সমূহ অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর একত্রিয়ারভুক্ত থাকবে।

সংশোধন : শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক বিষয়ক দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং নিম্ন তৃতীয় দফার বর্ণিত শর্তসমূহের মাধ্যমে মুদ্রা ব্যবস্থা বিন্যস্ত হবে।

#### তৃতীয় দফা

মূল ১. দুই অংশের জন্য দু'টি পৃথক কিন্তু অবাধে রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত করা যেতে পারে। অথবা

২. গোটা দেশের জন্য একটি মুদ্রা ব্যবস্থা বহাল রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মুদ্রার অভিসরণ রোধের জন্য কার্যকর শাসনতাত্ত্বিক বিধি তৈরি করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংক রিজার্ভ করতে হবে এবং পৃথক মুদ্রা ও অর্থনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

সংশোধিত পারস্পরিক ও অবাধে রূপান্তরযোগ্য দু'টি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রতি অংশের প্রত্যেক এলাকার জন্য থাকবে, অথবা বিকল্প হিসেবে একটি মাত্র মুদ্রা ব্যবস্থা, একটি ফেডারেল (যুক্তরাষ্ট্রীয়) রিজার্ভ প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষে যেখানে আঞ্চলিক ফেডারেল (যুক্তরাষ্ট্রীয়) রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে—যে ব্যবস্থা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ স্থানান্তর ও পুঁজির অভিসরণ রোধের উপায় উচ্চাবন করবে।

## চতুর্থ দফা

মূল কর আরোপ ও রাজ্যস সংগ্রহের অধিকার থাকবে অঙ্গ রাষ্ট্রসমূহের; যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের ওই রকম কোন ক্ষমতা থাকবে না। প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ফেডারেশন অঙ্গরাজ্যের করের একটি অংশ পাবে। সমগ্র অঙ্গ রাজ্যের করের ওপর আনুপাতিক হারে ধার্য্যকৃত দেয় অংশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল গঠিত হবে।

**সংশোধিত** অর্থ-সংক্রান্ত নীতিমালা অঙ্গ রাজ্যসমূহের দায়িত্বে থাকবে। প্রতিরক্ষা এবং (পররাষ্ট্র) বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় রাজ্য প্রাণ্তির উৎস থাকবে—যে রাজ্যস-উৎস শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত আনুপাতিক হার অনুসারে কেন্দ্র নিজেই সংগ্রহ করতে পারবে। অঙ্গ রাজ্যসমূহের দ্বারা অর্থনৈতিক নীতিমালা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় রাজ্য পাবার ব্যবস্থা অনুরূপ শাসনতাত্ত্বিক বিধিসমূহ নিশ্চিত করবে।

## পঞ্চম দফা

মূল ১. দুই অংশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দুটি পৃথক হিসাব থাকবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের আয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন দুই অংশ সমান সমান অংশে অথবা নির্ধারিত আনুপাতিক হারে পূরণ করবে।

৪. কোন প্রকার শুল্ক ছাড়া অভ্যন্তরীণ উৎপাদন উভয় অংশের ভেতর অবাধে সঞ্চালিত হবে।

৫. শাসনতন্ত্র অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহকে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন এবং বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও চুক্তি সম্পাদন করবার অধিকার প্রদান করবে।

**সংশোধিত** অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহের নিয়ন্ত্রণ অধীন স্ব-স্ব এলাকার জন্য পৃথক পৃথক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হিসাব রক্ষণ সম্ভব করার জন্য প্রয়োজনীয় শাসনতাত্ত্বিক বিধি তৈরি করতে হবে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে অঙ্গ রাজ্যসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা পূরণ করবে। শাসনতন্ত্র অনুসারে আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতা থাকবে দেশের বৈদেশিক নীতির নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন করার—যে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব থাকবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের।

## ষষ্ঠ দফা

মূল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি মিলিশিয়া ও আধা-সামরিক বাহিনী গঠন।

**সংশোধিত** জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যকর রাখার জন্য অঙ্গ রাজ্যসমূহের সরকারগুলোকে একটি মিলিশিয়া ও আধা-সামরিক বাহিনী রাখার ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

## পরিশিষ্ট - ২

### অপারেশন সার্ট্যুইট

#### পরিকল্পনার ভিত্তি

১. এ এল (আওয়ামী লীগ)-এর কার্যকলাপ এবং প্রতিক্রিয়াকে বিদ্রোহাত্মক বলে গণ্য করতে হবে। যারা তাদের সমর্থন করবে অথবা এম এল (মার্শাল ল')-এর কার্যক্রমকে অধীকার করবে তাদেরকে শক্ত গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. যেহেতু এ এল-এর সর্বত্র ব্যাপক সমর্থন রয়েছে এমন কী সেনাবাহিনীর মধ্যেও ইপি'র (ইস্ট পাকিস্তান) লোকজন রয়েছে, সে জন্য অপারেশন শুরু করতে হবে অতিশয় চাতুর্যের সঙ্গে। হতবাককরণ ও প্রতারণামূলক হতে হবে এবং কার্যক্রমে আতংক সৃষ্টি করতে হবে।

#### সাফ্টল্যার জন্য মূল আবশ্যিকীয় বিষয়

৩. একই সাথে সারা প্রদেশে অপারেশন আরম্ভ করতে হবে।

৪. সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতা, শিক্ষক সম্প্রদায়ের ভেতরকার এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যেকার চরমপঞ্চদের গ্রেফতার করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করতে হবে।

৫. ঢাকার অপারেশনকে শতকরা একশ' ভাগ সাফল্য অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে এবং অনুসন্ধান চালাতে হবে।

৬. ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের চেষ্টা কেউ করলে তার মোকাবেলায় বড় ধরনের এবং মুক্ত হস্তে গুলি চালানো যাবে।

৭. যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও আতর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টিভি, টেলিপ্রিন্টার সার্টিস, বৈদেশিক কনসুলেটসমূহের ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিতে হবে।

৮. ই পি (সৈন্যদের) দমন করতে ড্রিউ পি (পশ্চিম পাকিস্তান) সৈন্যদের-কোর্টস্ এবং অঙ্গাগার নিয়ন্ত্রণ ও প্রহরায় নিয়োগ করতে হবে। একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে পি এ এফ এবং ইপিআর-এর ক্ষেত্রে।

#### হতবাককরণ এবং প্রতারণা

৯. উচ্চস্তরে—প্রেসিডেন্টকে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার বাস্তুনীয়তা সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যদিও মি. ভূট্টো সম্মত হবেন না তবু মুজিবকে প্রতারণা করার জন্য তিনি আওয়ামী লীগের দাবিসমূহের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, এমন ধরনের ঘোষণা ২৫ মার্চ করবেন ইত্যাদি।

#### ১০. কৌশলগত স্তর

ক. যেহেতু গোপনীয়তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে জন্য নিম্নবর্ণিত সৈন্যরা—  
যারা ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে; তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ের

অপারেশন পরিচালনা করতে হবে।

এক, মুজিবের বাড়ি ভেঙে টুকে হবে এবং উপস্থিতি সবাইকে প্রেফতার করতে হবে।  
বাড়িটিতে শক্ত প্রহরা রয়েছে এবং সুরক্ষিত।

দুই, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ হলসমূহ ঘেরাও করতে হবে, ইকবাল হল ডি ইউ (ঢাকা  
বিশ্ববিদ্যালয়), লিয়াকত হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)।

তিনি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অচল করতে হবে।

চার, যে সমস্ত বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হয়েছে সেগুলোকে বিছিন্ন করতে হবে  
খ. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অচল করে দেয়ার আগ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সৈন্যদের  
কোন কার্যক্রম চলবে না।

গ. অপারেশনের রাতে দশটার পর কাউকেও ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাইরে যাওয়ার  
অনুমতি দেওয়া হবে না।

ঘ. যে কোন অজুহাতেই হোক শহরের ভেতর অবস্থানরত সৈন্যদের প্রেসিডেন্ট হাউস,  
গভর্নর হাউস, এম এন এ হোস্টেল এলাকাসহ রেডিও-টিভি এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ  
প্রাঙ্গণে সমাবেশ ঘটাতে হবে।

ঙ. মুজিবের বাড়িতে অপারেশন চালাবার জন্য বেসামরিক গাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপারেশনের অনুক্রম

১১। ক) আগাম হানার সময় রাত ১টা।

খ) ক্যান্টনমেন্টে পরিত্যাগের সময়

১. কমান্ডো (এক প্লাটন) — মুজিবের বাড়ি, রাত ১টা,
২. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিকল — ১টা ৫৫ মিনিট,
৩. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তন করার জন্য নির্ধারিত সৈন্যদের যাত্রা — ১টা ০৫ মিনিট।
৪. রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর ও কাছাকাছি অন্যান্য থানার জন্য নির্ধারিত  
সৈন্যদের যাত্রা ১টা ০৫ মিনিট।
৫. নিম্নবর্ণিত স্থানগুলো ঘেরাও করতে হবে — ১টা ০৫ মিনিট।

মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ি, রোড নম্বর ২৯ এবং বাড়ি নম্বর ১৪৮ রোড  
নম্বর ২৯।

৬. সান্ধ্য আইন জারি করতে হবে রাত ১১টায় সাইরেন বাজিয়ে এবং লাউড স্পীকারের  
মাধ্যমে। স্থায়িত্ব, প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ ঘন্টা। প্রাথমিক পর্যায়ে পাস দেয়া যাবে না।  
মাত্র সন্তান প্রসব এবং মারাত্মক হৃদরোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে।  
মাত্র অনুরোধে সামরিক বাহিনীই এসব ক্ষেত্রে রোগীকে স্থানান্তর করবে। আরো ঘোষণা  
করতে হবে যে, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র বেরনবে না।

৭. বিশেষ মিশনে নিয়োজিত সৈন্যদের নিজস্ব সেছুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে রাত  
১১টায় (সৈন্যদের মোটা সুতির কাপড়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে হবে)। হলগুলো  
দখল করতে হবে এবং অনুসন্ধান চালাতে হবে।

৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে সৈন্যরা রওনা হবে ১২টা ০৫ মিনিটে, রাস্তা ও নদীর প্রতিবন্ধকতা সরাতে হবে রাত ২টায়
- খ. দিমের বেলায় অপারেশন
১. দিমের বেলায় ধানমন্ডির সন্দেহজনক প্রতিটি বাড়িতে অনুসন্ধান চালাতে হবে এবং পুরনো ঢাকার হিন্দু বাড়িগুলোতেও ।
  ২. সকল ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, টিআর্যাভটি, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইস্টিউট ও টেকনিক্যাল ইস্টিউটের সাইক্রোস্টাইল মেশিন বাজেয়াফত করতে হবে ।
  ৩. সান্ধ্য আইন কঠোরভাবে আরোপ করতে হবে ।
  ৪. অন্যান্য নেতাদের ঘোষণার করতে হবে ।
১২. ব্রিগেড কমান্ডার প্রণয়ন করবেন সৈন্যদের বিস্তারিত কর্মধারা । কিন্তু নিম্নবর্ণিত কাজগুলো অবশ্য পালনীয়
- ক) ইপি ইউনিটের অন্তর্শালা দখল করতে হবে । সিগন্যালসহ প্রশাসনিক ইউনিট দখলে আনতে হবে । পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের শুধু অন্ত দিতে হবে ।
- ব্যাখ্যা- আমরা পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্যদের বিব্রত করতে চাই না । এবং এমন কাজে নিয়োগ করবো না—যা তাদের অসম্ভৃষ্ট উৎপাদন করে ।
- খ) সব থানা নিরন্ত্র করতে হবে ।
- গ) ডিজি (ডাইরেক্ট জেনারেল) ইপিআর-কে (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) তার অন্তর্শালার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে ।
- ঙ) সকল আনসারদের রাইফেল নিয়ে নিতে হবে ।
১৩. তথ্য প্রয়োজন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে হবে -
১. মুজিব, ২. নজরুল ইসলাম, ৩. তাজউদ্দেন, ৪. ওসমানী, ৫. সিরাজুল আলম, ৬. মান্নান, ৭. আতাউর রহমান, ৮. অধ্যাপক মুজাফফর, ৯. অলি আহাদ, ১০. মিসেস মতিয়া চৌধুরী, ১১. ব্যারিস্টার মওদুদ, ১২. ফয়জুল হক,, ১৩. তোফায়েল, ১৪. এন এ সিদ্দিকী, ১৫. রউফ, ১৬. মাখন এবং অন্যান্য ছাত্রনেতা ।
  - ক. সমস্ত পুলিশ স্টেশন ও রাইফেলসের অবস্থান ।
  - খ. শহরের যেসব স্থানে অন্ত জমা এবং শক্ত কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে ।
  - গ. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থান ।
  - ঘ. যে সব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, সেগুলোর অবস্থান ।
  - ঙ. যেসব প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে, তাদের নাম ও ঠিকানা ।
১৪. অধিনায়কত্ব ও নিয়ন্ত্রণ—দু'টি অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।
- ক. ঢাকা অঞ্চল কমান্ডার—মেজর জেনারেল ফরমান,  
স্টাফ—পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড স্টাফ অথবা সামরিক আইন সদর দফতর ।  
সৈন্য—ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্য ।

খ. প্রদেশের বাকি অঞ্চল কমান্ডার—মেজর জেনারেল কে, এইচ রাজা।  
স্টাফ—সদর দফতর চতুর্দশ ডিভিশন।  
সৈন্য—ঢাকার প্রয়োজন থেকে বিয়োগকৃত সৈন্য।

### করণীয় কাজের জন্য সৈন্য বটন

#### ঢাকা

কমান্ড অ্যান্ড কট্রোল মেজর জেনারেল ফরমান, সামরিক আইন সদর দফতর,  
সৈন্য ৫৭ ব্রিগেডের সদর দফতর, ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্যরা অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব, ৩২  
পাঞ্জাব (কমান্ডিং অফিসার পরিবর্তিত হবে) এবং তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজ জিএসও  
১, ২২ বালুচ, ১৩ ফ্রিটিয়ার ফোর্স, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ হালকা অ্যাক-অ্যাক  
রেজিমেন্ট, ৩ কমান্ডো কোম্পানি (কুমিল্লা) থেকে।

#### দায়িত্ব

- নিরন্তরকরণের মাধ্যমে ২ এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান বাইফেলস্  
সদর দফতর (২৫০০), রাজারবাগের রিজার্ভ পুলিশদের (২০০০) নিরপেক্ষকরণ।
- টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ট্রান্সমিটার, রেডিও, টিভি, স্টেট ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।
- আওয়ামী লীগ নেতাদের ফ্রেফতার করতে হবে, তাদের বিস্তারিত ঠিকানাসহ তালিকা  
প্রণয়ন করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় হল : ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, লিয়াকত হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)।
- শহর সিল করতে হবে। সড়ক, রেল ও নদীপথ আটকে দিতে হবে। নদীতে টহলের  
ব্যবস্থা করতে হবে।
- গাজীপুরের অস্ত্র কারখানা ও রাজেন্দ্রপুরের অস্ত্রাগার রক্ষা করতে হবে।

বাকি অঞ্চল চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতর মেজর জেনারেল কে এইচ রাজা এবং চতুর্দশ  
ডিভিশনের অধীনে।

#### রাজশাহী

##### সৈন্য ২৫ পাঞ্জাব

#### করণীয় কাজ

- ডেসপ্যাচ সিও শফকাত বালুচ।
- এক্সচেঞ্জ ও রেডিও স্টেশন রাজশাহী।
- রিজার্ভ পুলিশ ও ইপিআর-এর সেষ্টের সদর দফতরের লোকজনকে নিহত্যকরণ।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ
- আওয়ামী লীগ ও ছান্নেতারা

#### ঘোর

##### সৈন্য

সদর দফতর ১০৭ ব্রিগেড, ২৫ বালুচ, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্টের লোকজন, ৫৫ ফিল্ড  
রেজিমেন্ট।

### দায়িত্ব

১. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার, রিজার্ভ পুলিশ এবং আনসারের নিরস্ত্রীকরণ।
২. যশোর শহর পুনর্দখল এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের ঘ্রেফতার।
৩. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দখল।
৪. সেনানিবাসের চারদিকের নিরাপত্তা বিধান এবং যশোর শহর, যশোর-খুলনা সড়ক এবং বিমান বন্দরের নিরাপত্তা বিধান।
৫. কুষ্টিয়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে অচল করে দিতে হবে।
৬. যদি প্রয়োজন পড়ে খুলনায় সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে হবে।

### খুলনা

#### সৈন্য

#### ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স

### দায়িত্ব

১. খুলনা শহরের নিরাপত্তা।
২. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও রেডিও স্টেশন দখল।
৩. পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর উইং সদর দফতর, রিজার্ভ কোম্পানি এবং রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করতে হবে।
৪. আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র এবং কমিউনিস্ট নেতাদের ঘ্রেফতার করতে হবে।

### রংপুর-সৈয়দপুর

#### সৈন্য

#### ২৩ সদর দফতর ব্রিগেড, ২৯ ক্যাভালারি, ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

### দায়িত্ব

১. রংপুর-সৈয়দপুর শহরের নিরাপত্তা।
২. সৈয়দপুরে ৩ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নিরস্ত্রীকরণ।
৩. যদি সম্ভব হয় দিনাজপুরের সেক্টর সদর দফতর ও রিজার্ভ কোম্পানিকে নিরস্ত্রীকরণ অথবা সীমান্ত চৌকিশলিতে ছাড়িয়ে দিয়ে নিরপেক্ষকরণ।
৪. রংপুরের রেডিও স্টেশন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল।
৫. রংপুরের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের ঘ্রেফতার।
৬. বগুড়ার অঙ্গাগার দখল।

### কুমিল্লা

#### সৈন্য

#### ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, দেড় ইঞ্চি মর্টার ব্যাটারি ও কমান্ডো ব্যাটালিয়ন (বিয়োগকৃত)

দায়িত্ব

১. ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর-এর উইং সদর দফতর ও জেলা রিজার্ভ পুলিশকে নিরন্তর করা।

সিলেট

সৈন্য

### ৩১ পাঞ্চাব এক কোম্পানি কম

দায়িত্ব

১. রেডিও স্টেশন, এক্সচেঞ্জ দখল।
২. সুরমার ওপর কোইনো সেতুর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।
৩. এয়ারফিল্ড দখল।
৪. আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের ঘ্রেফতার।
৫. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সেন্টার হেডকোয়ার্টারকে নিরন্তরণ। সিকান্দার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

চট্টগ্রাম

সৈন্য ২০বালুচ অগ্রবর্তী বাহিনী বাদে, ৩১ পাঞ্চাব বর্তমানে সাবেক সিলেট, ইকবাল শফির নেতৃত্বে একটি মোবাইল কলাম কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম যাবে এবং চূড়ান্ত দিনে মূল বাহিনীকে রাত ১২টায় শক্তিশালী করবে। ইকবাল শফির সাথে থাকবে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ট্রুপ হেভি মার্টার, ফিল্ড কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার্স।

দায়িত্ব

১. ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইবিআরসি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সেন্টার ও রিজার্ভ পুলিশকে নিরন্তর করা।
২. কেন্দ্রীয় পুলিশ অন্তর্গত গুদাম কজা করা (২০ হাজার)।
৩. রেডিও স্টেশন ও এক্সচেঞ্জ দখল।
৪. পাকিস্তান মৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ (কমোডোর মুমতাজ)।
৫. শায়গি ও জানজুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ (সিও ৮ ইস্ট বেঙ্গল), তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে যতক্ষণ না ইকবাল শফি পৌছাচ্ছেন।
৬. শায়গি ও জানজুয়া যদি নিরন্তর করার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারেন সেক্ষেত্রে আত্মক্ষামূলক একটি কোম্পানি নিয়োগ করে শহর থেকে ক্যান্টনমেন্ট আসার পথে প্রতিবন্ধক তৈরি করতে হবে, যাতে ইবিআরসি ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আটকা পড়ে যদি তারা আনুগত্য পরিত্যাগের চিন্তা ভাবনা করে।
- ৭) আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আঘাত হানার বাতে চৌধুরীকে (সি আই ইবিআরসি) ঘ্রেফতার করতে হবে।
- ৮) এসব দায়িত্ব সম্পাদনের পর আওয়ামী ও ছাত্রনেতাদের ঘ্রেফতার করতে হবে।

## পরিশিষ্ট : ৩

### আত্মসমর্পণের দলিল

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় এবং বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানের সকল সশস্ত্রবাহিনীর আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হচ্ছেন। এই আত্মসমর্পণ পাকিস্তানের সকল সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী এবং আধা-সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব বাহিনীর সকলেই—যারা যেখানে আছে, সেখানকার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কর্তৃত্বাধীন নিকটতম নিয়মিত সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ ও সকল অন্ত সমর্পণ করবে।

এই দলিল স্বাক্ষরের সময় থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীনস্থ বলে বিবেচিত হবে। কোন প্রকার অবাধ্যতা আত্মসমর্পণের শর্ত ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যদের স্বীকৃত ও প্রচলিত স্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। যদি আত্মসমর্পণের কোন শর্তের ব্যাখ্যা বা অর্থ সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার সিদ্ধান্তই ছড়াত্ত বলে বিবেচিত হবে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এই আশ্বাস প্রদান করছেন যে, আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি জেনেভা কনভেশনের শর্ত অনুযায়ী একজন সৈনিকের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হবে এবং আত্মসমর্পণকারী সকল সামরিক ও আধা-সামরিক ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থার অঙ্গীকার প্রদান করছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীন সেনাবাহিনীর সকল বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসম্পত্তি ও জন্মসূত্রে পঞ্চম পাকিস্তানি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।

জগজিৎ সিং অরোরা

লেফটেন্যান্ট জেনারেল

জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ

ভারত-বাংলাদেশ বাহিনী

পূর্ব রণাঙ্গন

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি

লেফটেন্যান্ট জেনারেল

সামরিক আইন প্রশাসক

জোন-বি এবং কমান্ডার

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান)

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

## APPENDIX 2

INSTRUMENT OF SURRENDER SIGNED AT DACCA AT 16 HOURS (IST)

ON 16 DEC 1971

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH force in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. The forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

*Jagjit Singh* *AAK Miaz* Lt Gen  
(JAGJIT SINGH AURORA) (AMIN ABDULLAH KHAN MIAZI)  
Lieutenant-General Lieutenant-General  
General Officer Commanding in Chief Martial Law Administrator Zone 8 and  
Indian and BANGLA DESH Forces in the Commander Eastern Command (PAKISTAN)  
Eastern Theatre

16 December 1971.

16 December 1971.

আত্মসমর্পণের মূল দলিল

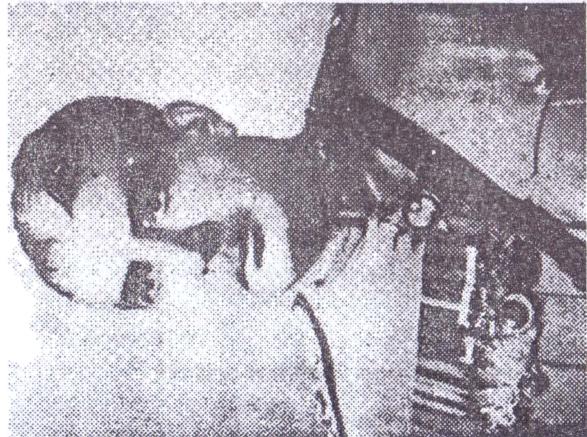
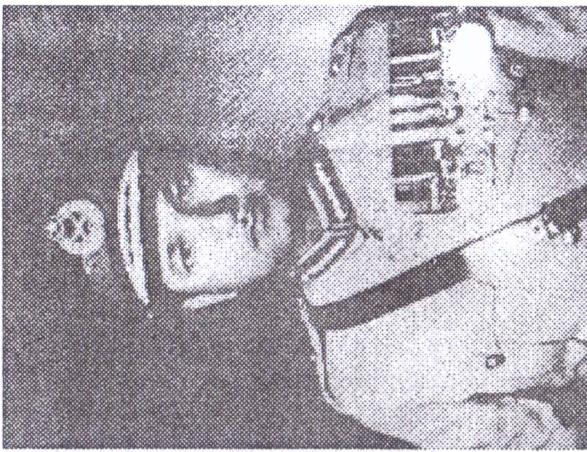


শেখ মুজিবুর রহমান, সভাপতি আওয়ামী লীগ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী  
কমাণ্ডার, পূর্বৰাষ্ট্রীয় কমান্ড

জুলফিকার আলি ভুট্টা  
চেয়ারম্যান, পাকিস্তান পিপলস পার্টি

জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান  
প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান





জেনারেল আবদুর হামিদ খান  
চীফ অব স্টাফ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী



লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান  
গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক, পূর্ব পাকিস্তান



লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাহেবজাদা ইয়াকুব খান  
কমান্ডার, পূর্বাঞ্চলীয় কামভ এবং সামরিক আইন  
প্রশাসক পূর্ব পাকিস্তান



ডাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান  
গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান



ডাক্তার এ এম মালিক  
পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ গভর্নর



লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস জি এম পীরজাদা  
প্রিমিপ্যাল স্টাফ অফিসার, প্রেসিডেন্ট অব পাকিস্তান



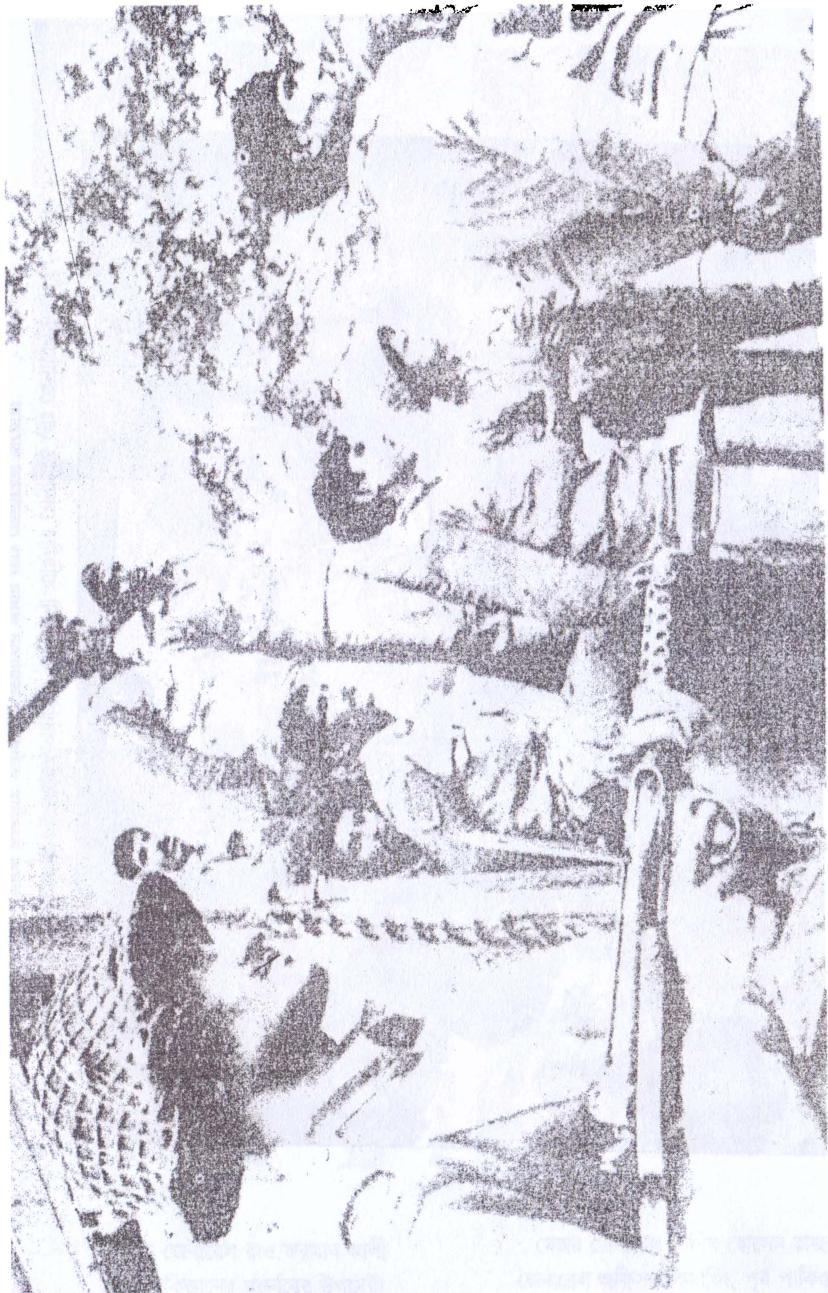
মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী  
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের উপদেষ্টা



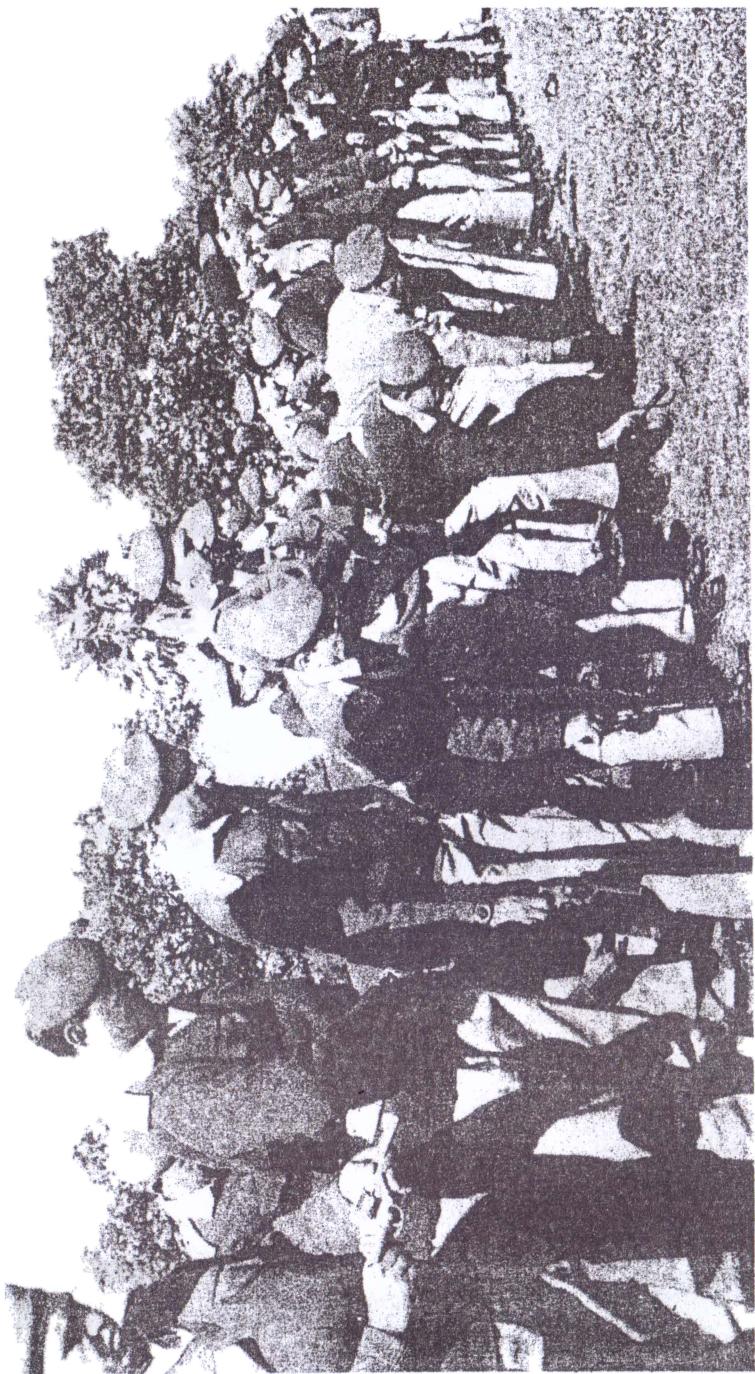
মেজর জেনারেল খানিম হোসেন রাজা  
জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, পূর্ব পাকিস্তান



আতঙ্কমণ্ডের দলিলে শাক্ত করছেন পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনীর সেনাপতি লেং জেনারেল নিয়জী।  
পাঞ্চ তার্টের পৃষ্ঠাখৰীয় কথাও প্রাপ্ত সেঁও জেনারেল অবোদা

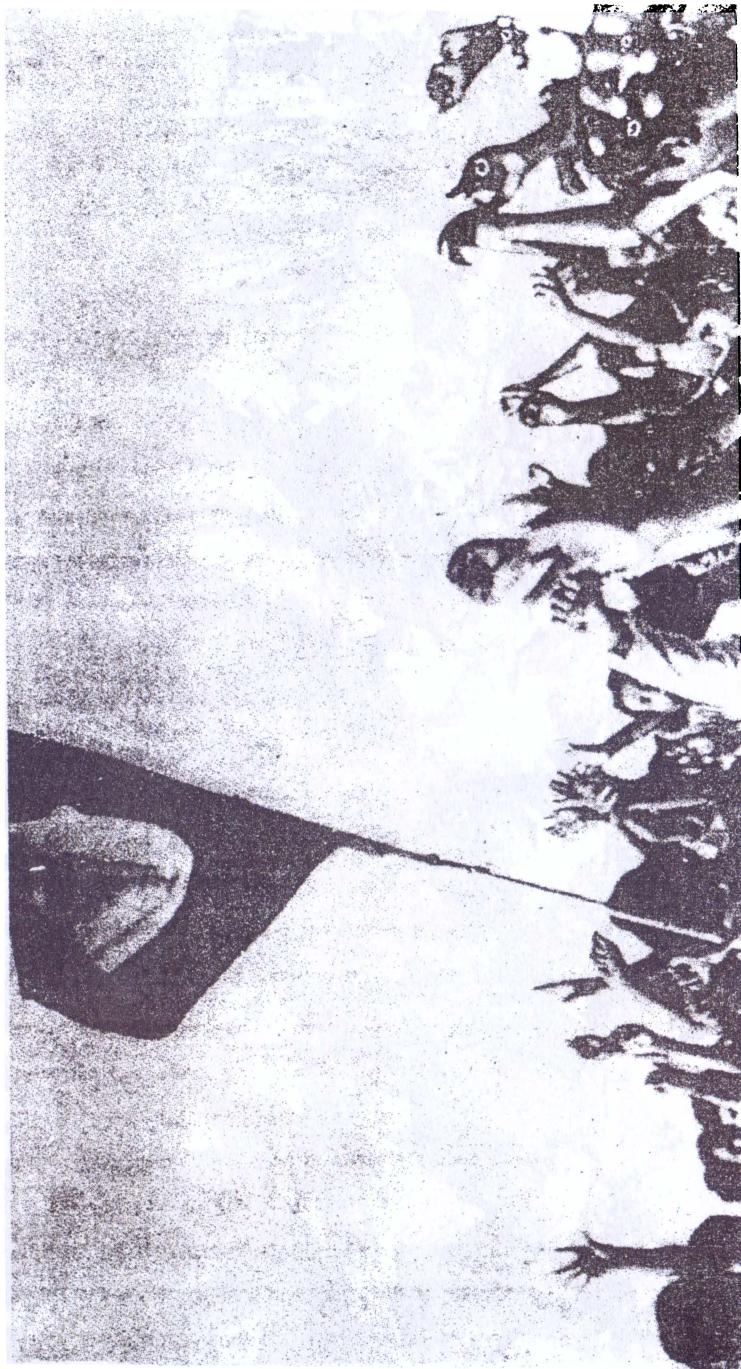


পিঠোড়া করে হাত বাঁধা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈনিকদের ঢাকে তোলা হচ্ছে



পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের অন্তসমর্পণ

বিজয়ী জনতাৰ উন্নাস



নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল সিদ্ধিক সালিকের লেখা উইটনেস টু সারেভার গ্রন্থের অনুবাদ। লেখক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তিনজন প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক,-লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজির জনসংযোগ অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও বন্ধনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাকে তুলে ধরতে কৃষ্ণিত হননি। পাশাপাশি তিনি একজন অনুগত পাকিস্তানি ছিলেন বলেই বাংলাদেশের মাটিতে পাক-বাহিনীর বিপর্যয়ে তার আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র সময়কাল তিনি জেনারেল নিয়াজির পাশে পাশেই ছিলেন এবং বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পাক-সামরিক জাতার চক্রবন্ধ তাই তিনি কাছ থেকেই দেখার সুযোগ লাভ করেন। এই সুবাদে দেখেছেন এক আত্ম অহংকারী জেনারেলকে। দেখেছেন তার রংগকৌশল, যা প্রচওভাবে মার খেয়েছে অক্তোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ আঘাতে। উপরন্তু সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রণীত রন কৌশল নামক যে ধাপ্তার আশ্রয় তিনি নিয়েছিলেন, তা ভারত-বাংলাদেশ বাহিনীর প্রবল আক্রমনে বিপর্যস্ত করে দেয়। এ সবের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ এসেছে এ গ্রন্থে, যা পাকিস্তানের অন্যান্য জেনারেলরা সব্যস্থে এড়িয়ে গেছেন তাদের গ্রন্থে। ফলে ইতিহাস সচেতন পাঠকের কাছে এ গ্রন্থের আবেদন কখনো ছান হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।